শ্রীরামকৃষ্ণচরিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

[সংশোধিত ও পরিবর্ধিত]

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী

অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি কম্পট্রোলার এ্যাণ্ড অডিটার জেনারেল অফ্ ইণ্ডিয়া

উদ্বোধন কার্যালয়

গ্রন্থকারের নিবেদন

(প্রথম সংস্করণ)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একখানি নাতিদীর্ঘ, তথ্যমূলক জীবনচরিতের অভাবমোচনকল্পে এই পুস্তকখানি রচিত। ইহাতে তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনাবলী সংক্ষেপে এবং যথাযথভাবে বর্ণনের চেষ্টা করা হইয়াছে ; কোনরূপ দার্শনিক বিচার-ব্যাখ্যা ইহার বিষয়ীভূত নহে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন যদিও কালের হিসাবে বর্তমান যুগ হইতে খুব দূরবর্তী নহে, তথাপি উহার কোন কোন ঘটনার বিবরণ সন-তারিখ-সহ নিশ্চিতভাবে পাওয়া প্রায় অসম্ভব ; অতএব কাহিনীর ভিতরে কিছু কিছু ফাঁক ও অসম্পূর্ণতা থাকা স্বাভাবিক। যেখানে একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়, সেখানে আবার বাছাই করিতে হইয়াছে। যাহা আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। তথ্যসংগ্রহ-বিষয়ে এই পুস্তকের প্রধান অবলম্বন শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' এবং পরম শ্রদ্ধাস্পদ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত-প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে তুই ধীমান্ ও সুযোগ্য শিষ্যের অমর লেখনীতে তাঁহাদের গুরুদেবের জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী এবং তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী যেরূপ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অতুলনীয়। যেকেহ শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিতমাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে চাহেন, তাঁহাকে উক্ত তুই রত্নখনিতে প্রবেশ করিতেই হইবে।

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অভাব কখনও ঘটে নাই। যদিও 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি', তথাপি সকল ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষই আমাদের ন্যায় সাধারণ মানবের দৃষ্টিতে সমান নহেন। অনেক

ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি নির্জন পর্বতকন্দরে, অথবা হয়তো আত্মগোপনপূর্বক লোকালয়ে বাস করিয়া গিয়াছেন, কিংবা করিতেছেন—জনসমাজে তাঁহাদের কথা অপরিজ্ঞাত। কিন্তু স্বল্পসংখ্যক ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির নাম আমরা সকলেই জানি,—যাঁহারা নিজেদের অলৌকিক শক্তি, সাধনা এবং চরিত্রপ্রভাবে স্বজাতির, এমন কি, সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে গভীর রেখাপাত করিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যে উঁহাদের মধ্যে পরিগণ্য, সে বিষয়ে আজ আর কোন মতদ্বৈধ নাই। এই বাংলাদেশের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের পর্ণকুটীরে জগতের কল্যাণের নিমিত্তই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ধন্য আমরা, যদি নিজ নিজ জীবনে কিয়ৎপরিমাণেও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারি ; দুর্ভাগা আমরা, যদি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করি।

এই পুস্তক-প্রণয়নে আমার পরমভক্তিভাজন শ্রীমৎ স্বামী প্রেমেশানন্দ ও শ্রীমৎ স্বামী আত্মবোধানন্দ মহারাজের আশীর্বাদ এবং উৎসাহবাক্য সর্বদা আমাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। তাঁহাদের অপরিসীম স্নেহ আমার পথের সম্বল ; উহার ঋণ আমার পক্ষে অপরিশোধ্য। 'উদ্বোধনে'র তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

আমার ধূলিমলিন চিত্তমুকুরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত-মাহাত্ম্য বিশুদ্ধ-ভাবে প্রতিফলিত না হওয়ার দরুন পুস্তকমধ্যে অনিবার্যরূপে যেসকল দোষত্রুটি স্থান পাইয়াছে, তজ্জন্য শ্রীরামকৃষ্ণচরণে এবং সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট ঐকান্তিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ইতি

ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৬০ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

ভগবৎকৃপায় ও সহৃদয় পাঠকবর্গের সহানুভূতিতে 'শ্রীরামকৃষ্ণচরিত' পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণে যেসকল ভ্রম-ত্রুটি পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহা যথাসাধ্য দূরীভূত করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে কিছু পরিবর্তন এবং কতক নূতন বিষয়ও সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এবারে গ্রন্থখানি পাঠকবর্গের অধিকতর মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

পূজ্যপাদ স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ মহারাজ এই নূতন সংস্করণের পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়া আমাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে অনেক ত্রুটি থাকিয়া যাইত। ইতি

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী

সূচীপত্র

শ্রীরামকৃষ্ণচরিত

অবতরণিকা

[ইতিহাসের পটভূমি]

উনবিংশ শতাব্দী বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অতি গৌরবময় স্বর্ণযুগ। ভারতবর্ষে ইংরেজের অধিকার-স্থাপনের ফলে শাসনব্যবস্থা, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি বিবিধ ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে যে সংঘাত, অপিচ মিলনের সূত্রপাত ঘটিয়াছিল, তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে উৎপন্ন হয় এদেশের মনোরাজ্যে এক বিরাট্ আলোড়ন। বাহিরের ঘটনারাজি অন্তরে তীব্র আঘাত হানিয়া ভারতের সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করিয়া তুলে। দীর্ঘকালব্যাপী জড়তা ও অন্ধকারের আবরণ ছিন্ন করিয়া ভারতের মনীষা আবার নূতন দীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া উঠে। ইতিহাসে উহাই ভারতের নবজাগরণ অথবা নবজন্ম নামে পরিচিত।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে দাক্ষিণাত্যে; কিন্তু নিয়তির চক্রে পরস্পরের মনের পরিচয় লইবার অবকাশ এবং সুযোগ সেখানে শীঘ্র উপস্থিত হইতে পারে নাই। মনের পরিচয় সর্বাগ্রে আরম্ভ হয় বাংলাদেশে। তাহার বাহ্য কারণ অবশ্য এই যে, বাংলাদেশেই ইংরেজের রাজত্ব সর্বপ্রথম সুপ্রতিষ্ঠিত ও শান্তি স্থাপিত হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল অতি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ইহার মূল কারণ বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনধারার মধ্যেই ছিল অন্তর্নিহিত। বাঙ্গালী-চরিত্রে দু'টি গুণ চিরকাল পরিস্ফুট—একটি স্বাধীনতা, অপরটি মানবতা। এই দুই গুণের প্রভাবে ভারতীয়দের মধ্যে বাঙ্গালীই সর্বপ্রথমে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতাকে সাগ্রহে বরণ করিয়া লইয়াছিল,—যেহেতু আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসেও স্বাধীনতা এবং মানবতা—এই দু'টিই প্রধান সুর।

চিরকাল দেখিতে পাওয়া যায় যে, যেখানেই মনোরাজ্যে কোন বিপ্লব ঘটিয়াছে, সেখানেই লোকচক্ষুর অন্তরালে কাজ করিয়াছে কোন দৈবী, অর্থাৎ গূঢ়, অদৃশ্য শক্তি। শুধু বাহ্য ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতেই যে নূতন ভাবধারার

সৃষ্টি হয় কিংবা বিস্তার-লাভ ঘটে, তাহা কখনই নহে ; পরন্তু যেমন ইমার্সন (Emerson) বলিয়াছেন—প্রত্যেক নিগূঢ় সত্য অথবা ভাব আত্মপ্রকাশের জন্য নিজের প্রয়োজনমত মানুষ গড়িয়া লয়। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে স্বতঃই মনে হয় যেন কোন নিগূঢ় ভাবধারা বাংলার মাটিতে, বাংলার লোকসমাজে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল এবং ঘটনা-পরম্পরার সাহায্যে উহা আপন প্রবাহের উপযোগী খাত নির্মাণ করিয়াছিল। নব্যবঙ্গের অভ্যুত্থানই প্রকৃতপক্ষে ভারতের নবজন্ম। এই অভ্যুদয় ধর্ম, নীতি, বিদ্যাবত্তা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই দিক্‌পালগণকে বঙ্গজননীর ক্রোড়ে টানিয়া আনিয়াছিল। এই অভ্যুদয়ের ইতিহাস রোমাঞ্চকর—উহা দৃপ্ত মহিমায় মণ্ডিত। ইতিহাস আলোচনা করিতে আমরা বসি নাই। কিন্তু যে পুণ্যচরিত বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, নব্যবঙ্গের ইতিহাস তাহার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সুতরাং ঐ ইতিহাসের যৎসামান্য আলোচনা এস্থলে আবশ্যক।

এ'কথা মনে করা নিতান্ত ভুল যে, বাংলাদেশে ইংরেজীশিক্ষার প্রবর্তন কোম্পানীবাহাদুরই করিয়াছিলেন। ইংরেজীশিক্ষার সূত্রপাত হইয়াছিল কলিকাতার নাগরিকদিগের নিজেদের অর্থে ও নিজেদের চেষ্টায়। ইংরেজী শিখিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এবং ইংরেজ সওদাগরদিগের দপ্তরে চাকুরি পাইবার সুবিধা হইবে, এই ভাবিয়া অবশ্য একদল লোক ইংরেজী শিখিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিল। দুই-চারি জন ফিরিঙ্গি কাজ-চালানো ইংরেজী শিখাইবার ইস্কুল খুলিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগারও করিতেছিলেন। কিন্তু ইহা সহজেই অনুমেয় যে, প্রকৃত জ্ঞানপিপাসা ব্যতিরেকে শুধু অর্থলোভে কিংবা ব্যবসায়ের খাতিরে যাহারা কোনরূপ ভাষাশিক্ষা কিংবা বিদ্যাভ্যাস করে, তাহাদের দ্বারা জ্ঞানের প্রসার এবং দেশব্যাপী জ্ঞানান্দোলন হওয়া একেবারেই অসম্ভব। 'নব্যবঙ্গ' নিশ্চয়ই এরূপ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা সৃষ্ট কিংবা উহাদের নিকট ঋণী নহে। আর কোম্পানীবাহাদুর যদি জোর করিয়া দেশের লোককে ইংরেজী শিখাইতেন, তবে সেই বাধ্যতামূলক শিক্ষার ফলে নব্যবঙ্গের অভ্যুত্থান হইত কি না, তাহাতেও প্রচুর সন্দেহ ; কারণ নবজাগরণের যে ভাব তাহা ভিতর হইতেই স্ফুরিত হয়, বাহির হইতে উহা একে অন্যের উপর চাপাইয়া দিতে পারে না। বাংলাদেশে ইংরেজীশিক্ষা-প্রবর্তনের মূলে ছিল পাশ্চাত্য

ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি আয়ত্ত করিবার জন্য বাঙ্গালী চিন্তানায়কদের নিজেদের আগ্রহ এবং চেষ্টা। উহার মধ্যে কোন স্বার্থ-বুদ্ধি কিংবা লাভক্ষতির বিচার ছিল না। আর ইতিহাস এরূপ সাক্ষ্য দেয় না যে, সরকারবাহাদুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিংবা বাধ্যতামূলকভাবে ইংরেজীশিক্ষা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। জ্ঞানার্জনের দুর্দমনীয় স্পৃহার বশবর্তী হইয়া কলিকাতার বাঙ্গালী সমাজ নিজেদের উদ্যোগে ইউরোপীয় বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন করিয়াছিলেন। ইহাই বস্তুতঃ প্রধান কারণ, যেজন্য ইংরেজী-শিক্ষার ফলে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বঙ্গভূমিতেই স্বাধীনচিন্তা ও নবজাগরণের ভাব সমধিক বিকাশ ও পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে যে সনদ দেওয়া হয়, তাহাতে এরূপ নির্দেশ ছিল যে, দেশীয় সাহিত্যের উন্নতির জন্য, দেশীয় পণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য এবং প্রজাবৃন্দের মধ্যে বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য কোম্পানীকে প্রতি বৎসর অন্ততঃ এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে। সেই নির্দেশানুযায়ী বার্ষিক লক্ষ টাকার বরাদ্দ হইল বটে, কিন্তু দশ বৎসর কাটিয়া গেল, ঐ টাকা কি ভাবে এবং কি কাজে খরচ করিতে হইবে, তাহার কোন নির্দেশ দেওয়া হইল না। নির্দেশদানের জন্য অবশেষে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে 'কমিটি অব্ পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শন্' নামে একটি পরিষৎ গঠিত হয়। ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ইংরেজ-কর্তৃপক্ষ প্রাচ্য শিক্ষারই পক্ষপাতী ছিলেন। যে কারণে প্রথমাবস্থায় তাঁহারা খৃষ্টান পাদ্রীদিগকে কোম্পানীর অধিকারভুক্ত এলাকায় প্রবেশ করিতে দিতেন না, সম্ভবতঃ সেই কারণেই তাঁহারা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষারও বিরোধী ছিলেন। প্রচলিত ধর্ম, শিক্ষা, আইন, রীতিনীতি প্রভৃতিতে হস্তক্ষেপ করিলে পাছে প্রজাবৃন্দের মধ্যে অসন্তোষ জন্মে কিংবা বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, সেই ভয় কোম্পানীর পরিচালকগণের মনে সর্বদাই ছিল। সুতরাং তাঁহারা এরূপ কোন ব্যাপারে অগ্রসর হইতে সাহস পাইতেন না।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট-কর্তৃক নির্দেশদানের অনেক পূর্বেই (১৭৮১ খৃষ্টাব্দে) ওয়ারেন হেষ্টিংস্ কলিকাতা-মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী-কর্তৃক বারাণসীতেও একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাপরিষৎ গঠিত হইবার পর পরিষৎ ঠিক

করিলেন যে, ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে বরাদ্দ-করা সঞ্চিত সমস্ত টাকা ত্রিহুত ও নবদ্বীপে নূতন দুইটি সংস্কৃত কলেজ-প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সংস্কৃত ও অরবী-ফার্সী পুস্তক-মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য ব্যয়িত হইবে। কিন্তু ঐ সিদ্ধান্ত নির্বিবাদে পরিণত করা আর সম্ভবপর ছিল না; কারণ ইতোমধ্যে নব্যবঙ্গের অভ্যুত্থান কার্যে হইয়া গিয়াছে এবং ভাবের স্রোত অন্যদিকে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় দিন। ঐ দিন ডেভিড হেয়ার, স্যার হাইড ইষ্ট, রাজা রামমোহন রায়, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মহারথিগণের চেষ্টায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কি প্রণালীর শিক্ষা প্রবর্তিত হইবে এবং হওয়া উচিত—ইহা লইয়া কোম্পানী-বাহাদুর যখন জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলেন, তখন নব্যবঙ্গের যাঁহারা অগ্রদূত তাঁহারা বিনা দ্বিধা-সঙ্কোচে ইংরেজীশিক্ষাকেই বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে সরকারী শিক্ষাপরিষৎ গঠিত হইবার সময়ে তাঁহারা নীরব রহিলেন না। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপ্রচারের সমর্থনকল্পে রাজা রামমোহন রায় লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট তাঁহার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লিপি প্রেরণ করিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, উহাই নব্যবঙ্গের প্রথম যুদ্ধ-ঘোষণা—রাজা রামমোহন রায় যেন "স্বদেশবাসীদিগের মুখ পূর্ব হইতে পশ্চিমদিকে ফিরাইয়া দিলেন।" আরও একটা কথা এরূপ শোনা যায় যে, তখন হইতেই ইংরেজীভাষার ভূত যেন আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিল। এই সকল কথার মধ্যে কিছু অতিশয়োক্তি আছে বলিয়াই মনে হয়। আধুনিক ইউরোপের উন্নতির যাহা মূল কারণ, অর্থাৎ শিক্ষাব্যবস্থাকে থিওলজির নাগপাশ (ধর্মের অনুশাসন) হইতে মুক্তিদান—রাজা রামমোহন রায় একমাত্র তাহারই উপর জোর দিয়াছিলেন।* ভারতবাসীর পক্ষে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের

* রামমোহন রায়ের পত্রের অংশবিশেষের অনুবাদ নীচে দেওয়া হইল। মূল পত্র ইংরেজীতে লিখিত হইয়াছিল।

"ব্রিটিশ জনসাধারণকে সত্যিকার জ্ঞান হইতে বঞ্চিত রাখাই যদি শ্রেয়স্কর ও বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করা হইত, তবে (ইউরোপের নবযুগের প্রারম্ভে) স্কুলম্যানদের মতবাদকে বিতাড়িত করিয়া তাহার স্থলে বেকনীয় (Baconian) দর্শনশাস্ত্রকে কখনই প্রতিষ্ঠিত করা হইত না। অজ্ঞতাকে জিয়াইয়া রাখার সর্বাপেক্ষা কার্যকর পন্থাই ছিল স্কুলম্যানদের মতবাদকে আঁকড়াইয়া থাকা। ঠিক অনুরূপ যুক্তিতে এই কথাই আমি বলিতে পারি যে,

পরিচয় সংগ্রহ করা নিতান্ত আবশ্যক—এই কথা তিনি খুব স্পষ্ট এবং জোরালো ভাষায় ঘোষণা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু ভারতীয় হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও মুসলমানদিগের যে প্রাচীন দর্শন-বিজ্ঞান ও সুপ্রাচীন অধ্যাত্মবিদ্যা, তাহাকে উপেক্ষা করিবার কোন পরামর্শ তিনি কস্মিন্ কালেও দেন নাই। রামমোহনের জীবন ও গ্রন্থাবলীতে জাজ্বল্যমান হইয়া রহিয়াছে তাঁহার প্রবল স্বাজাত্যভিমান—প্রাচ্য দর্শনবিজ্ঞানে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও অসীম অনুরাগ। পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাসমূহ শিখাইতে গিয়া সেই শিক্ষা দেশীয় ভাষায় কিংবা ইংরেজী ভাষায় দেওয়া হইবে—রামমোহন রায় তাঁহার পত্রে এই বিষয়ে কোন স্পষ্ট উল্লেখ কিংবা বিচার করেন নাই। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তিনি স্বয়ং আধুনিকবঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একজন জন্মদাতা। মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সরকারী শিক্ষাপরিষদের সহানুভূতি ছিল টোল ও মাদ্রাসার দিকে। সুতরাং লর্ড আমহার্ষ্ট রাজা রামমোহন রায়ের উপদেশ গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিলেন না। তবে পত্রাঘাত যে একেবারে নিষ্ফল হইল, তাহা নহে। হিন্দু কলেজের জন্য গৃহনির্মাণের ভার সরকারবাহাদুর গ্রহণ করিলেন এবং অনতিকালমধ্যে কলেজের পরিচালন-ব্যয় বাবত বার্ষিক অর্থ-সাহায্যও মঞ্জুর করিলেন।

যে শক্তিমান্ পুরুষ নব্যবঙ্গের প্রধান গুরু—যিনি নিজের শিষ্যবর্গের মধ্যে স্বাধীনতার ভাব ও আদর্শকে মূর্ত করিয়া তুলিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন —সেই হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে অধ্যাপক

এদেশকে অজ্ঞানান্ধকারে ডুবাইয়া রাখাই যদি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের উদ্দেশ্য হয়, তবে সেই উদ্দেশ্যসাধনের প্রকৃষ্ট উপায় হইবে টোলের শিক্ষাপদ্ধতিকে চালু রাখা। কিন্তু সরকারের উদ্দেশ্য যেহেতু প্রজাবর্গের উন্নতি ও কল্যাণ-সাধন, অতএব তজ্জন্য চাই এমন উদার শিক্ষাব্যবস্থা, যাহার ফলে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি খুলিয়া যাইবে। শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে থাকা উচিত—গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীরস্থান এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান। লোকশিক্ষার জন্য কোম্পানীবাহাদুর যে পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন, তাহাতেই এই ধরণের শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন অনায়াসে হইতে পারে। চাই উপযুক্ত পুস্তকাগার ও যন্ত্রপাতিসমন্বিত একটি কলেজ। প্রারম্ভে শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে এমন ব্যক্তিদিগকে যাঁহাদের প্রতিভা এবং শিক্ষাদানের যোগ্যতা দুই-ই আছে, এবং যাঁহারা স্বয়ং পাশ্চাত্ত্য দেশে শিক্ষালাভ করিয়াছেন।"

নিযুক্ত হইয়া হিন্দু কলেজে যোগদান করেন। তাঁহার নাম বঙ্গদেশের ইতিহাসে অমর। কলিকাতার ইন্টালী অঞ্চলে এক পর্তুগীজ ফিরিঙ্গী-পরিবারে তাঁহার জন্ম হয় এবং ডেভিড ড্রামণ্ড নামক জনৈক স্কচ্ সাহেবের নিকট তিনি বিদ্যাভ্যাস করেন। এই ড্রামণ্ড সাহেবের হৃদয়-মন ছিল ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের চিন্তাধারায় অভিষিক্ত। যুবক ডিরোজিওকে যোগ্য শিষ্য পাইয়া তিনি তাঁহাকে স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে বিশেষভাবে দীক্ষিত করেন। হিন্দু কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইবার পর ডিরোজিও আবার নিজের ছাত্রদিগের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার বাণী এমন উৎসাহের সহিত প্রচার করিতে লাগিলেন যে, উহার ফলে এক প্রবল উত্তেজনা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হইল। প্রবীণ নাগরিক ও অভিভাবকেরা বলিতে লাগিলেন যে, এমন নাস্তিক অধ্যাপকের উপর ছেলেদের শিক্ষার ভার দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত নহে। অতএব ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কলেজ কমিটির হিন্দুসভ্যগণ কর্তৃক ডিরোজিওর বিরুদ্ধে তিনটি গুরুতর অভিযোগ আনীত হইল। একটি যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদলিপিতে ডিরোজিও যদিও অভিযোগসমূহ খণ্ডন করিলেন, তথাপি সকল দিক বিবেচনা করিয়া কলেজের স্বার্থের খাতিরে ডিরোজিওকে কর্মচ্যুত করা হইল। পরবর্তী ডিসেম্বর মাসেই দারুণ বিসূচিকা-রোগে তিনি অকালে প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু যে তিন বৎসরকাল তিনি হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, তাহারই মধ্যে বহুসংখ্যক যুবককে তিনি তাঁহার যাদুকাঠির স্পর্শে প্রভাবান্বিত করিতে পারিয়াছিলেন। এই সকল যুবক অচিরকালমধ্যে ধর্মে ও সমাজে ঘোরতর বিপ্লব আনয়ন করিল।

ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের মূলে ছিল 'এন্সাইক্লোপিডিষ্ট' নামক দার্শনিক পণ্ডিতদের চিন্তাধারা। তাঁহারা এরূপ মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন যে, যুক্তিতর্কদ্বারা লভ্য জ্ঞানই একমাত্র সত্যজ্ঞান। চিরাগত প্রথা, সামাজিক আচার-ব্যবহার, মহাপুরুষগণের বাণী ও জীবনী—সকল বিষয়ই তাঁহারা তর্কবুদ্ধির দ্বারা বিচার করিতেন। 'এন্সাইক্লোপিডিষ্ট'দের জ্ঞানপিপাসা অদম্য ও প্রশংসনীয় ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের অত্যুগ্র স্বাধীনচিন্তা অনেক স্থলে শুধু ঔদ্ধত্যের পরিচায়কমাত্র ছিল। প্রাচীনের প্রতি কোন শ্রদ্ধা বা মমতা উহাদের চিত্তে স্থান পাইত না। উহাদের বুলি ছিল 'ভাঙো' 'ভাঙো'—লোকাচার, দেশাচার, ধর্মবিশ্বাস, যাহা কিছু অযৌক্তিক বলিয়া

মনে হয়, তাহারই শিরে পদাঘাত কর—তাহাকেই ধ্বংস কর। উঁহারা অনেকেই নিরীশ্বরবাদী কিংবা অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন। ডিরোজিও এবং তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী উঁহাদেরই মানসপুত্র।

সেই যুগে কলিকাতায় দুইটি প্রধান দল গড়িয়া উঠিয়াছিল—একটি 'নয়ী রোশনী' অথবা 'নূতন আলোর দল', অপরটি 'পুরানী রোশনী' অথবা 'পুরাতন আলোর দল'। ডেভিড হেয়ার, রামমোহন রায় ও তাঁহার সহকর্মিগণ এবং ডিরোজিওর শিষ্যদল ছিলেন নয়ী-রোশনী-ওয়ালা। অপর দিকে কোম্পানীর প্রধান কর্মচারিগণ এবং রাধাকান্ত দেব-প্রমুখ দেশীয়গণ ছিলেন 'পুরানী-রোশনী-ওয়ালা। স্যার উইলিয়ম জোন্সের সময় হইতে ইংরেজ রাজকর্মচারীদের মধ্যে সংস্কৃতশিক্ষার খুব প্রচলন হইয়াছিল। কোলব্রুক, উইলসন, জেম্‌স, শেক্সপীয়র, প্রিন্সেপ-ভ্রাতৃদ্বয়—প্রমুখ খ্যাতনামা সংস্কৃতানুরাগী কর্মচারিবৃন্দ সকলেই ছিলেন পুরানী-রোশনীর দলে এবং সরকারী শিক্ষাপরিষৎ ইঁহাদের দ্বারাই প্রভাবান্বিত ছিল। কিন্তু ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিকের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে চাকা ঘুরিয়া গেল। বেন্টিঙ্ক ছিলেন নূতনের পক্ষপাতী, সুতরাং সরকারী সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা এখন নূতনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। তাঁহার প্রথম কীর্তি সতীদাহনিবারক আইন (১৮২৯)। দ্বিতীয় কীর্তি 'ঠগী'-দস্যুদের দমন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ যখন নূতন করা হয়, তখন তাহাতে বলা হয় যে, শুধু জাতি, বর্ণ, কিংবা বংশের অজুহাতে কোন প্রজাই কোম্পানীর অধীনে উচ্চতম পদের জন্যও অনধিকারী বলিয়া গণ্য হইবে না। অতএব এই ধারণা অনেকের মনে স্থান পাইল যে, উচ্চাভিলাষী ভারতবাসীদিগকে ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ এবং ইউরোপীয় ধরণে শিক্ষিত করিতে হইবে ; নতুবা রাজকার্যে তাহাদের পক্ষে উচ্চপদে নিয়োগ সম্ভব হইতে পারে কিরূপে? এযাবৎ ধরিয়াই লওয়া হইয়াছিল যে, বিদ্যাশিক্ষার জন্য কোম্পানীবাহাদুর কর্তৃক বরাদ্দ টাকা শুধু 'দেশীয়' অর্থাৎ সংস্কৃত এবং আরবী-ফার্সী শিক্ষার নিমিত্তই ব্যয়িত হইতে পারে। কিন্তু বেন্টিঙ্কের নবনিযুক্ত (১৮৩৪) আইন-সচিব মেকলে সাহেব মত প্রকাশ করিলেন যে, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচারকল্পে এই টাকা খরচ হইতে আইনতঃ কোনই বাধা নাই। সংস্কৃত ও আরবী-ফার্সী সাহিত্যের প্রতি তিনি তাঁহার স্বভাবসুলভ আলঙ্কারিক ভাষায়

নানারূপ কটূক্তি বর্ষণ করিলেন। পুরানী রোশনীর দল মনঃক্ষুণ্ণ হইলেও কার্যতঃ কোন বাধা দিতে পারিলেন না। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ তারিখে লর্ড বেণ্টিঙ্ক ঘোষণা করিলেন যে, গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরী টাকা শুধু পাশ্চাত্ত্য দর্শন-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্যই ব্যয়িত হওয়া উচিত এবং সেই শিক্ষা দেওয়া হইবে ইংরেজী ভাষায়। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদকল্পে শেক্‌স্‌পীয়ার ও প্রিন্সেপ শিক্ষাপরিষৎ হইতে পদত্যাগ করাতে বেণ্টিঙ্কের আদেশে স্বয়ং মেকলে কমিটির সারথ্য গ্রহণ করিলেন। যখন দুই দলে এরূপ দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, তখন হজসন (Hodgson) নামক একজন বিজ্ঞ ইংরেজ এই সুপরামর্শ দিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানই শিখানো হউক, কিন্তু দেশীয় ভাষাতে শিখানো হউক। বলা বাহুল্য, তখনকার অবস্থায় ঐ পরামর্শ হইয়াছিল অরণ্যে রোদন। বেণ্টিঙ্কের শেষ কীর্তি কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন।

সতীদাহ নিবারণ, ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন, মেডিকেল কলেজ স্থাপন—এগুলি নয়ী রোশনীরই জয়। ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই সকল কাজ দেশের চিন্তাশীল ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অনুমোদনক্রমেই হইয়াছিল। লর্ড বেণ্টিঙ্ক যে জনমতকে রূঢ়ভাবে উপেক্ষা করিয়া ইংরেজী-শিক্ষা প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা নহে। বস্তুতঃ নব্যবঙ্গ ইতঃপূর্বেই তাহার পথ বাছিয়া লইয়াছিল। বেণ্টিঙ্কের নিকট সে পাইল রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা। সেই পৃষ্ঠপোষকতার সাহায্যে সে নিজের আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল। আদর্শের বর্ণনা করিতে গিয়া নব্যবঙ্গের ইতিহাস-সঙ্কলয়িতা ৺শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—"তদবধি ইহাদের দল হইতে কালিদাস সরিয়া পড়িলেন; শেক্সপীয়র সেস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; মহাভারত-রামায়ণাদির নীতির উপদেশ অধঃকৃত হইয়া Edgeworth's Tales (এজওয়ার্থের গল্প) সেই স্থানে আসিল; বাইবেলের সমক্ষে বেদ-বেদান্ত-গীতা প্রভৃতি দাঁড়াইতে পারিল না।... নব্যবঙ্গের তিন প্রধান দীক্ষাগুরুর হস্তে তাঁহাদের দীক্ষা হইয়াছিল। প্রথম দীক্ষাগুরু ডেভিড হেয়ার, দ্বিতীয় দীক্ষাগুরু ডিরোজিও, তৃতীয় দীক্ষাগুরু মেকলে। তিনজনই তাঁহাদিগের একই ধুয়া ধরাইয়া দিলেন—প্রাচীতে যাহা কিছু তাহা হেয় এবং প্রতীচীতে যাহা আছে তাহাই শ্রেয়ঃ।"

প্রতীচ্য-পক্ষপাতিত্ব এবং উচ্ছৃঙ্খলতাই ছিল নব্যবঙ্গের প্রধান দুইটি বৈশিষ্ট্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন এই প্রথমাভিব্যক্তির মূর্ত প্রতীক।

এরূপ বলা হইয়াছে যে, তিনি পুত্ররূপে উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন, পিতারূপে ও স্বামিরূপে উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন, কবিরূপে, ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক জীবনে—কোনটাতেই তিনি গতানুগতিকতা অথবা বাঁধন মানিয়া চলেন নাই।

পাশ্চাত্ত্য নূতন জ্ঞানের (New Learning) আমদানীর বিষয় খুব সংক্ষেপে বলা হইল। এই আমদানীর ফলে ধর্মচিন্তায়, ধর্মানুষ্ঠানে এবং সামাজিক আচার-ব্যবহারে যে বিপর্যয় দেখা দিল, এখন তাহার কথা কিছু বলা প্রয়োজন। হিন্দুর ন্যায় ধর্মপ্রাণ জাতির মধ্যে যে-কোন জ্ঞানান্দোলন ধর্মান্দোলনে পর্যবসিত না হইয়া গত্যন্তর ছিল না।* নূতন জ্ঞানের আলোক প্রথমেই পড়িল ধর্মের উপর। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ধর্মসংস্কার-আন্দোলনের অগ্রণী। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সমস্ত ধর্মশাস্ত্রই তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন। বেদের উপদিষ্ট নিরাকার-উপাসনার উপরেই ছিল তাঁহার দৃঢ় আস্থা। কলিকাতায় আগমনের পর সাকারোপাসনার বিরোধী কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিত হইয়া ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি 'আত্মীয় সভা' নামক একটি সভা স্থাপন করেন। তাঁহার নিজ বাটীতেই সভা বসিত এবং উহাতে সাধারণতঃ বেদান্তশাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও বিচার হইত। তখন হইতেই তিনি বেদান্তদর্শনের এবং বিবিধ উপনিষদের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। শাস্ত্রানুযায়ী সাকার অপেক্ষা নিরাকার উপাসনাই যে শ্রেষ্ঠতর, উহা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে তিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের সহিত অনেক তর্কবিচারেও লিপ্ত হন। তজ্জন্য এবং অন্যান্য কারণে তাঁহাকে হিন্দুসমাজে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হয়। প্রথমাবস্থায় তিনি আপন গৃহেই নিজ মতানুযায়ী দু'বেলা পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেন। তৎপরে উইলিয়ম আড্যাম সাহেবের প্রতিষ্ঠিত ইউনিটেরিয়ান সোসাইটির প্রার্থনা-সভায় যোগদান করেন। "এই সভাতে ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টীয়ানদিগের মতানুসারে

* বাঙ্গালী জাতির একটা বৃহৎ অংশ মুসলমান-সম্প্রদায়। তাঁহাদের সম্পর্কে কিছুই এখানে বলা হয় নাই। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, উনবিংশ শতাব্দীতে যে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ও নবজাগরণ বাংলাদেশে হইয়াছিল, তাহা মুসলমান-সমাজকে মোটেই স্পর্শ করে নাই। মুসলমানেরা ইংরেজীশিক্ষা এবং স্বাধীনচিন্তার আন্দোলন হইতে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে দূরে রাখিয়াছিলেন। কেন এরূপ ঘটিয়াছিল এবং পরিণামে উহার ফলাফল কি হইয়াছে, সেই আলোচনা এখানে অনাবশ্যক।

ঈশ্বরোপাসনা হইত। রাজা রামমোহন রায় এই সভাতে তাঁহার পুত্রগণ, কয়েকজন দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি এবং তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব, এই দুই শিষ্য সমভিব্যাহারে গমন করিতেন। একদিবস সভা ভঙ্গ হইলে তাঁহারা গৃহপ্রত্যাবর্তন করিতেছেন, এমন সময় তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব বলিলেন যে, বিদেশীয়দিগের উপাসনাস্থলে আমাদের যাইবার প্রয়োজন কি? আমাদের নিজের একটি উপাসনাগৃহ প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। এই কথাটি রামমোহন রায়ের মনে লাগিল।" দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ কয়েকজন বন্ধুর সহিত পরামর্শক্রমে এবং তাঁহাদের সাহায্যে ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ীর বৈঠকখানা-ঘর ভাড়া লইয়া ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই ভাদ্র তথায় ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্ত ব্রহ্মসভা স্থাপিত করিলেন। "প্রতি শনিবার সন্ধ্যা সাতটা হইতে নয়টা পর্যন্ত সভার কার্য হইত। দুইজন তেলুগু ব্রাহ্মণ বেদ, এবং উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ্ পাঠ করিতেন। পরে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলে, সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইত। ...কলিকাতাস্থ হিন্দুগণ অনেকে সভায় উপস্থিত হইতেন।" উক্ত সভাসংস্থাপনের অল্পকাল মধ্যেই যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হওয়াতে রামমোহন রায় চিৎপুর রোডের উপর একটি নূতন বাটী নির্মাণ করাইয়া ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১১ই মাঘ সভাকে তথায় স্থানান্তরিত করিলেন। সমসাময়িক বিবরণ হইতে জানা যায় যে, প্রায় পাঁচশত হিন্দু প্রতিষ্ঠা-উৎসবে উপস্থিত ছিলেন এবং নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর দক্ষিণা দেওয়া হইয়াছিল।

মন্দিরসংক্রান্ত ট্রাষ্টদলিলে এরূপ লিখিত আছে যে, "বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা, অনন্ত, অগম্য, অপরিবর্তনীয় ঈশ্বরের উপাসনার জন্যই" উহার স্থাপনা। "যে-কোন ব্যক্তি ভদ্রভাবে, শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা করিতে আসিবেন, তাঁহারই জন্য উপাসনামন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত; জাতি, সম্প্রদায়, ধর্ম, সামাজিক পদ—এ সকলের কিছুই বিচার নাই।" মন্দিরের ভিতরে "কোন প্রকার ছবি, প্রতিমূর্তি বা খোদিত মূর্তি ব্যবহৃত হইবে না। নৈবেদ্য, বলিদান প্রভৃতি কোন সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান হইবে না। কোন প্রাণিহিংসা হইবে না। কোন প্রকার আহার, পান হইবে না। যে-কোন জীব বা পদার্থ কোন মনুষ্য বা সম্প্রদায়ের উপাস্য,—এখানকার বক্তৃতায় বা সঙ্গীতে বিদ্রূপ, অবজ্ঞা বা ঘৃণার সহিত তাহার বিষয় উল্লেখ করা হইবে না। ...যাহাতে জগতের

স্রষ্টা ও পাতা পরমেশ্বরের ধ্যান-ধারণার উন্নতি হয়,—প্রেম, নীতি, ভক্তি, দয়া, সাধুতার উন্নতি হয় এবং সকল ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়, এখানে সেইপ্রকার উপদেশ, বক্তৃতা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইবে। অন্য কোনরূপ হইতে পারিবে না।" *

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বিস্তার, সমাজসংস্কার, প্রচলিত হিন্দুধর্মের উপর আক্রমণ, বেদান্তপ্রচার, মিশনারীদের সহিত তর্ক, বিদেশগমন প্রভৃতি নানা দুঃসাহসিক কাজ রামমোহন করিয়াছিলেন; যত রকম ভাবে পারা যায়, তিনি সমাজকে ঝাঁকুনি দিয়াছিলেন। নিন্দকেরা যাহাই বলুক, তাঁহার জীবনী ও তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, একজন খাঁটি ভারতবাসিরূপেই তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানের নিকট তিনি কখনও আত্মবিক্রয় করেন নাই। বিচারবুদ্ধির দ্বারা ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্নিহিত অর্থ যতটুকু উদ্ঘাটন করা সম্ভব, তাহাতেও তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার কশাঘাত অনেক স্থলে তীব্র হইয়া থাকিলেও তখনকার সামাজিক অবস্থায় উহার খুবই প্রয়োজন ছিল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সহিত বিচারে তিনি সর্বদাই শাস্ত্রবাক্য ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেন। তিনি যে হিন্দু এবং তিনি যে হিন্দুশাস্ত্রেরই যথার্থ ব্যাখ্যা করিতেছেন—এ বিষয়ে তাঁহার মনে কখনও কোন সন্দেহ ছিল বলিয়া মনে হয় না। নিজের প্রচারিত মতবাদকে রামমোহন বিশুদ্ধ 'ব্রাহ্মণ্য ধর্ম' বলিয়াই ব্যাখ্যা করিতেন, উহাকে স্বরচিত এবং বেদবিরুদ্ধ অথবা বেদনিরপেক্ষ বলিয়া কখনও ঘোষণা করেন নাই। ইহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বস্তু যে, শুধু বেদোপনিষৎ নহে,—তন্ত্র এবং স্মৃতিকেও তিনি শাস্ত্রীয় মর্যাদা দিতে ত্রুটি করেন নাই,—এবং শাস্ত্রের ব্যাখ্যানে তিনি সর্বদাই 'মীমাংসকের' পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন।† উপাসনা-মন্দিরে তিনি শর্তসাপেক্ষভাবে সকল ধর্মাবলম্বী লোককেই আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহাও সত্য যে, কার্যতঃ সেখানে হিন্দুশাস্ত্রোদ্ধৃত মন্ত্রে এবং মোটের উপর হিন্দুরীতিতেই

* নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত' (পঞ্চম সংস্করণ, অষ্টম অধ্যায়)।

† দ্রষ্টব্য—বিপিনচন্দ্র পাল—(১) চরিতচিত্র। 'ব্রাহ্মসমাজ ও রাজা রামমোহন রায়'; 'রামমোহন ও ব্রহ্মসভা'। (২) বাংলার নবযুগ—প্রথম ও দ্বিতীয় কথা।

উপাসনার কাজ সম্পন্ন হইত। একথা কিছুতেই বলা যাইতে পারে না যে, কোন নূতন ধর্ম কিংবা সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ড-যাত্রা করেন, আর তাহার অব্যবহিত পূর্বে আলেকজাণ্ডার ডাফ্ সাহেব কলিকাতায় আসিয়া খৃষ্টধর্মের প্রচার আরম্ভ করেন। শিক্ষাদানকার্যের ভিতর দিয়া ডাফ্ সাহেব খৃষ্টধর্মপ্রচারে ব্রতী হন। আর প্রথম যখন তিনি ইংরেজী স্কুল স্থাপনে অগ্রসর হন, তখন রামমোহন রায় তাঁহাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন।* খৃষ্টধর্মের প্রচার অবশ্য তৎপূর্বেও হইয়াছিল; কিন্তু পাদ্রী ডাফ্ এবং তাঁহার সহকর্মী ডিয়ালট্রির ন্যায় শক্তিমান্ প্রচারক পূর্বে কখনও এদেশে আসেন নাই। ইঁহাদের বক্তৃতা ইংরেজীশিক্ষিত যুবকদিগকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া দিল। এই প্রচারের ফলে ডিরোজিও-শিষ্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশ-চন্দ্র ঘোষ খৃষ্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করিলেন (১৮৩২)। বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ভদ্র যুবকেরা এভাবে স্বধর্ম ত্যাগ করাতে সমাজপতিগণ বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। এই অনিষ্ট-নিবারণের উদ্দেশ্যে তাঁহারা উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রবীণদের পক্ষে নবীনের দলকে ঠেকাইয়া রাখা দিনদিনই কঠিন হইয়া পড়িল। হিন্দু কলেজের যুবকেরা সহজেই প্রচলিত হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধী হইয়া উঠিত, কেহ কেহ আবার খৃষ্টধর্মের

* ইহা আশ্চর্য ঠেকিতে পারে যে, রাজা রামমোহনের ন্যায় একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যক্তি হিন্দুধর্মের বিদ্বেষী পাদ্রী সাহেবকে সাহায্য করিতে গেলেন, বিশেষতঃ যখন ডাফ্ সাহেব ইউনিটেরিয়ান দলভুক্ত ছিলেন না। নিম্নোদ্ধৃতি হইতে এ সম্পর্কে রাজার মনোভাব বুঝা যাইবে:

"ডাফ্ সাহেবের স্কুলে বাইবেল পাঠ হইত বলিয়া তাঁহার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। তিনি বলিতেন যে, সকল প্রকার শিক্ষা ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। বিদ্যালয়ে বাইবেল-শিক্ষা হইলে তাঁহার মতে কোন প্রকার অনিষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিশেষ উপকারেরই সম্ভাবনা। ডাফ্ সাহেবের স্কুল যেদিন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, ছাত্রগণ বাইবেল পড়িতে আপত্তি করিলে, রামমোহন তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—'বাইবেল পড়িলেই খ্রীষ্টিয়ান হয় না। আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত বাইবেল পাঠ করিয়াছি, অথচ খ্রীষ্টিয়ান হই নাই; কোরাণ পাঠ করিয়াছি, অথচ মুসলমান হই নাই। আবার হোরেস্ উইলসন্ সাহেব হিন্দুশাস্ত্র পড়িয়াছেন, অথচ তিনি হিন্দু হন নাই। বিচারপূর্বক সত্য গ্রহণ করিবে। কেহ তোমাদিগকে বলপূর্বক খ্রীষ্টিয়ান করিবে না।"

—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী'।

প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িত। যেহেতু মদ্যপায়ী এবং কুক্কুট ও গো-মাংসভোজী খৃষ্টানেরাই পৃথিবীর অধীশ্বর এবং সভ্যতায় ও শিক্ষাদীক্ষায় সর্বাপেক্ষা উন্নত, অতএব এই ধারণাই অনেক যুবকের মনে অনায়াসে স্থান পাইত যে 'সভ্য' ও 'শিক্ষিত' হইতে গেলে মদ্যপান ও নিষিদ্ধ-মাংস-ভোজন একান্ত আবশ্যক। যুবকদের মধ্যে ত্যাগ ও সৎ-সাহসের অভাব ছিল না ; কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা ও ভারতীয় সাধনার কিছুমাত্র পরিচয় না পাইয়া তাহারা ভ্রান্তপথে অগ্রসর হইতেছিল।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রথমাভিঘাতে বিভ্রান্ত হিন্দুসমাজের যখন এইরূপ দুর্দিন ও ভগ্নদশা, তখন ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপিত হয়। ইতিহাসে এই ঘটনার তাৎপর্য ও গুরুত্ব কত অধিক তাহা বুঝাইবার জন্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সামান্য একটু উক্তি উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে। তিনি লিখিয়াছেন—"তাঁহার (দেবেন্দ্রনাথের) প্রকৃতির বিশেষত্ব ও মহত্ত্ব এই যে, যখন দেশের শিক্ষিত দলের মধ্যে প্রতীচ্যানুরাগ প্রবল, সকলেই পশ্চিম দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, তখন তিনি এদেশের প্রাচীন জ্ঞানসম্পত্তির প্রতি মুখ ফিরাইলেন এবং বেদ-বেদান্তের আলোচনার জন্য তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন করিলেন। তিনি ধর্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন ; কিন্তু আপনার কার্যকে জাতীয়তারূপ ভিত্তির উপর স্থাপিত রাখিতে ব্যগ্র হইলেন।"

তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যগণ নিজেদের ধর্মমতকে 'বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম' এই আখ্যা দিয়াছিলেন। 'ব্রহ্মসভা' এবং 'ব্রাহ্মসমাজ' শব্দ দুইটি ইতঃপূর্বে ব্যবহৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু 'ব্রাহ্মধর্ম' কথাটির তখনও প্রচলন কিংবা উৎপত্তি হয় নাই। রামমোহন রায়ের বিলাতগমনের, বিশেষ করিয়া তাঁহার দেহত্যাগের পর, ব্রহ্মমন্দিরে লোকসমাগম খুব কমিয়া গিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের ভাষায় "ব্রাহ্মসমাজ যেন অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল—স্পন্দনহীন হইতেছিল ; তাহার যতদূর পর্যন্ত দুর্গতি হইতে পারে তাহা হইয়াছিল।" রামমোহন রায়ের বিশ্বস্ত অনুচর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কোনরকমে দীপশিখাটি জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন, একেবারে নিভিতে দেন নাই—এই পর্যন্ত। দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন, ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য ও তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্দেশ্য মূলতঃ এক। উভয়েরই উদ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞানের এবং নিরাকার-উপাসনার প্রচার। অতএব তাঁহার মনে হইল দু'য়ের পৃথক

থাকার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভাকে ব্রাহ্মসমাজের সহিত যুক্ত করিয়া দিলেন। "যখন তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত তাহার (অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের) পরিণয় হইল, তখন তাহার প্রাণসঞ্চার হইল। ১৭৬৩ শকে (১৮৪২) তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত যোগ না হইলে ব্রাহ্মসমাজের কি পরিণাম হইত বলা যায় না। হয়ত আমরা ইহার কিছুই দেখিতে পাইতাম না।"*

এই সময়কার আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রকাশন। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে এই পত্রিকার দান অনেকখানি। নাম 'তত্ত্ববোধিনী' হইলেও শুধু ব্রহ্মবিদ্যার প্রচারেই উহার কাজ সীমাবদ্ধ ছিল না। নানাবিষয়ক প্রবন্ধ উহাতে স্থান পাইত ; রচনার ভাষা ছিল প্রাঞ্জল এবং রুচি ছিল মার্জিত। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' চিন্তা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করিয়াছিল—বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

রামমোহন রায় কোনও দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠন করিয়া যান নাই। যেমন তাঁহার মত ছিল উদার, তেমনই তাঁহার সমাজের বন্ধনও ছিল কতকটা শিথিল। তাঁহার মতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক স্ব স্ব সমাজে থাকিয়াই ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনায় যোগদান করিতে পারিত—শুধু এইটুকু দরকার ছিল যে, নিরাকারোপাসনায় বিশ্বাসী হইতে হইবে। অপর পক্ষে দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন সকল বিষয়েই নিয়মশৃঙ্খলার পক্ষপাতী। তত্ত্ববোধিনী সভাকে ব্রহ্মসভার সঙ্গে মিলিত করার পর তিনি স্থির করিলেন—"যাহারা বিধিপূর্বক পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মোপাসনাকে অবলম্বন করিয়াছে, এমন একদল লোকের ধর্মমণ্ডলী বা সম্প্রদায়" গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহা হইতেই 'ব্রাহ্মসমাজ'রূপী সুস্পষ্ট, পৃথক্ সমাজের প্রতিষ্ঠা। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই পৌষ বৃহস্পতিবার দিবা দ্বিপ্রহরে দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং আরও কুড়িজন যুবক-সমভিব্যাহারে আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে 'ব্রাহ্মধর্মে' দীক্ষিত হইলেন। "অদ্য আমাদের প্রতিহৃদয়ে ব্রহ্মধর্মবীজ রোপিত হইল। আশা হইল এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া কালে অক্ষয় বৃক্ষ হইবে, এবং যখন ইহা ফলবান্ হইবে, তখন ইহা হইতে আমরা নিশ্চয় অমৃতফল লাভ

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত' ৮

করিব।” দুই বৎসর যাইতে না যাইতে অন্যূন পাঁচশত ব্যক্তি বিধিপূর্বক ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করিলেন।

এদিকে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে খৃষ্টান পাদ্রীদের প্রচার পূর্ণমাত্রায় চলিতেছিল। মূর্তিপূজা প্রভৃতির ত কথাই নাই; ডাফ্ সাহেব বেদান্তকেও আক্রমণ করিতে ছাড়িতেন না। অতএব ব্রাহ্মনেতৃগণ, যাঁহারা ‘বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্মে’র রক্ষক সাজিয়াছিলেন, তাঁহারা বেদান্তের সপক্ষে এবং পাদ্রীদের যুক্তির বিরুদ্ধে জোর কলম চালাইতে লাগিলেন। দুই দলে খুব কথা-কাটাকাটি আরম্ভ হইল।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ডাফ্ সাহেব এক নাবালক দম্পতিকে (উমেশচন্দ্র সরকার ১৪ ও তাহার পত্নী ১১ বৎসর) খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। উমেশচন্দ্রের পিতা রাজেন্দ্র সরকার ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের কর্মচারী। যখন বিচারালয়ে আবেদন করিয়াও এই বিষয়ে কোন প্রতিকার হইল না, তখন দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং অগ্রণী হইয়া খৃষ্টানী প্রচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। যাহাতে হিন্দু বালক ও যুবকেরা খৃষ্টানী সংস্পর্শে না যাইয়া ইংরেজী শিক্ষা পাইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে ‘হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয়’ ও ‘শীল্‌স্ ফ্রি স্কুল’ (Seal's Free School) প্রতিষ্ঠিত হইল।

বাহিরে এই হিন্দুয়ানী রক্ষার চেষ্টা উগ্রভাবে দেখা দিলেও ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে ডাফ্ সাহেবের আক্রমণের ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এতকাল ব্রাহ্মেরা স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন যে, বেদ ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট। রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন—“আমরা ঈশ্বর-প্রত্যাদেশ বিশ্বাস করিতাম বটে, কিন্তু বেদ কেবল যুক্তিযুক্ত বাক্যপূর্ণ বলিয়া তাহা ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিতাম।” যখন ঘনিষ্ঠতর পরিচয়, অধিকতর বিচার ও খৃষ্টানী সমালোচনার ফলে ব্রাহ্মরা দেখিতে পাইলেন যে, বেদের সকল কথাই যুক্তিযুক্ত নয়, তখন বেদকে আর তাঁহারা ‘আপ্ত’ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলেন না। এই পরিবর্তনের মধ্যে সম্ভবতঃ অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাজনারায়ণ বসুর হাত অনেকখানি ছিল; কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও যে গোড়াতে বিরোধী ছিলেন, তাহা মনে হয় না। ব্রাহ্মসমাজের নিয়মপত্রে যে ‘বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম’ কথার উল্লেখ ছিল, ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তাহা তুলিয়া দিয়া ‘ব্রাহ্মধর্ম’ এই শব্দটি ব্যবহৃত হইল। ইহা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রাচীন ও মধ্যযুগে

অনেক দুঃসাহসিক দার্শনিক গবেষণা ভারতবর্ষে হইয়াছিল; কিন্তু কোন হিন্দু দার্শনিক নিজেকে বেদ-বিরোধী বলিয়া প্রচার করেন নাই। যে-কোন মতবাদ হউক, বেদ উহার মূল—একথা স্বীকার না করিলে কোন শিষ্ট ব্যক্তি উহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করাও আবশ্যক মনে করিতেন না। হিন্দুদের মতে বেদ অক্ষয় অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার—বেদের যাহা বিরোধী, তাহা অ-জ্ঞান কিংবা কু-জ্ঞান; বেদকে যে-ব্যক্তি ভ্রান্ত বলিয়া মনে করে সে নাস্তিক। ব্রাহ্মগণ বেদ অমান্য করিয়া পরিণামে হিন্দুসমাজের সহিত এক অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদের সূচনা করিলেন।

প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধিই যদি ধর্মের একমাত্র ভিত্তি হয়, তবে প্রত্যেকের ধর্মই আলাদা। এরূপ ভিত্তির উপর কোন সম্প্রদায় গড়িয়া তোলা যায় না। বেদ আপ্তবাক্য এবং সর্বমান্য নহে—একথা প্রচার করিয়া ব্রাহ্মনেতৃবৃন্দ মুশকিলে পড়িয়া গেলেন। সঙ্ঘকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 'ব্রাহ্ম-ধর্মগ্রন্থ' রচিত হয়। প্রারম্ভে আছে 'ব্রহ্মোপাসনা,' তৎপরে প্রথম খণ্ডে আছে ব্রাহ্মধর্মের 'উপনিষৎ' এবং দ্বিতীয় খণ্ডে আছে ব্রাহ্মধর্মের 'অনুশাসন'। বিবিধ উপনিষৎ ও স্মৃতিশাস্ত্র হইতে বাছাই-পূর্বক শ্লোক সংগ্রহ করিয়া 'ব্রাহ্ম-ধর্মগ্রন্থ' রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থসম্পর্কে উহার রচয়িতা দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"ইহা আমার দুর্বল বুদ্ধির সিদ্ধান্ত নহে, ইহা মোহবাক্যও নহে, প্রলাপবাক্যও নহে। ইহা আমার হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত, তাঁহারই প্রেরিত সত্য।" বস্তুতঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক 'আপ্ত' এই নূতন 'বেদ' ব্রাহ্ম-সমাজের সংহতিরক্ষার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। এ সম্পর্কে তাঁহার নিজের লেখা হইতেই আর একটু উদ্ধৃত করা হইতেছে। "রামমোহন রায় মনে করিয়াছিলেন, যাহারা বেদ মানে তাহাদের মধ্যে বেদ রক্ষা করিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচলিত করা; কিন্তু যাহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত হইয়া বেদকে আপ্তবাক্য বলিয়া না মানিবে, তাহাদের মধ্যে কি করা, ইহা তাঁহার তখন বিবেচনায় আইসে নাই। ক্রমে সেই কাল উপস্থিত হইল, ক্রমে বেদের দোষসকল পরিস্ফুটিত হইয়া পড়িল। তখন আমরা মনে করিলাম যে, বেদের মধ্যে যে সত্য আছে তাহাই সংকলন করা। এইজন্য দুই বৎসর লইয়া শ্রুতিস্মৃতি হইতে টীকার সহিত ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া, ব্রাহ্মধর্মের বীজ তাহাতে অন্তর্নিবেশিত করা হইল।" ইহা

বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যদিও 'শাস্ত্র-প্রমাণ'কে তিনি অস্বীকার করিলেন, তথাপি শাস্ত্রবাক্যসমূহ হইতেই 'ব্রাহ্মধর্ম' সংকলিত হইল এবং এই সংকলনকার্যে 'সহজজ্ঞান' এবং 'আত্মপ্রত্যয়'ই ছিল তাঁহার অবলম্বন। বলা বাহুল্য, ইহা তাঁহার নিজের এবং একার 'সহজজ্ঞান' ও 'আত্মপ্রত্যয়'। প্রত্যেকের সহজজ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়কে আমল দিতে গেলে ধর্মের একতা বজায় রাখা যায় না। অথবা, রাখিতে গেলে অধিকাংশের মতকে সর্বমান্য করিতে হয়। এই চেষ্টাও যে বাদ পড়িয়াছিল তাহা নহে। দেবেন্দ্রনাথ নিজে বলিয়াছেন, "শেষে ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়াই ব্রাহ্মদলের মধ্যে বিবাদ পড়িয়া গেল। তাঁহারা তর্ক উপস্থিত করিলেন, ঈশ্বর অনন্ত কি প্রকারে হইতে পারেন? হস্তোত্তলন কর, দেখি, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ কি না? কি হাস্যাস্পদ! দ্বার রুদ্ধ করিয়া হস্তোত্তলনদ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করা যে কি হাস্যাস্পদ, ইহা তাঁহারা তখন বুঝিতেন না।" মহর্ষির 'সহজজ্ঞান' ও 'আত্মপ্রত্যয়'কে ব্রাহ্মসমাজ মোটের উপর মানিয়া লওয়াতে এই সংকট আপাততঃ কাটিয়া গেল।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এক অসাধারণ শক্তিমান্ পুরুষ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। লোকনায়ক হইবার ও মানুষকে মাতাইবার জন্য যে সমস্ত গুণের আবশ্যক, তাহার পূর্ণমাত্রায় অধিকারী ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে দেবেন্দ্রনাথ উত্তর-পশ্চিম ভারতে ভ্রমণে গিয়াছিলেন। দুই-বৎসরকাল সেখানে কাটাইয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের শেষে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। আসিয়া দেখিলেন যে "তাঁহার সহাধ্যায়ী প্যারীমোহন সেনের দ্বিতীয় পুত্র কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি কেশবকে আপন প্রেমালিঙ্গনের মধ্যে গ্রহণ করিলেন। উভয়ের যোগ মণিকাঞ্চনের যোগের ন্যায় হইল। উভয়ে মিলিত হইয়া নব নব কার্যে হস্তার্পণ করিতে লাগিলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ব্রাহ্ম-সমাজে নবশক্তির সঞ্চার দেখা গেল।" ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১লা বৈশাখ যুবক কেশবচন্দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে বৃত এবং 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত হইলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের গুণমুগ্ধ ছিলেন ও তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন বটে, কিন্তু দুইজনের প্রকৃতি ও চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে গভীর পার্থক্য

ছিল। মহর্ষির ধর্মমতের মূল ছিল উপনিষৎ, কিন্তু যুবক কেশবচন্দ্রের প্রেরণার প্রধান উৎস ছিল যীশুখৃষ্টের জীবন ও উপদেশ। সমাজসংস্কারের ব্যাপারে মহর্ষি ছিলেন রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী—কোনরূপ বড় রকমের বিপ্লব তিনি চাহিতেন না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আটঘাট বাঁধিয়া ব্রাহ্মধর্মের মতবাদ ও আচার-অনুষ্ঠানকে সুস্পষ্ট ও সুসংবদ্ধ রাখিতে ব্রতী ছিলেন; হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে অযথা সংগ্রাম বাধাইবার কোন ইচ্ছাই তাঁহার মনে স্থান পাইত না। তিনি ভাবিতেন যে হিন্দুধর্মের অসার ও মিথ্যা অংশ বর্জন করিয়া, উহাকেই সংস্কৃত ও পরিশুদ্ধ করিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্মের রূপ দিয়াছেন। স্পষ্টই তিনি বলিতেন, "হিন্দুসমাজকেই ব্রাহ্মসমাজ করিতে হইবে।" ব্রাহ্মদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"পৌত্তলিকতা-পঙ্কে নিমগ্ন হিন্দুধর্মকে পুনরুদ্ধার করিবার নিমিত্ত যে সময়ে যে অবস্থাতে রামমোহন রায় আসিবার উপযোগী, সেই সময়ে সেই অবস্থাতে তিনি আসিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম অতি প্রশস্ত ও উদার ধর্ম—ইহা সকল প্রকার উন্নতি আপনার মধ্যে নিবিষ্ট করিতে পারে। অতএব হিন্দুদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া তাহাদের মধ্যে থাকিয়াই ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে হইবে। হিন্দুধর্মকেই উন্নত করিয়া ব্রাহ্মধর্মে পরিণত করিতে হইবে। হিন্দুদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে এ দেশের ব্রাহ্মধর্মের প্রচার-বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে পারিবে না। এই কারণেই বৌদ্ধধর্ম এখানে স্থান পায় নাই; এই কারণেই মোসলমানেরা সাত শত বৎসর পর্যন্ত তরোয়ারের শাসনেও হিন্দুধর্মকে পরাস্ত করিতে পারে নাই; এজন্যই মায়াবী খৃষ্টানেরা শতবৎসর পর্যন্ত কৌশলজাল বিস্তার করিয়াও তাহাকে মুগ্ধ ও কুণ্ঠিত করিতে পারে নাই।"

দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন ধীরে চলার পক্ষপাতী। কিন্তু কেশবচন্দ্রের বিপুল কর্মশক্তি কোন বাধা মানিতে প্রস্তুত ছিল না; ধীরে এবং সাবধানে চলা তাঁহার পক্ষে ছিল অসম্ভব। উপনিষদের আত্মবিদ্যার স্থলে তিনি আনিলেন খৃষ্টীয় ভক্তির প্লাবন। অধিকন্তু তিনি উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন সমাজসংস্কারের ব্যাপারে। জাতিভেদ তুলিয়া দেওয়া, অসবর্ণ বিবাহ, উপাসনা-মন্দিরে উপবীতধারী আচার্যের নিয়োগ—প্রভৃতি কতক বিষয়ে মহর্ষির সহিত ব্রহ্মানন্দের মতবিরোধ উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মসমাজের কার্যপরিচালনা সম্পর্কে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি-অবলম্বনের প্রশ্নও উঠিল। বিরোধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া

অবশেষে এমন অবস্থায় পৌছিল যে, উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ নিবারণ করিবার আর কোন উপায় রহিল না।

অগ্রসর ব্রাহ্মদের সহিত মিলিত হইয়া কেশবচন্দ্র এক নূতন সমাজ গঠিত করিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই নবেম্বর উক্ত সমাজ গঠিত হয় ও উহার নাম রাখা হয় 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'। তদবধি মহর্ষির প্রতিষ্ঠিত পুরাতন সমাজ 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত হইয়াছে। নিজেদের পৃথক্ সমাজ-স্থাপনের পর প্রগতিপন্থী ব্রাহ্মদল একের পর এক নানাবিধ সামাজিক পরিবর্তন ঘটাইয়া চলিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড-ভ্রমণে যান; সেখান হইতে ফিরিয়া সমাজসংস্কারের আন্দোলন তিনি আরও ব্যাপক ও তীব্র করিয়া তুলিলেন।

হিন্দুদের মধ্যে বিবাহ শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী হইয়া থাকে; উহার জন্য পৃথক্ কোন সরকারী আইন-কানুন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদের জন্য যে বিবাহ-পদ্ধতি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সাকারোপাসনা, হোম প্রভৃতি দুই-চারিটি বিষয় বর্জন করিয়া প্রাচীন রীতি সব কিছুই বজায় রাখিয়াছিলেন। ঐরূপ বিবাহ হিন্দুবিবাহ কি না সেই প্রশ্ন কখনও উঠে নাই। কিন্তু ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হয় এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রগতিপন্থী ব্রাহ্মরা দেবেন্দ্রনাথের রচিত পদ্ধতি বর্জন করিয়া এক নূতন পদ্ধতি প্রবর্তিত করেন। ঐরূপ বিবাহ আইনতঃ সিদ্ধ কি না, সেই প্রশ্ন এখন স্বভাবতঃই উত্থাপিত হইল। গবর্ণমেণ্টের এডভোকেট-জেনারেল এই অভিমত দিলেন যে, ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত উভয় প্রকার বিবাহ-পদ্ধতিই আইনতঃ অসিদ্ধ। এই ত্রুটি দূর করিবার নিমিত্ত সরকার বাহাদুর নূতন আইন প্রণয়ন করিতে অগ্রসর হইলেন।

ব্রাহ্মবিবাহ আইন-সম্মত করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৬৮ সনে আইনের এক খসড়া সরকার বাহাদুর কর্তৃক প্রথম রচিত হয়। তিন বৎসর পর্যন্ত ঐ সম্পর্কে আলোচনা চলিবার পর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যখন সংশোধিত খসড়া অনুমোদন করিলেন, তখন (১৮৭১ খৃষ্টাব্দে) আদি ব্রাহ্মসমাজ খসড়া আইন সম্পর্কে ঘোরতর আপত্তি জানাইলেন। তাঁহারা নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া কহিলেন যে, তাঁহাদের সমাজে যে বিবাহবিধি প্রচলিত, তাহা হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত, সুতরাং এই সম্পর্কে আইন-প্রণয়নের কোনই প্রয়োজন নাই এবং

এরূপ আইন-প্রণয়ন তাঁহাদের মনঃপূত নহে। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নানাবিধ কূট তর্ক উত্থাপিত হইল। এই সকল তর্কবিতর্কের কোন মীমাংসা না হওয়াতে সরকার বাহাদুর প্রস্তাবিত আইনের নাম 'ব্রাহ্মবিবাহ আইন' (Brahmo Marriage Act) পরিবর্ত্তিত করিয়া 'নেটিভ বিবাহ আইন' (Native Marriage Act) রাখিলেন এবং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩নং আইনরূপে উহা বিধিবদ্ধ করিলেন। উক্ত আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত প্রত্যেক বিবাহ সরকারী আফিসে পঞ্জীভুক্ত করিতে হয়; পঞ্জীভুক্ত করাইবার সময়ে নবদম্পতীকে ঘোষণা করিতে হয়—'আমরা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পার্শী, বৌদ্ধ, শিখ কিংবা জৈনধর্ম্মে বিশ্বাসী নহি।'

বিবাহ-আইন সম্পর্কে আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত নিজেদের মতবিরোধ মিটাইতে না পারিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ গোড়াতেই সরকারী প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছিলেন। সুতরাং এখন তাঁহারা আইনতঃ নিজেদের হিন্দুসমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া 'অ-হিন্দু' বলিয়া পরিচয় দিতে বাধ্য হইলেন। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, কাজটা ঝোঁকের মাথায়ই হইয়াছিল এবং পরিণামে যে একেবারে আপসোস্ করিতে হয় নাই, তাহাও সম্ভবতঃ নহে।*

* "In the memorial which was drawn up at the instance of Keshub by the Brahmo Samaj of India, and submitted to Government in answer to that from the Adi Samaj, it is distinctly stated that the term 'Hindu' does not include the Brahmos, who deny the authority of the Vedas, are opposed to every form of Brahminical religion, and being eclectics admit proselytes from Hindus, Mahomedans, Christians and other religious sects. Such a statement, no doubt, made it easier for Sir Stephen to secure the enactment of the measure, but this undoubtedly diminished its popularity. Hindus and all other opponents of the law found it impossible to continue their hostility to it, when those who sought its protection voluntarily cast themselves out of the pale of Hindu, as well as every other orthodox communion. But, on the other hand, a large number of Indian theists, both in Bengal and other Presidencies, felt that they could not conscientiously abjure the all-inclusive Hindu name. Keshub was placed in the dilemma of choosing between two painful alternatives; either to disown the Hindu name, or to have no marriage law at all. He preferred to abide by the disadvantage of the former. He always felt that he was a Hindu by nationality, and in the old Aryan spirit. His personal habits in their abstemious simplicity were those of the orthodox Hindu. He despised the

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার অল্পকালের মধ্যেই সেই সমাজের ভিতরে কেশবচন্দ্র অপেক্ষা আরও অধিকতর মাত্রায় প্রগতিপন্থী নূতন সংস্কারক-দলের উদ্ভব হইল। স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁহারা কেশবচন্দ্রকে অতিক্রম করিয়া চলিলেন। উপাসনা-মন্দিরে মহিলারা পর্দার আড়ালে বসিবেন কিংবা প্রকাশ্যে বসিবেন, এই লইয়া মতভেদ উপস্থিত হইল। কোচবিহারের যুবরাজের সহিত কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে এক ঘোরতর মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল এবং কেশবচন্দ্রের বহুসংখ্যক অনুচর তাঁহার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। সেই আন্দোলনের পরিণতিতে 'সাধারণ ব্রাহ্মসাজে'র উৎপত্তি হয় এবং কেশবচন্দ্র 'নববিধান' নামক নূতন ধর্মমত প্রচার ও নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৭৮)। মুখ্যতঃ হিন্দুধর্মের বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিবাদকল্পেই ব্রাহ্মধর্মের উদ্ভব হইয়াছিল; সেই আচার-অনুষ্ঠানের পর্বতে ঠেকিয়াই ব্রাহ্মসমাজ-তরণী খণ্ডবিখণ্ড হইল, যাত্রিগণ বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। সকল যুগে, সকল সমাজেই এরূপ ঘটিয়াছে—ইহা কিছু অস্বাভাবিক কিংবা অভিনব ব্যাপার নহে।

আমরা দেখিয়াছি যে, বিবাহ-রেজেষ্ট্রী-আইনের আন্দোলন উপলক্ষ্যে বিবাদ যখন চরমে পৌঁছিয়াছিল, তখন কেশবচন্দ্রের দল "আমরা হিন্দু নই" বলিয়া হিন্দুসমাজ হইতে একেবারে সরিয়া পড়িলেন। অপর দিকে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের লোকেরা তখন ঠিক তাহার বিপরীত সুর ধরিলেন। তাঁহাদের মুখপাত্রস্বরূপ প্রবীণ নেতা রাজনারায়ণ বসু মহাশয় নিজেদের হিন্দুত্ব উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে সেই সময়ে 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা'-বিষয়ক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বক্তৃতা প্রদান করেন (১৮৭২)। বক্তৃতা-সভায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

outlandish fashions of the day. But the name Hindu came in later times to mean the followers of surrounding idolatries and Brahminical superstitions which he unhesitatingly reprobated. He meant to cover the disadvantage of renouncing the name by an abundance of the true Hindu spirit and life. And both before and after this time, specially since the announcement of the New Dispensation, he made the most heroic efforts to make his movement intensely Hindu in form as well as in essence. Nevertheless the fact remains that the protest against the Hindu name, which the new marriage law made indispensable, will continue to be a serious drawback towards its universal acceptance in India".—From "Keshub Chundar Sen" by P. C. Mazoomdar, Third Edition, pp. 160-161.

স্বয়ং সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু বক্তৃতা দ্বারা হিন্দুধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। নবাগত পাশ্চাত্ত্য ভাবের বন্যা এবং সনাতন ধর্মের আদর্শ—এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান কিছুতেই হইয়া উঠিতেছিল না। একদিকে ডিরোজীও-পন্থীর দল, অপর দিকে ব্রাহ্মসমাজ—উভয়েই হিন্দুর শাস্ত্র, হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান, হিন্দুর সামাজিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়া এবং এক নেতিমূলক মনোভাব অবলম্বন করিয়া নিজেরা কোথাও দাঁড়াইবার স্থান পাইতেছিলেন না। অপর দিকে যে ধর্ম ও সংস্কৃতি হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া এই বিরাট দেশের সমাজকে ধারণ ও পোষণ করিয়া আসিয়াছে—প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও উহাকে নিজের সত্তা হইতে ধুইয়া-মুছিয়া ফেলিবার উপায় ছিল না। স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্মের অভিমান অজ্ঞাতসারে সকলের মন পুনরধিকার করিতেছিল। ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ-আন্দোলন আমাদের দেশের ও সমাজের নানাবিধ উপকার সাধন করিয়াছে; কিন্তু উহার সর্বাপেক্ষা বড় সার্থকতা এই যে, উহা হিন্দুদের মনে নিজের ধর্ম ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কে প্রবল আত্মজিজ্ঞাসার সৃষ্টি করিয়াছিল। আত্মজিজ্ঞাসা ব্যতীত যথার্থ জ্ঞানলাভ কখনও হইতে পারে না। এইজন্য আমরা সকলেই ব্রাহ্ম-আন্দোলনের নিকট ঋণী।

কিন্তু জিজ্ঞাসা জাগ্রত হইবার পর হিন্দুধর্মের নানা পরস্পরবিরোধী মত ও অনুষ্ঠানের মধ্যে আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিরা আত্মপ্রতিষ্ঠার উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। শশধর তর্কচূড়ামণি, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীরা নূতন নূতন ধরনের ব্যাখ্যা দ্বারা নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়কে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন যে, হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান ভুয়া জিনিস নহে; কিন্তু শুধু যুক্তিতর্কের বলে কি কোন ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়? তখন প্রয়োজন হইয়াছিল এমন এক মহাপুরুষের, যিনি সনাতন ধর্মের গূঢ় মর্ম নিজের জীবন-আলেখ্যে রূপায়িত করিয়া দেখাইতে পারেন। পরিবর্তনশীল আচার-অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া যুগ হইতে যুগান্তরে কি করিয়া সনাতন ধর্ম নিজের ঐক্য পূর্বাপর বজায় রাখিয়া আসিয়াছে, কী সেই গুহানিহিত তত্ত্ব যাহার সামর্থ্যে সকল শ্রেণীর অধিকারীর পক্ষেই হিন্দুধর্মের রাজপথ মহাযানরূপে চিরকাল ধরিয়া উন্মুক্ত রহিয়াছে, কী সেই অদৃশ্য শৃঙ্খল যাহা ভূত-প্রেত-উপাসক হইতে আরম্ভ করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গী পর্যন্ত সকলেই এক 'হিন্দু' সংজ্ঞার মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ

করিয়া রাখিয়াছে—এই সকল কথা লোকসমাজে নূতন করিয়া বুঝাইবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। যেখানে সেই প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিকমাত্রায় বিদ্যমান ছিল, যেখানে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সংঘাতে প্রবল ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্ট হইয়াছিল—সেই কলিকাতা-নগরীর উপকণ্ঠে সনাতন ধর্মের নূতন যুগাচার্য গভীর সাধনায় মগ্ন ছিলেন। সিদ্ধিলাভ করিয়া যখন তিনি বাক্যোচ্চারণ করিলেন, তখন শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ইংরেজীনবীশ, বাংলানবীশ—সকলেরই নিকট তাহা সমানভাবে বোধগম্য হইল। নব্যবঙ্গ তাহার হারানো সত্তা ফিরিয়া পাইল। কেশবচন্দ্র কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাহাত্ম্য-প্রচার ও নরেন্দ্রনাথ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে আশ্রয়-গ্রহণের দ্বারা ইহাই সূচিত হইল যে, নব্যবঙ্গ ভারতের সনাতন আদর্শের নিকট মস্তক নত করিল। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানের উন্মাদনায় নব্যবঙ্গ সনাতন ধর্মকে অবহেলা ও অস্বীকার করিয়াছিল। সেই জ্ঞানের অহংকার বিনষ্ট করিবার জন্যই নবযুগের আদর্শ-পুরুষ যেন প্রায় নিরক্ষরবেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নব্যবঙ্গের পাণ্ডিত্যাভিমানকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া তিনি সনাতন ধর্মের মহিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন—নিজের জীবনালোকে তিনি কর্মের পথ, ভক্তির পথ, জ্ঞানের পথ, মুক্তির পথ প্রদর্শন করিলেন—নব্যবঙ্গ তাহার হারানো সংবিৎ ফিরিয়া পাইল।

মহামনীষী রোমাঁ রোলাঁ লিখিয়াছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ভারতের বহু শতাব্দীর সাধনার ফল। কিন্তু কেবল একথা বলিলে সবটুকু বলা হয় না। শুধু অতীত যে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে পরিসমাপ্তি ও সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহা নহে—ভবিষ্যৎও পাইয়াছে সেই দিব্য জীবনের মধ্যে সূচনা ও প্রেরণা। বৃক্ষের সমস্ত মাধুর্য আহরণ করিয়া, বৃক্ষের জীবনকে সার্থক করিয়া উৎপন্ন হয় সুমিষ্ট ফল; কিন্তু সেই ফলের ভিতরেই থাকে বীজ যাহা হইতে আবার অঙ্কুরিত হয় নূতন জীবন। তাই মনে হয়—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন একাধারে ভারতের অতীতব্যাপী সাধনার ফল এবং ভবিষ্যতের আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্কুরিত বীজ।

পিতৃ-পরিচয়

হুগলী জেলার উত্তর-পশ্চিম কোণে দেরেপুর একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে তথায় মাণিকরাম চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক সম্পন্ন গৃহস্থের বাস ছিল। মাণিকরামের তিন পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ক্ষুদিরাম, মধ্যম নিধিরাম, কনিষ্ঠ রামকানাই। কন্যার নাম রামশীলা। জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ দিবার অল্পকাল পরেই মাণিকরাম অকালে পরলোকগমন করেন। অতএব ক্ষুদিরাম যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতেই তাঁহার স্কন্ধে সংসারের গুরুভার নিপতিত হয়। কিন্তু উহা বহনের যোগ্যতা ক্ষুদিরামের যথেষ্টই ছিল। তিনি যেমন ছিলেন কর্তব্যপরায়ণ, তেমনই কর্মকুশল। জমিজমা ও অন্যান্য বিষয়সম্পত্তি যাহা ছিল, তাহার উত্তম ব্যবস্থা করিয়া, পিতার পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক ক্ষুদিরাম অনায়াসে সংসার চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। যথাসময়ে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিবাহ দিলেন এবং ভগ্নী রামশীলাকেও উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ করিলেন।

ক্ষুদিরামের সহধর্মিণীর নাম ছিল চন্দ্রমণি অথবা চন্দ্রাদেবী। তিনিও সর্বাংশে স্বামীর যোগ্যা ছিলেন। মূর্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় তিনি গৃহস্থালি সাজাইয়া-গুছাইয়া রাখিতেন। তাঁহার স্বভাব ছিল শিশুর মত সরল, হৃদয় ছিল করুণার আকর। তাঁহার গৃহদ্বার হইতে কোন প্রার্থী কখনও বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইত না। পরের দুঃখ দেখিলে তাহা দূর করিবার চেষ্টা না করিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। চন্দ্রাদেবীর পতিভক্তি অন্যান্য রমণীগণের নিকট ছিল আদর্শস্থানীয়। তাঁহার স্নেহমমতা ও অমায়িক ব্যবহারের গুণে গ্রামবাসী সকলেই তাঁহাকে পরমাত্মীয় বলিয়া গণ্য করিত।

চাটুয্যে-পরিবারের গৃহদেবতা ছিলেন শ্রীশ্রীরামচন্দ্র। এইজন্য পরিবারের সকলের নামের সঙ্গেই 'রাম' কথাটি সংযুক্ত দেখা যায়। ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রাদেবী উভয়েই পরমভক্তিসহকারে গৃহদেবতার সেবা-পূজা করিতেন। শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় তাঁহাদের দিনগুলি বেশ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যেই কাটিতেছিল। তাঁহারা পুত্রমুখও দেখিতে পাইয়াছিলেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ক্ষুদিরামের জ্যেষ্ঠপুত্র

রামকুমারের জন্ম হয়। উহার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে একটি কন্যাসন্তান জন্মে—নাম রাখা হয় কাত্যায়নী।

কিন্তু চিরকাল কাহারও সুখে যায় না। বিশেষতঃ নিজের প্রিয় ভক্তদিগকে ভগবান্ অধিক দিন সুখসম্পদের মধ্যে ভুলাইয়া রাখেন না। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ক্ষুদিরামের পরীক্ষার দিন সমুপস্থিত হইল। গ্রামের জমিদার রামানন্দ রায় অতিশয় ক্রূরস্বভাব ও অত্যাচারী ছিলেন। শত্রুতাসাধনের জন্য গ্রামবাসী কোনও এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে তিনি মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করেন। বিচারক যাঁহার কথায় সহজেই বিশ্বাস স্থাপন করিবেন, এমন সাক্ষীর প্রয়োজন হওয়াতে তিনি ক্ষুদিরামকে নিজের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে অনুরোধ করিয়া বসিলেন। রামানন্দ রায়ের এরূপ দোর্দিণ্ড প্রতাপ ছিল যে, তাঁহার অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে কেহ ভয়ে মাথা তুলিতে সাহস পাইত না। ক্ষুদিরাম বিষম ভাবনায় পড়িলেন। একে ত তিনি আইন-আদালতের নামেই ভয় পাইতেন; তা' ছাড়া এক্ষেত্রে তিনি নিঃসন্দেহ জানিতেন যে, রামানন্দ রায়ের আনীত অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা—জমিদারের পক্ষে সাক্ষ্য দিলে মিথ্যাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। তাঁহার বিবেকবুদ্ধি উহাতে কিছুতেই সায় দিল না। বিপদের ঝক্কি মাথায় লইয়াই রামানন্দ রায়ের অনুরোধপালনে তিনি অসম্মতি জানাইলেন। ইহার ফল ফলিতে কিছুমাত্র বিলম্ব ঘটিল না। রামানন্দ রায় ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধেও মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। অনতিকালমধ্যে ভিটামাটি উচ্ছন্ন হইয়া ব্রাহ্মণপরিবারকে দেরেপুর পরিত্যাগ করিতে হইল। ক্ষুদিরামের ভাইয়েরা নিজ নিজ শ্বশুরের আশ্রয়ে গেলেন। ক্ষুদিরামের নিজের কোথাও যাইবার স্থান ছিল না। স্ত্রীপুত্র ও গৃহদেবতাকে লইয়া কোথায় যান, কি করেন—এই ভাবনায় যখন তিনি নিতান্ত ব্যাকুল, তখন অযাচিতভাবে আসিল এক বন্ধুর আমন্ত্রণ।

দেরেপুরের পূর্বদিকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে 'কামারপুকুর' গ্রাম। সেখানকার জমিদার* সুখলাল গোস্বামী ছিলেন ক্ষুদিরামের পরম বন্ধু। ক্ষুদিরামের বিপন্ন অবস্থার সংবাদ পাইবামাত্র তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিতে চাহিলেন। বন্ধুর সেই সহানুভূতিপূর্ণ আহ্বানে ক্ষুদিরাম যেন অকূল পাথারে কূল পাইলেন। চিরতরে দেরেপুর ছাড়িয়া তিনি কামারপুকুরে

* এই জমিদারী পরে কামারপুকুরের লাহাবাবুদের নিকট হস্তান্তরিত হয়।

চলিয়া আসিলেন। দেরেপুরে চাটুয্যে-পরিবারের আর কোন লোকজন কিংবা ঘরবাড়ী কিছুই রহিল না। এক সময়ে তাঁহারা যে তথাকার অধিবাসী ছিলেন, সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে রহিল শুধু তাঁহাদের স্থাপিত একটি শিবমন্দির এবং মন্দিরের সংলগ্ন একটি বৃহৎ পুষ্করিণী।

সুখলাল গোস্বামী মহাশয় বন্ধুর বাসের জন্য আপন বসতবাটীর কিয়দংশ ছাড়িয়া দিলেন এবং গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য 'লক্ষ্মীজলা' নামক স্থানে প্রায় পৌনে দুই বিঘা উৎকৃষ্ট ধানের জমিও তাঁহাকে দান করিলেন। 'লক্ষ্মীজলা' বস্তুতঃই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ছিল বলিতে হইবে; কারণ, ঐটুকু জমি হইতেই না কি ক্ষুদিরামের সারা বৎসরের প্রয়োজনীয় ধান্য উৎপন্ন হইত! তাঁহার নিয়ম ছিল, জমির চাষ সম্পন্ন হইলে 'জয় রঘুবীর' বলিয়া প্রথমে নিজের হাতে কয়েক গোছা ধানের চারা তিনি রোপণ করিতেন; তারপর চাষী বাকী জমিতে চারা রোপণ করিত। লক্ষ্মীজলার জমিতে কখনও অজন্মা হইত না।

বাংলার পল্লীতে তখনও ম্যালেরিয়া এবং দারিদ্র্যের করাল ছায়া বিস্তৃত হয় নাই। গ্রামাঞ্চল তখন এখনকার মত জনবিরল ছিল না। বিলাসোপকরণের প্রাচুর্য না থাকিলেও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাব তথায় ছিল না। মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান লোকে অনায়াসেই করিয়া লইতে পারিত। যতদূর জানা যায়, কামারপুকুর তখন ছিল বর্ধিষ্ণু গ্রাম। সেকালের পক্ষে উহার যোগাযোগ-ব্যবস্থাও ছিল উত্তম। গ্রামটির অবস্থান এরূপ যে, হুগলী জেলার অন্তর্গত হইলেও বর্ধমান-শহর, ঘাটাল এবং বনবিষ্ণুপুর ওখান হইতে খুব দূর পড়িত না। বর্ধমান হইতে ৺পুরীধাম পর্যন্ত যে রাস্তা, তাহা কামার-পুকুরের একেবারে ভিতর দিয়াই গিয়াছে। তখনকার দিনে লোক ঐ রাস্তায় পদব্রজে ৺পুরীধামে যাতায়াত করিত। রাস্তার উপরে বহু ময়রার দোকান ছিল। আবলুস কাঠের দ্বারা হুঁকার নলচে তৈরী এবং তাঁতে কাপড়-বোনা ছিল গ্রামের দুইটি প্রধান শিল্প। কৃষিকার্য প্রধান অবলম্বনরূপে ত ছিলই, তাহার উপর এই সকল কুটীরশিল্পের দৌলতে লোকের বেশ দু'পয়সা আয় হইত। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কামার, কুমার, তাঁতি, ময়রা, ছুতার, চাষী, সওদাগর প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোকের বাস থাকার দরুন গ্রামখানির জীবন ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং আনন্দ-মুখরিত। স্থানীয় জমিদারের ভদ্রাসন কামারপুকুরে অবস্থিত থাকাতে গ্রামের সমৃদ্ধি ও প্রখ্যাতি আরও বৃদ্ধি

পাইয়াছিল। কীর্তন, যাত্রা, নানাবিধ আমোদ, উৎসব, পূজা, পার্বণ প্রভৃতি লাগিয়াই থাকিত। গ্রামের জীবনে বেশ একটা জমজমাট ভাব ছিল।

পুরাতন ভগ্ন দেউল, রাসমঞ্চ, ইমারত, দীঘি প্রভৃতি হইতে আজিও কামারপুকুরের বিগত ঐশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সেকালের দীঘিসমূহের মধ্যে 'হালদারপুকুর' একটি প্রধান। গ্রামের ঈশান ও বায়ুকোণে 'বুধুই মোড়ল' ও 'ভূতির খাল' নামক দুইটি শ্মশান। ভূতির খালের * পশ্চিমে গোচারণের মাঠ, মাণিকরাজার আমবাগান ও তৎপরে আমোদর নদ। ভূতির খাল গ্রামের অনতিদূরে আমোদর নদে গিয়া পড়িয়াছে। কামারপুকুরের মাইলখানেক উত্তরে 'ভরস্থবো' গ্রাম +। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন মাণিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন খুব ধনাঢ্য ব্যক্তি উক্ত গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। প্রচুর ধনসম্পত্তি ও বদান্যতার জন্য ঐ অঞ্চলের লোক তাঁহাকে 'মাণিক রাজা' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিল। 'সুখসায়ের', 'হাতীসায়ের' প্রভৃতি বড় বড় দীঘি অদ্যাপি তাঁহার কীর্তি বিলুপ্ত হইতে দেয় নাই। কামারপুকুরের অদূরে আমোদরের তীরে এবং বর্ধমান যাইবার রাস্তার উপরেই 'মান্দারণ' গ্রাম। গড়মান্দারণের ভগ্ন তোরণ, পরিখা এবং অনতিদূরে অবস্থিত শৈলেশ্বর মহাদেবের মন্দির এখনও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পুরাতন গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

গ্রাম হিসাবে কামারপুকুর সকল বিষয়েই দেরেপুর হইতে শ্রেষ্ঠতর ছিল। তবুও দেরেপুরের মায়াবিজড়িত স্মৃতি ক্ষুদিরাম যে সহজে মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। দেরেপুরে তিনি ছিলেন সম্পন্ন গৃহস্থ, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত প্রায় দেড়শত বিঘা জমির তিনি ছিলেন মালিক। আর কামারপুকুরে তিনি হইলেন অপরের আশ্রিত। পিতৃপুরুষের ভিটা হইতে বিতাড়িত হইয়া এবং সচ্ছলতা হইতে অসচ্ছলতার মধ্যে পড়িয়া ক্ষুদিরামের বুকে কী দারুণ ব্যথা বাজিয়াছিল, তাহা আজ কে বলিতে পারিবে? কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলীর সাহায্যে বিচার করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, নূতন অবস্থায় পড়িয়া ক্ষুদিরামের মন ক্রমেই অন্তর্মুখী ও ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন হইয়াছিল।

---

* বর্তমানে ভূতির খালের অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায়; মাণিক রাজার আমবাগানের অবস্থাও তদ্রূপ।

+ এই গ্রামের বর্তমান নাম 'হরিসভা'।

তাঁহার কামারপুকুরের জীবনে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় বৈরাগ্য ও ভক্তির ক্রমবর্ধমান বিকাশ।

ক্ষুদিরামের কামারপুকুর-আগমনের অল্পকাল পরেই এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে। একদা তিনি কার্যোপলক্ষে নিকটবর্তী কোনও গ্রামে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিবার পথে বিশ্রামের জন্য এক বৃক্ষের তলায় উপবেশন করিলে পর ক্লান্তদেহে দক্ষিণ বায়ুর সংস্পর্শে তিনি সহজেই নিদ্রিত হইয়া পড়েন। নিদ্রাযোগে স্বপ্ন দেখেন যে, বালক-বেশী নবদূর্বাদলশ্যাম রঘুপতি তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক বলিতেছেন—"হ্যাঁরে, আমি কতদিন ধরে এই অস্থানে পড়ে রয়েছি, কেউ আমার দিকে ফিরেও তাকায় না। তুই আমায় নিয়ে যা, আমি তোর সেবা-পূজা গ্রহণ করব।" ভয়ত্রস্ত ও শশব্যস্ত হইয়া ক্ষুদিরাম উত্তর দিলেন, "প্রভো! আমি একে ত ভক্তিবিহীন, তায় দীনহীন। আমার পর্ণকুটীরে কোন্ সাহসে তোমাকে নিয়ে যাব? তোমার সেবা-পূজার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করতে না পেরে আমার মনঃকষ্টের অবধি থাকবে না; অধিকন্তু তোমার কাছে অপরাধী হব।" বালক শ্রীরামচন্দ্র তখন আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "তোর কোন ভয় নেই, তোর সমুদয় দোষত্রুটি আমি ক্ষমা করব। তুই যেমন পারিস্ সেবা করবি, তা'তেই আমি তুষ্ট থাকব।" সাক্ষাৎ ভগবানের এই অযাচিত অনুগ্রহে ক্ষুদিরাম একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন; আর কোন বাক্যোচ্চারণ করিতে পারিলেন না। অব্যবহিত পরে যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন ক্ষুদিরাম দেখিতে পাইলেন নিজের সর্বশরীর ঘর্মাক্ত এবং রোমরাজি কণ্টকিত। অদ্ভুত স্বপ্নের কথা ভাবিতে ভাবিতে এদিক্-ওদিক্ তাকাইতেই চোখে পড়িল স্বপ্নে যেমনটি দেখিয়াছিলেন ঠিক ঐ রকম একটি স্থান। উহাতে ক্ষুদিরামের মনে বিস্ময়ের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। তিনি তখন কাছে গিয়া দেখেন একটি শালগ্রামশিলা মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে, আর এক প্রকাণ্ড বিষধর সর্প ফণা বিস্তার করিয়া সেই শিলাখণ্ডকে রৌদ্রাতপ হইতে রক্ষা করিতেছে। তখন ক্ষুদিরামের মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, স্বপ্ন অলীক নহে। তাঁহার হৃদয়ে অপূর্ব সাহস দেখা দিল। উদ্যতফণা কৃষ্ণসর্পকে গ্রাহ্য না করিয়া* তিনি শালগ্রাম ধরিবার জন্য হাত বাড়াইলেন। আশ্চর্যের বিষয়, সাপ

* দৈব নির্দেশে শালগ্রাম কিংবা দেব-দেবীর বিগ্রহপ্রাপ্তি-বিষয়ে এই ধরনের কাহিনী অনেক স্থলেই শুনিতে পাওয়া যায়।

ক্ষুদিরামের কোন অনিষ্ট না করিয়া ফণা গুটাইয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল। উহাতে তাঁহার প্রাণে দ্বিগুণ উৎসাহ ও আনন্দের সঞ্চার হইল। শালগ্রামটিকে সযত্নে বুকে তুলিয়া তিনি দ্রুতপদে বাটীর দিকে রওয়ানা হইলেন। প্রত্যেক শালগ্রামশিলাতেই বিশেষ বিশেষ চিহ্ন অঙ্কিত থাকে। ক্ষুদিরাম যে শিলাটি পাইয়াছিলেন, সেটিকে উত্তমরূপে পরীক্ষাদ্বারা দেখিলেন যে, উহা সত্যই একটি 'রঘুবীরশিলা'। ক্ষুদিরাম মহানন্দে রঘুবীরের প্রতিষ্ঠা-উৎসব সম্পন্ন করিলেন। নিজের ইষ্টজ্ঞানে তাঁহারই সেবা-পূজায় তিনি এখন হইতে সমগ্র মনপ্রাণ ঢালিয়া দিলেন।

দিনের অধিকাংশ সময় ক্ষুদিরাম ধ্যানপূজায় কাটাইয়া দিতেন। গায়ত্রী-মন্ত্র জপ করিতে করিতে তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও বক্ষঃস্থল আরক্তিম হইয়া উঠিত। যেরূপ সত্যনিষ্ঠা ও সাহস দেখাইয়া তিনি দেরেপুরের পৈতৃক বাসভূমি ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতেই সকল লোক চমৎকৃত হইয়াছিল। ইদানীং তাঁহার ইষ্টনিষ্ঠা ও আধ্যাত্মিকতার সাক্ষাৎ পরিচয় পাইয়া কামারপুকুরের সমস্ত নরনারী ক্ষুদিরামের প্রতি শ্রদ্ধায় নতশির হইল। তিনি চলিবার সময় অপর লোক সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিত। তিনি হালদার-পুকুরে স্নান করিতে গেলে সকলে ঘাট হইতে সরিয়া দাঁড়াইত।

অপর দিকে চন্দ্রাদেবীও তাঁহার সরল সুমধুর স্বভাব ও ভালবাসার গুণে প্রতিবেশীদের হৃদয় অনায়াসে জয় করিয়া লইলেন। চন্দ্রাদেবীর গৃহস্থালিতে প্রাচুর্য না থাকিলেও কোন কিছুরই যেন অভাব ছিল না। অতিথি-অভ্যাগত যেই আসুক, তাঁহার প্রতি সমাদর ও পরিচর্যার কোনই ত্রুটি হইত না। গ্রামবাসীদের সঙ্গে সহজেই তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপিত হইল। নূতন বাসভূমিতে তাঁহারা স্বল্পকালের মধ্যেই চির-পরিচিতের ন্যায় হইয়া গেলেন।

বিধির বিধানের নিগূঢ় উদ্দেশ্য কে নির্ণয় করিতে পারিবে? রামানন্দ রায়ের অত্যাচার ক্ষুদিরামের হৃদয়ে যে বিষয়-বিতৃষ্ণা ও বৈরাগ্যের বীজ বপন করিয়াছিল, তাহারই ফলে হয় ত ক্ষুদিরামের ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্ভবপর হইয়াছিল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ক্ষুদিরাম দেরেপুর ছাড়িয়া কামারপুকুরে আসিতে বাধ্য হন। তাহার প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের কোনও এক নিভৃত পল্লীতে অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ডিহিদার মামুদ শরীফের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া এক নিরীহ ব্রাহ্মণ গভীর

মনোদুঃখে স্বগ্রাম 'দামুন্যা' ছাড়িয়া নৌকাযোগে পলায়ন করিয়াছিলেন। পথে জলজ কুমুদপুষ্প ও শালুকের বীজের নৈবেদ্য-দ্বারা ভক্তিপূতচিত্তে দেবীর অর্চনা করিয়া তিনি 'চণ্ডীমঙ্গল'-রচনার আদেশ প্রাপ্ত হন। সেই আদেশের বলে অভয়ার পদে চিত্ত সংলগ্ন করিয়া তিনি যে অমর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বাংলার ঘরে ঘরে আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে মাতৃভক্তির রস সিঞ্চিত করিয়া আসিতেছে। যে কাহিনীর আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, উহাতেও দেখিতে পাইব যে, জন্মস্থান হইতে নির্বাসিত ক্ষুদিরামের গভীর মনোবেদনা ক্রমে আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতায় পরিণত হইয়া এমন এক মহাপুরুষকে ধরাধামে টানিয়া আনিল, যিনি উত্তরকালে 'মা' 'মা' রবে ভাগীরথীর তীর মুখরিত করিয়া বিবেকবৈরাগ্য ও জ্ঞানভক্তির বিপুল ভাবরাশি দেশময় ছড়াইয়া দিলেন এবং যুগসমস্যার সমাধানরূপে একটি জীবনাদর্শ ভারতীয় জাতির, তথা সমগ্র মানবসমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন।

বংশতালিকা

জন্ম ও শৈশব

বন্ধুর অনুগ্রহে ক্ষুদিরামের কামারপুকুরে মাথা গুঁজিবার ঠাঁই হইল বটে, কিন্তু যে যৎসামান্য ধানের জমি পাইলেন, উহাতে তাঁহার জীবিকানির্বাহের সমস্যা অবশ্যই মিটিল না। পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি সমস্তই তাঁহাকে বিসর্জন দিয়া আসিতে হইয়াছিল। রোজগারের চেষ্টা জীবনে তিনি কখনও করেন নাই ; সেদিকে তাঁহার না ছিল রুচি, না বুদ্ধি, না প্রবৃত্তি। কিন্তু একেবারে আয় ব্যতীত গৃহস্থের সংসার চলে কিরূপে ? সুতরাং অর্থাভাবে ক্ষুদিরামকে এই সময়ে খুবই কষ্টে পড়িতে হইত, যদি না ভাগিনেয় রামচাঁদের সাহায্য তিনি পাইতেন।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, রামশীলা নামে ক্ষুদিরামের এক ভগিনী ছিলেন। কামারপুকুরের প্রায় ছয় ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত ছিলিমপুরের ভাগবত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের পর একটি পুত্র ও একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। পুত্রের নাম রামচাঁদ, কন্যাটির নাম হেমাঙ্গিনী। দু'জনেই ছিলেন ক্ষুদিরামের অতিশয় প্রিয়পাত্র। হেমাঙ্গিনী মাতুলালয়েই (দেরেপুরে) ভূমিষ্ঠা এবং প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন। ক্ষুদিরাম তাঁহাকে আপন তনয়া অপেক্ষাও অধিক ভালবাসিতেন। হেমাঙ্গিনী বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে কামারপুকুরের সন্নিহিত সিহোড় গ্রামের কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত তিনিই তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই চরিতাখ্যানের সহিত হেমাঙ্গিনীর আত্মজ হৃদয়রামের ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে ; যথাস্থানে তাহা বর্ণিত হইবে। ক্ষুদিরাম যখন কামারপুকুরে বসতিস্থাপন করেন, তখন রামচাঁদের বয়স একুশ-বাইশ বৎসর এবং তিনি সবেমাত্র মেদিনীপুর শহরে মোক্তারী আরম্ভ করিয়াছেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার পসার খুব জমিয়া উঠে এবং মাতুল ক্ষুদিরামকে তিনি পনরো টাকা মাসোহারা দিতে আরম্ভ করেন। অভাবের সময়ে ভাগিনেয়ের নিকট হইতে এই অর্থসাহায্য পাইয়া ক্ষুদিরাম যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। সেযুগে ঐ পরিমাণ আয়ে পল্লীগ্রামে একটি ছোটখাট পরিবারের দিন অনায়াসে চলিয়া যাইত।

কামারপুকুর হইতে চল্লিশ মাইল দূরে মেদিনীপুর শহর। ভাগিনেয়ের সহিত দেখাসাক্ষাতের জন্য মাঝে মাঝে ক্ষুদিরাম তথায় যাইতেন। এই সম্পর্কে

একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একবার বহুদিন পর্যন্ত রামচাঁদ ও তাঁহার পরিবারবর্গের কুশল সংবাদ না পাওয়াতে ক্ষুদিরাম বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। তাঁহাদের সংবাদ লইবার জন্য অবশেষে একদা তিনি অতি প্রত্যূষে মেদিনীপুর যাত্রা করিলেন। তখন মাঘ কিংবা ফাল্গুন মাস; ঐ সময়ে গাছপালার পুরাতন পাতা শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে, অথচ নূতন পাতাও জন্মায় না। বিশেষতঃ বেলগাছগুলি তখন একেবারে পত্রবিহীন হইয়া যায় এবং শিবপূজার বড়ই অসুবিধা ঘটে। পথ চলিতে চলিতে বেলা প্রায় এক প্রহরের সময়ে ক্ষুদিরাম একটি গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতেছেন, হঠাৎ দেখিতে পাইলেন যে, রাস্তার ধারেই একটি বেলগাছে অজস্র নূতন পাতা বাহির হইয়া গাছটিকে একেবারে সবুজে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। দেখিবামাত্র তাঁহার মনে হইল মহাদেবের চরণে সমর্পিত হইবার জন্য এই পত্রসম্ভার যেন অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। বহুদিন এমন সুন্দর বেলপাতা শিবকে উপহার দিতে পারেন নাই। ক্ষুদিরামের আর দেরী সহ্য হইল না। নিজের ইচ্ছামত প্রচুর বেলপাতা সংগ্রহ করিয়া তিনি গৃহাভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন এবং বেলা আড়াইপ্রহর আন্দাজ বাটী পৌঁছিয়া সেই নব বিল্বদলে মহাদেবের পূজা-সমাপনান্তে জলগ্রহণ করিলেন। দেবতার প্রতি ক্ষুদিরামের অন্তরে কিরূপ শ্রদ্ধাভক্তি বিরাজ করিত, এই ঘটনা তাহার উত্তম পরিচায়ক।

ক্ষুদিরাম কামারপুকুরে আসিবার প্রায় ছয়-সাত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। রামকুমার গ্রামের টোলে ব্যাকরণ ও সাহিত্যের পড়া শেষ করিয়া স্মৃতিশাস্ত্র ধরিয়াছেন। তাঁহার বয়স এখন ষোল এবং কাত্যায়নীর এগারো। তখনকার দিনে ইহা বিবাহের উপযুক্ত বয়স বলিয়া গণ্য হইত। নিজের অবস্থা সচ্ছল না থাকাতে ক্ষুদিরাম পুত্রকন্যার জন্য 'পরিবর্ত'-বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন। কামারপুকুরের ক্রোশখানেক পশ্চিমে অবস্থিত আনুড় গ্রামের কেনারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত কাত্যায়নীর এবং কেনারামের ভগিনীর সহিত রামকুমারের বিবাহ যুগপৎ সম্পন্ন হইল।

বিবাহের তিন-চারি বৎসরের মধ্যেই রামকুমার অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া অর্থোপার্জনে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রিয়াকর্ম তিনি উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন জ্যোতিষেও তাঁহার অধিকার জন্মিয়াছিল। সুতরাং পূজা-পার্বণ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, ব্যবস্থা-দান, কোষ্ঠীবিচার প্রভৃতি দ্বারা তিনি কিছু কিছু রোজগার

করিতে সমর্থ হইলেন। উপযুক্ত পুত্রের সাহায্য পাওয়াতে ক্ষুদিরামের সাংসারিক ভার অনেকখানি লাঘব হইল। কিন্তু অপরদিকে তাঁহার পরম সুহৃৎ ও আশ্রয়দাতা সুখলাল গোস্বামী এই সময়ে পরলোকগমন করেন। এবংবিধ অন্তরঙ্গ বন্ধুকে হারাইয়া ক্ষুদিরাম হৃদয়ে কিরূপ আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ক্ষুদিরামের জীবনে পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ। তীর্থ-দর্শনের বাসনা মনে মনে তিনি বহুকাল যাবৎই পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। রামকুমার সংসারের ভার লইতে সমর্থ হইবার পর ভাবিলেন যে, ঐ পুণ্য সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার ইহাই উত্তম সুযোগ এবং এই সুযোগ নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নহে। তীর্থে যাইবেন ত রওয়ানা হইলেন একেবারে সুদূর সেতুবন্ধ-রামেশ্বর। পদব্রজে গমন ব্যতীত তখনকার দিনে দেশভ্রমণের অপর কোন সহজ উপায় ছিল না এবং সাধুসন্ন্যাসী ছাড়া এত দুর্গম পথে বড় কেহ পা বাড়াইত না। কিন্তু ক্ষুদিরাম পা বাড়াইলেন (১৮২৪ খৃঃ); দুঃখকষ্ট এবং আপদবিপদের ভয়ভাবনা তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না। সেতুবন্ধ-রামেশ্বর এবং দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য প্রধান তীর্থস্থানসমূহ দর্শন করিয়া ক্ষুদিরাম প্রায় বৎসরাধিক কাল পরে নির্বিঘ্নে বাটী ফিরিলেন। এই তীর্থযাত্রা তাঁহার দৃঢ়সংকল্প, কষ্টসহিষ্ণুতা ও ভক্তিপরায়ণতার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাগমনের কিছুকাল পরে ক্ষুদিরাম দ্বিতীয়বার পুত্র-মুখ দর্শন করেন (১৮২৬ খৃঃ)। এই দ্বিতীয় কুমারের নাম রাখা হয় রামেশ্বর। ক্ষুদিরাম কর্তৃক রামেশ্বর-দর্শনের পরে জাত বলিয়াই সম্ভবতঃ উক্তরূপ নামকরণ হইয়াছিল।

আট-নয় বৎসর কাটিয়া যাইবার পর ক্ষুদিরামের হৃদয়ে পুনরায় তীর্থ-দর্শনের বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল। হিন্দুদিগের চিরন্তন বিশ্বাস ৺গয়াধামে পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান না করিলে ইহজন্মে পুত্রের কর্তব্য অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। ক্ষুদিরাম এখন প্রৌঢ়; তাই ভাবিলেন এই কর্তব্য-সম্পাদনে আর দেরী করা উচিত নহে। ১২৪১ বঙ্গাব্দের (১৮৩৫ খৃঃ) শীতকালে তিনি পশ্চিমে তীর্থযাত্রায় বাহির হইলেন। প্রথমে বারাণসীতে শ্রীশ্রী৺বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া তৎপরে ৺গয়াধামে পৌঁছিলেন। যতদূর জানা যায়, তথায় তিনি মাসাধিক কাল অবস্থানপূর্বক গয়াক্ষেত্রের বিভিন্ন তীর্থে

শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিবিধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সর্বশেষে যেদিন পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে গদাধর-পাদপদ্মে পিণ্ডদানক্রিয়া সমাপ্ত করিলেন, সেদিন তাঁহার হৃদয়ে যেন আনন্দ আর ধরে না। যাঁহার কৃপায় পিতৃকার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করিতে পারিলেন, সেই পরম কারুণিক জগদীশ্বরের চরণে ক্ষুদিরামের চিত্ত লুটাইয়া পড়িল। তীর্থযাত্রা সফল ও সার্থক জ্ঞানে অন্তরে এক অনির্বচনীয় শান্তি, শরণাগতি ও ভক্তিভাব লইয়া তিনি ৺শ্রীশ্রীগদাধরের মন্দির হইতে আপন বাসাবাটীতে ফিরিয়া আসিলেন।

রাত্রিতে ক্ষুদিরামের এক অত্যাশ্চর্য স্বপ্নদর্শন হইল। দেখিলেন, তিনি যেন ৺গদাধরের মন্দিরে পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানে নিয়োজিত রহিয়াছেন এবং পিতৃপুরুষেরা জ্যোতির্ময় শরীরে উপস্থিত থাকিয়া নিবেদিত দ্রব্যাদি গ্রহণপূর্বক সস্নেহে তাঁহার প্রতি আশীর্বাণী উচ্চারণ করিতেছেন। পরলোকগত পিতৃপুরুষদিগের দর্শনে এবং তাঁহাদের স্নেহপূর্ণ বাক্য শ্রবণে ক্ষুদিরামের নয়নযুগল হইতে অবিরলধারায় আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কৃতজ্ঞহৃদয়ে এবং ভক্তিভরে তিনি একে একে পিতৃপুরুষদিগের চরণবন্দনা করিতেছেন, এমন সময়ে মন্দিরাভ্যন্তর সহসা দিব্যালোকে উদ্ভাসিত এবং দিব্যগন্ধে আমোদিত হইল। ক্ষুদিরাম দেখিতে পাইলেন স্বর্ণসিংহাসনোপরি এক দিব্যপুরুষ সমাসীন এবং পিতৃপুরুষেরা বদ্ধাঞ্জলিভাবে দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহার স্তুতি করিতেছেন। সেই পুরুষপ্রবরের ইঙ্গিতাহ্বানে ক্ষুদিরাম সিংহাসনের নিকটে গিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। দিব্যপুরুষ তখন সুমধুর ও স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিতে লাগিলেন—"ক্ষুদিরাম! তোমার ভক্তিতে আমি পরিতুষ্ট হয়েছি; পুত্ররূপে তোমার ঘরে জন্ম নিয়ে আমি তোমার সেবা গ্রহণ করব।" কল্পনা ও ধারণার অতীত এই বাক্য শুনিয়া ক্ষুদিরাম যুগপৎ হর্ষে, ভয়ে, বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। অনেক চেষ্টায় কিয়ৎপরিমাণে আত্মস্থ হইয়া অবশেষে জড়িতকণ্ঠে নিবেদন করিলেন—"না, না, প্রভো! অত সৌভাগ্যে আমার প্রয়োজন নেই। এই অভাজনকে আপনি যে দর্শন দিলেন, উহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি অতি দীন-দরিদ্র; আপনি আমাকে অপরাধী করবেন না।" উত্তর শুনিয়া দিব্য-পুরুষের বদনমণ্ডল অধিকতর প্রসন্নভাব ধারণ করিল। কণ্ঠস্বরে নিরতিশয় স্নেহ ও করুণার ভাব প্রকাশ করিয়া তিনি পুনরায় কহিলেন—"ভয় নেই,

ক্ষুদিরাম! তুমি যা' দেবে তাতেই আমি পরম পরিতুষ্ট থাকব; আমার অভিলাষপূরণে তুমি বাধা দিও না।" ক্ষুদিরামের মুখে আর কোন কথা সরিল না; তাঁহার সর্বশরীর ঘর্মাক্ত এবং ইন্দ্রিয়গ্রাম যেন অবশ হইয়া গেল। নিদ্রাভঙ্গে কেবলই মনে হইতে লাগিল—এ কি অদ্ভুত স্বপ্ন তিনি দেখিলেন! একবার ভাবেন স্বপ্নের ব্যাপার অলীক বৈ আর কি হইতে পারে? আবার ভাবেন, দেবস্বপ্ন কখনও মিথ্যা হয় না, নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ তাঁহার ঘরে জন্মিবেন। যাহা হউক, পরিণামে কি ঘটে তাহা না দেখিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত গোপন রাখাই সমীচীন বোধে ঐ বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। কয়েক দিন পরেই তিনি দেশের দিকে রওয়ানা হইলেন এবং দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া যথাসময়ে নিরাপদে গৃহে পৌছিলেন। তখন বৈশাখ মাস।

ক্ষুদিরাম যখন ৺গয়াধামে ছিলেন, তখন এদিকে কামারপুকুরে চন্দ্রাদেবীরও নানা অলৌকিক দর্শন ও অনুভূতি হইতেছিল। বাটীর সম্মুখেই ছিল যুগীদের শিবমন্দির। একদিন মন্দিরের দরজায় দাঁড়াইয়া মহাদেবকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে চন্দ্রাদেবীর সহসা মনে হইল যেন এক প্রগাঢ় দিব্য জ্যোতিঃ শিবলিঙ্গ হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতেছে। আতঙ্কে তিনি মূর্ছিতা হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। ধনী নাম্নী এক প্রতিবেশী কর্মকার-রমণীর শুশ্রূষায় চৈতন্যলাভ করিয়া তিনি বাটী ফিরিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গৃহকার্যে ব্যাপৃত থাকা অবস্থায় মাঝে মাঝে অকস্মাৎ তাঁহার অনুভব হইত যেন দিব্যগন্ধে ঘর ভরিয়া গিয়াছে, দিব্য-সঙ্গীত বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। এই সকল অত্যাশ্চর্য অনুভূতির ফলে স্বভাবতঃই তাঁহার মনে অত্যন্ত ভয় জন্মিল। ধর্মদাস লাহার কন্যা প্রসন্নময়ী এবং কর্মকার-রমণী ধনী—এই দুইজন ছিলেন তাঁহার নিকট-প্রতিবেশী এবং অতি অন্তরঙ্গ সখী। উঁহাদের নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিয়া তিনি পরামর্শ চাহিলেন। নানাবিধ যুক্তি ও আশ্বাসবাক্যের দ্বারা উঁহারা চন্দ্রাদেবীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, এগুলি মনের ভ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে। অধিকন্তু তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, এ সম্পর্কে যেন কোনরূপ বলাবলি না করেন—যেহেতু সাধারণ লোক এইসব কথা শুনিলে বিশ্বাস ত করিবেই না, বরং হাসিঠাট্টা করিবে; এমন কি, অপবাদ পর্যন্ত রটাইতে পারে। অতএব

এ বিষয় আর কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া চন্দ্রাদেবী স্বামীর আগমন-প্রতীক্ষায় রহিলেন।

স্বামী বাটী প্রত্যাগত হইলে পর যখন চন্দ্রাদেবী নিজের নানাবিধ অলৌকিক দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতির কথা তাঁহাকে জানাইলেন, তখন ক্ষুদিরামের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনিও গৃহিণীর নিকট নিজের অদ্ভুত স্বপ্নদর্শন-বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্বক কহিলেন যে, নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ তাঁহাদের ঘরে অবতীর্ণ হইবেন—এ সমস্ত ব্যাপার শুধু তাহারই সূচনা। এক অজ্ঞাত শুভ ঘটনার প্রতীক্ষায় স্বামি-স্ত্রী দুইজনেই সমুৎসুকচিত্তে দিন গণিতে রহিলেন, উভয়েরই হৃদয় তখন ভগবদ্ভক্তিতে পরিপূর্ণ এবং এক অনির্বচনীয় আনন্দরসে পরিপ্লুত।

বিধিনির্দিষ্ট কাল অতীত হইবার পর ১২৪২ বঙ্গাব্দের ৬ই ফাল্গুন* বুধবার শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্রে কুম্ভলগ্নে ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রাদেবীর পর্ণকুটীর আলোকিত করিয়া একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। ৺গয়াধামের অধীশ্বর ৺শ্রীশ্রীগদাধরের বিশেষ কৃপার ফলেই পুত্রলাভ হইয়াছে, এই ধারণা অন্তরে পোষণ করিয়া জনক-জননী পুত্রটির নাম রাখিলেন 'গদাধর'।

ক্ষুদিরামের বাসগৃহ-সংলগ্ন ঢেঁকিশাল হইয়াছিল গদাধরের সূতিকা-গৃহ। কথিত আছে, ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পরেই ধাত্রীর অলক্ষ্যে শিশু পার্শ্ববর্তী উনানের দিকে গড়াইয়া পড়ে। প্রসূতির প্রাথমিক পরিচর্যা সম্পন্ন করিয়া ধাত্রী 'ধনী' সন্তানের যত্ন লইতে গিয়া দেখেন শিশু যথাস্থানে নাই। ভয়ে তাঁহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। চারিদিকে তাকাইয়া অবশেষে দেখিতে পাইলেন, সে গড়াইয়া ধান সিদ্ধ করিবার উনানের একেবারে পাশে যাইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার গায়ে উনানের ছাই লাগিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, শিশু একেবারে চুপ, যেন বেশ আরাম উপভোগ করিতেছে। জন্মিবার পরমুহূর্তেই জাতককে ছলক্রমে বিভূতিভূষিত করিয়া বিধাতাপুরুষ যেন ইঙ্গিতে তাঁহার ভবিষ্যতের আভাস দিলেন।

অতিমাত্রায় পরিপুষ্ট দেহ লইয়া গদাধর ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। সদ্যোজাত অবস্থায় তাহাকে দেখাইয়াছিল যেন ছয় মাসের শিশু। পরিবারবর্গের পরম আদর-যত্নের মধ্যে দিনে দিনে শিশু শশিকলার ন্যায় বাড়িয়া উঠিতে

* ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ, ১৮ই ফেব্রুয়ারী

লাগিল। তাহার দেহে এমন একটি অপরূপ লাবণ্য এবং মুখমণ্ডলে এরূপ এক অপার্থিব কমনীয়তা ছিল যে, যে দেখিত সে-ই মুগ্ধ হইয়া যাইত। শুধু ক্ষুদিরামের পরিবারের নয়, সমস্ত পল্লীবাসীর নিকট এই দেবোপম শিশু নয়নমণিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার কি যেন এক মোহিনীশক্তি ছিল, যাহা নিতান্ত সহজভাবে সকলকেই আকৃষ্ট করিত। দিনের মধ্যে দুই-চারবার তাহাকে না দেখিয়া, তাহাকে কাছে না পাইয়া কাহারও মনে যেন স্বস্তি হইত না—বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের।

দেখিতে দেখিতে ছয় মাস কাটিয়া গেল। গদাধরের অন্নপ্রাশনের সময় সমুপস্থিত। ক্ষুদিরাম ভাবিলেন, আপন সামর্থ্য অনুযায়ী সংক্ষেপে কাজ সারিয়া লইবেন। কিন্তু গ্রামের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন পুত্রের অন্নপ্রাশনে সকলকে খাওয়াইতে হইবে। ক্ষুদিরাম মহা সমস্যায় পড়িলেন। অনুরোধ রক্ষা না করিলে নিতান্ত অশোভন দেখায়, আর রক্ষা করিতে গেলে আপন সামর্থ্যের বাহিরে চলিয়া যায়। এ অবস্থায় কর্তব্য ঠিক করিতে না পারিয়া পরামর্শের জন্য গেলেন বন্ধু ধর্মদাস লাহার কাছে। লাহাবাবু পূর্ব হইতেই সব জানিতেন ; বস্তুতঃ তিনিই ছিলেন এই ব্যাপারের মূলে। তাঁহার নিজের মনে বিশেষ ইচ্ছা জন্মিয়াছিল যে, গদাধরের অন্নপ্রাশনে গ্রামবাসীরা উপস্থিত থাকিয়া আমোদ-আহ্লাদ করে, যেহেতু গদাধর ছিল আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই নয়নাভিরাম। তিনি ক্ষুদিরামকে বলিলেন যে, সমাজে থাকিতে গেলে পাঁচজনের অনুরোধ রক্ষা করিতেই হয় ; আর খরচপত্র যে ভাবেই হউক কুলাইয়া যাইবে, তজ্জন্য এত ভাবিত হইবার কারণ নাই। অতএব ক্ষুদিরামের আপত্তি টিকিল না। সমস্ত গ্রামবাসীকে নিমন্ত্রণপূর্বক বেশ ঘটা করিয়া গদাধরের অন্নপ্রাশন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। বলা বাহুল্য, ধর্মদাস লাহা মহাশয় হইয়াছিলেন এই ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী ও সহায়ক।

পরম যত্নে গদাধর লালিত-পালিত হইতে লাগিল। যেমন পিতামাতা, তেমনি পাড়াপ্রতিবেশী—সকলেরই সে আদরের দুলাল। গদাধরের বয়স যখন তিন বৎসর, তখন তাহার একটি ভগিনী জন্মগ্রহণ করে—নাম রাখা হয় সর্বমঙ্গলা। বালক গদাধর নিতান্ত শান্তশিষ্ট ছিল না। কিন্তু তাহার কতকগুলি অসাধারণ গুণ অতি শৈশবেই প্রকাশ পাইয়াছিল। ভয়ের শাসন সে কদাচ মানিত না। যে বিষয়ে গোঁ ধরিত, ভয় দেখাইয়া তাহা হইতে

তাহাকে কিছুতেই নিরস্ত করা যাইত না। কিন্তু স্নেহের বশ সে সহজেই হইত। প্রথমাবধিই ক্ষুদিরামের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, এই শিশু সাধারণ মানব নহে। অতএব গদাধর কথার অবাধ্য হইলে কিংবা দুরন্তপনা করিলেও তিনি তাহাকে ভৎর্সনা করিতেন না। তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, শিশু গদাধরের মেধা এবং স্মরণশক্তি অত্যদ্ভুত। পিতৃপুরুষদিগের নাম এবং নানা দেবদেবীর স্তোত্র ও প্রণাম-মন্ত্র মুখে মুখে শুনিয়া গদাধর খুব অল্প বয়সেই সেগুলি কণ্ঠস্থ করিয়াছিল। তাহার ধারণাশক্তিও ছিল বিস্ময়কর, যাহা একবার শিখিত, তাহা আর ভুলিত না।

লাহাবাবুদের চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামের পাঠশালা বসিত। গদাধর পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলে তাহাকে সেখানে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু বিদ্যালয়ের লেখাপড়ায় তাহার তেমন মন বসিল না; বিশেষতঃ পাটীগণিত তাহার একটুও ভাল লাগিত না। পক্ষান্তরে যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি অনায়াসেই তাহার মন হরণ করিত। রামায়ণ এবং মহাভারত বালক খুব আগ্রহের সহিত পড়িত, আর ভক্তদের কাহিনী পড়িতে পড়িতে তাহাতে একেবারে যেন ডুবিয়া যাইত। অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির গুণে যাহা একবার পড়িত কিংবা শুনিত, তাহাই কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত। গান, অভিনয় ইত্যাদি একবারমাত্র শুনিয়া কিংবা দেখিয়া হুবহু নকল করিতে পারিত। মোট কথা, সাধারণ লেখাপড়ার প্রতি অবহেলা কিংবা অবজ্ঞা থাকিলেও যাহা-কিছু হৃদয়ে নির্মল ভক্তিভাব সঞ্চারিত করে, তাহার প্রতি গদাধরের অনুরাগ ছিল অপরিসীম এবং স্বভাবসিদ্ধ।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গদাধরের চরিত্রের অন্যান্য বিশিষ্ট গুণসমূহ ক্রমশঃ বিকশিত হইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য—ভয়শূন্যতা, আকর্ষণী-শক্তি এবং তন্ময়তা। নির্জনে থাকিতে গদাধর ভালবাসিত, কোনরূপ ভয়-ভাবনার লেশমাত্রও তাহার মনে স্থান পাইত না। গ্রামের ভিতরে এবং আশেপাশে যে-সকল স্থান ভূতের আড্ডা বলিয়া পরিচিত ছিল এবং যেখানে একাকী যাইতে বয়স্ক ব্যক্তিরাও সাহস পাইতেন না, সে-সকল স্থানে গদাধর নিঃশঙ্কচিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইত।

দ্বিতীয়তঃ, শিশু গদাধরের মধ্যে এক অপূর্ব মোহিনীশক্তি ছিল, যাহার ফলে সকলেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইত, তাহাকে অহেতুক ভালবাসিত। বালক-বালিকা এবং স্ত্রীলোকদিগের ত কথাই নাই, বয়স্ক গণ্যমাণ্য ব্যক্তিরাও

তাহাকে একবার দেখিলেই আবার দেখিতে চাহিতেন, পুনঃ পুনঃ তাহার সঙ্গলাভের জন্য লালায়িত হইতেন। এবিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যাইতে পারে। ভুরস্থবো গ্রামের মাণিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি ছিলেন ক্ষুদিরামের বিশেষ বন্ধু। একবার ক্ষুদিরাম মাণিকচন্দ্রের বাটীতে যাইবার সময়ে শিশু গদাধরকে সঙ্গে লইয়া যান। গদাধরকে দেখিয়ামাত্র মাণিকচন্দ্রের হৃদয়ে অপরিসীম স্নেহভাবের উদ্রেক হইল। তিনি বন্ধুকে বারংবার বলিয়া দিলেন যে, ভবিষ্যতে যখনই আসিবেন, গদাধরকে সঙ্গে আনিতে যেন ভুল না হয়। ইহার পরে এমনি দাঁড়াইল যে, ক্ষুদিরাম একাদিক্রমে বেশীদিন পর্যন্ত না গেলে মাণিকচন্দ্র অস্থির হইয়া পড়িতেন। তিনি তখন লোক পাঠাইয়া গদাধরকে নেওয়াইতেন এবং কাছে রাখিয়া আদর-যত্ন করিতেন। যে-কোন ব্যক্তি একবার মাত্র গদাধরের সান্নিধ্যে আসিলেই যেন মায়ারজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া পড়িত।

শিশু গদাধরের তৃতীয় বিশেষ গুণ ছিল তন্ময়তা। সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া, পৌরাণিক কাহিনী পড়িয়া কিংবা গান, কথকতা প্রভৃতি শুনিয়া সে মাঝে মাঝে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিত। পুনঃ পুনঃ এরূপ হওয়ার ফলে পিতা-মাতার এবং আত্মীয়-স্বজনের মনে ধারণা জন্মে যে, গদাধরের দেহে নিশ্চয়ই কোন স্নায়বিক অথবা মানসিক ব্যাধি বাসা বাঁধিয়াছে। কিন্তু পূর্বাপর বিচার করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উক্ত ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভুল। শিশু গদাধর যে মাঝে মাঝে ঐরূপ মূর্ছিতের ন্যায় হইত, উহার মূলে ছিল তাহার স্বাভাবিক ধ্যানপরায়ণতা ও তন্ময়তা। তাহার প্রকৃতির গঠনই এমন ছিল যে, যখন যে-বিষয়ে তাহার মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইত, তাহাতেই একেবারে লীন হইয়া যাইত, আর উহার ফলেই সে বাহ্যজ্ঞান হারাইত।

শৈশবের একটি ঘটনার কথা পরবর্তীকালে তিনি নিজমুখে বর্ণনা করিয়াছিলেন। তন্ময়তার দৃষ্টান্তস্বরূপ উহার এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার বয়স যখন মাত্র ছয়-সাত বৎসর, তখন জ্যৈষ্ঠ কিংবা আষাঢ় মাসে একদা কয়েকজন বয়স্যের সহিত কোঁচড় হইতে মুড়ি খাইতে খাইতে তিনি ধানক্ষেতের আল দিয়া যাইতেছিলেন। বর্ষারম্ভে আকাশের কোণে নিবিড় কালো মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়াছে। মসীকৃষ্ণ মেঘ ধীরে ধীরে গগনমণ্ডল

প্রায় ছাইয়া ফেলিতেছে। ঠিক ঐ সময়ে কালো মেঘের কোল ঘেঁসিয়া একসারি শুভ্র বক উড়িয়া যাইতে লাগিল। 'ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত' পাখায় ভর করিয়া ঐরূপ বলাকাশ্রেণী কোন্ পার হ'তে কোন্ পারে উড়িয়া যায় কেহই জানে না। কিন্তু সেই অজানা ও অসীমের যাত্রীদের দিকে তাকাইয়া মরমীর হৃদয়ে জাগে এক বেদনাময় পুলক-স্পন্দন,—পৃথিবীর বন্ধন টুটিয়া দিগন্তে ছুটিয়া যাইবার জন্য এক তীব্র ব্যাকুলতা। এই মহান্ দৃশ্য অবলোকন করিয়া বালক গদাধরের ভাবপ্রবণ হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ জাগিল অতীন্দ্রিয় আবেশের শিহরণ; বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় তিনি ভূতলে লুটাইয়া পড়িলেন। সঙ্গীরা সন্ত্রস্তভাবে দৌড়াইয়া গিয়া গদাধরের বাটীতে খবর দিলে পর লোকজন আসিয়া মূর্ছিত বালককে ক্রোড়ে করিয়া গৃহে লইয়া গেল।

অনতিবিলম্বে সংজ্ঞালাভ করিয়া গদাধর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু এই ঘটনার ফলে জনক-জননীর চিত্তে বড়ই দুর্ভাবনার সঞ্চার হইল। যদি পথে-ঘাটে আচম্বিতে গদাধর এরূপ মূর্ছিত হইয়া পড়ে, তবে কখন কি বিপদ ঘটে তাহার কিছুই ইয়ত্তা নাই। পুত্রের রোগমুক্তি ও নিরাপত্তার জন্য তাঁহারা নানাবিধ ঔষধপত্র এবং দৈব চিকিৎসা করাইলেন। পূজা-মানত করিয়া দেবতার দুয়ারে দুয়ারে তাঁহারা আকুলভাবে প্রার্থনা জানাইলেন—যেন পুত্রের কোন অমঙ্গল না ঘটে।

কৈশোর

গদাধরের বয়স সাত বৎসর অতীত হইতে না হইতে চাটুয্যে-পরিবারের ভাগ্যাকাশে একখানি কাল মেঘ দেখা দিল। ক্ষুদিরাম প্রতি বৎসর শারদীয়া পূজার সময়ে ছিলিমপুরে ভাগিনেয় রামচাঁদের বাড়ীতে যাইতেন। রামচাঁদের উপার্জন ছিল যথেষ্ট এবং মাতুলের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল অপরিসীম। দুর্গাপূজার উৎসবে মাতুল উপস্থিত না থাকিলে কিছুতেই যেন তাঁহার মন উঠিত না। ১২৪৯ বঙ্গাব্দের (১৮৪৩ খৃঃ) শরৎকাল। ক্ষুদিরামের শরীর অসুস্থ, কিছুদিন আগে হইতেই দারুণ গ্রহণীরোগে তিনি প্রায় শয্যাগত। তাই এবার পূজায় রামচাঁদের বাড়ীতে যাইবেন কি-না, এ বিষয়ে প্রথম ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। কিন্তু না গেলে ভাগিনেয় অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন ভাবিয়া অবশেষে যাওয়াই সাব্যস্ত করিলেন। অসুস্থ পিতাকে একাকী যাইতে না দিয়া রামকুমারও তাঁহার সঙ্গে গেলেন।

মহানবমীর দিন ক্ষুদিরামের পীড়া সহসা বৃদ্ধি পাইয়া উৎকট আকার ধারণ করিল। ঔষধপত্রে কোনই ফল পাওয়া গেল না। দশমীর দিন তিনি প্রায় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। ৺বিজয়ার রাত্রিতে প্রতিমা-বিসর্জনের পর লোকজন যখন ঘরে ফিরিল, তখন ক্ষুদিরামের শ্বাসটি মাত্র বহিতেছে। মামার অন্তিমকাল উপস্থিত বুঝিতে পারিয়া রামচাঁদ তাঁহাকে ইষ্টমন্ত্র শুনাইতে লাগিলেন। ৺রঘুবীরের নাম কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র ক্ষুদিরামের দেহে যেন নববলের সঞ্চার হইল; তিনি উঠিয়া বসিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। যখন তুলিয়া বসানো হইল, তখন দেখা গেল তাঁহার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত এবং মুখমণ্ডল দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। শরীরে যেটুকু সামর্থ্য অবশিষ্ট ছিল, তাহা যেন নিঃশেষে প্রয়োগপূর্বক তিনি আপন ইষ্টদেবতা ৺রঘুবীরের নাম উচ্চারণ করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া গেল। ৺রঘুবীরের একনিষ্ঠ সেবক ইহলোকের মায়া কাটাইয়া আটষট্টি বৎসর বয়সে মহাপ্রস্থান করিলেন। দুর্গাপূজার উৎসব উপলক্ষে আসিয়া ক্ষুদিরাম এভাবে পরলোকগমন করাতে তাঁহার বিয়োগ-ব্যথা রামচাঁদ, রামচাঁদের পরিবারবর্গ ও রামকুমারের বুকে দারুণ হইয়া বাজিল। পরদিন

প্রভাত হইতে না হইতেই দুঃসংবাদ কামারপুকুরে পৌছিয়া চন্দ্রাদেবী ও আত্মীয়-স্বজনকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিল।

ভগ্নহৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া রামকুমার পরলোকগত পিতার ঔর্দ্ধ্বদৈহিক ক্রিয়া যথানিয়মে সম্পন্ন করিলেন। ক্ষুদিরামের স্নেহশীতল পক্ষপুটের ছায়ায় সমস্ত পরিবারবর্গ এতকাল এক পরম আশ্রয় ও নির্ভাবনার মধ্যে বাস করিয়া আসিতেছিল। এখন তাঁহার অভাব সকলকে অতিমাত্রায় অভিভূত ও ব্যথিত করিল। রামকুমার পূর্বাবধি সাংসারিক দায়িত্বপালনে অভ্যস্ত থাকিলেও পিতৃবিয়োগের পর মনে হইল সেই দায়িত্বের বোঝা যেন শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। গদাধর তখনও নিতান্ত বালক; কোন সাংসারিক চিন্তা-ভাবনা তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। কিন্তু স্নেহময় পিতার তিরোধান বালকের মনেও একটা গভীর শূন্যতা সৃষ্টি করিল। তথাপি জননীর অপরিমেয় শোকাবেগ লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধি গদাধর নিজের দুঃখ চাপিয়া রাখিল। অনুক্ষণ মায়ের নিকটে থাকিয়া ও গৃহকর্মে সাহায্য করিয়া সে তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিবার এবং নিজেও সান্ত্বনা পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, কামারপুকুর-গ্রামের ভিতর দিয়াই গিয়াছিল ৺পুরী জগন্নাথ-ধামের রাস্তা। তীর্থযাত্রীর দল সেই রাস্তা ধরিয়া যাতায়াত করিত। রাস্তার ঠিক উপরেই ছিল জমিদার লাহাবাবুদের অতিথিশালা। সাধুসন্ন্যাসীরা সদাসর্বদা তাহাতে আশ্রয় লইতেন। পিতৃবিয়োগের পর গদাধর সেই অতিথিশালায় পরিব্রাজক সাধুদের সহিত মিশিতে আরম্ভ করে। তাঁহাদের মুখে নানা তীর্থের কথা ও ধর্মকাহিনী শুনিয়া বালকের চিত্ত সহজেই মুগ্ধ হইত। সাধুসন্ন্যাসীরাও গদাধরের মধ্যে বহুতর সাত্ত্বিক গুণ ও লক্ষণ দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে সাগ্রহে কাছে রাখিতেন এবং আদর-যত্ন করিতেন। যে কারণেই হউক, একবার কোনও সাধুর দল কিছু অধিককাল সেই ধর্মশালায় অবস্থান করিয়াছিলেন এবং উঁহাদের সহিত গদাধরের বেশ আত্মীয়তা জন্মিয়া যায়। সে গ্রাম হইতে তাঁহাদের জন্য জিনিসপত্র জোগাড় করিয়া দিত, তাঁহাদের জলতোলা, কাঠকুড়ানো, রান্না প্রভৃতি কাজে সাহায্য করিত, কখনও বা তাঁহাদের নিকটেই আহার পর্যন্ত করিত। চন্দ্রাদেবী প্রথমে উহাতে কোনরূপ আপত্তি করেন নাই, বোধ হয় ভাবিতেন সাধুসন্ন্যাসীর আশীর্বাদে পুত্রের

কল্যাণ হইবে। একদা তাঁহারা আমোদচ্ছলে গদাধরকে কৌপীন পরাইয়া গায়ে ভস্ম মাখাইয়া সাধু সাজাইয়া দেন। গদাধরের তাহাতে অহ্লাদের সীমা রহিল না। ছুটিতে ছুটিতে বাড়ী গিয়া জননীকে কহিলেন, 'ছাখ মা! আমি কেমন সাধু সেজেছি!' পুত্রের দিকে তাকাইয়া সরলহৃদয় চন্দ্রাদেবীর ত চক্ষুস্থির! তবে কি তাঁহার গদাধর কোন ছেলে-ধরা সাধুদের কবলে পড়িয়াছে? তিনি শুনিয়াছিলেন যে, সুবিধা পাইলে ঐ প্রকার সাধুরা নানা উপায়ে বালকদের মন জয় করিয়া পরিবার হইতে তাহাদিগকে ছিনাইয়া লইয়া যায় এবং অবশেষে সন্ন্যাসদীক্ষা দিয়া নিজেদের দল পুষ্ট করে। নিজের মনের এই সন্দেহ ও আশঙ্কার কথা বলিয়া তিনি পুত্রকে পরিব্রাজক সাধুদের সহিত বেশী ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। এ বিষয় অবগত হইয়া সন্ন্যাসীরা বড়ই অপ্রস্তুত হইলেন। তাঁহারা তখন চন্দ্রাদেবীর নিকট গিয়া ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন যে, এমন সুন্দর বালকটিকে পাইয়া তাঁহারা একটু রঙ্গ করিয়াছেন বৈ আর কিছুই নহে, বিন্দুমাত্র অসদুদ্দেশ্য তাঁহাদের মনের ভিতরে ছিল না এবং নাই। এই আশ্বাসবাক্যে চন্দ্রাদেবীর ভয় বিদূরিত হইল, তিনি গদাধরকে পুনরায় সাধুদের নিকট যাইতে দিলেন।

পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদের সাহচর্যে গদাধরের স্বাভাবিক ধ্যানপরায়ণতা সম্ভবতঃ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐ সময়কার একটি ঘটনাতে উহার আভাস পাওয়া যায়। কামারপুকুরের অদূরে 'আনুড়'-নামক গ্রামে অবস্থিত দেবী বিশালাক্ষীর মন্দির চতুষ্পার্শ্বের অঞ্চলে খুবই প্রসিদ্ধ। দেবীর নিকটে লোকে নানাবিধ মানত করিয়া থাকে এবং মনস্কাম সিদ্ধ হইলে পূজা দিতে যায়। সেকালে আরও বেশী যাইত। একদা কামারপুকুরের একদল স্ত্রীলোক ৺বিশালাক্ষীর মন্দিরে পূজা দিতে যাইতেছিলেন। ধর্মদাস লাহা মহাশয়ের কন্যা ভক্তিমতী প্রসন্নময়ী ছিলেন তাঁহাদের অন্যতমা এবং গদাধরকেও তাঁহারা সঙ্গে লইয়াছিলেন। বালক গদাধর উত্তম গাহিতে পারিত; তজ্জন্য যাত্রীদের নিকটে তাহার খুবই সমাদর ছিল। তাঁহাদের অনুরোধে দেবী-বিষয়ক গান গাহিতে গাহিতে গদাধর পথ চলিয়াছে, গানের ভাবে সে সম্পূর্ণ বিভোর—বালকণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীত যাত্রীদের কানে অমৃত ঢালিয়া দিতেছে। সহসা গদাধর স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল—দেহ কঠিন ও নিস্পন্দ, বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত, গণ্ডদেশ বহিয়া অবিরলধারে অশ্রুধারা বিগলিত।

সহযাত্রীরা ভাবিলেন, প্রখর রৌদ্রাতপে সর্দিগর্মি লাগিয়া গদাধর মূর্ছাপন্ন হইয়াছেন। চোখে-মুখে জল ছিটাইয়া ও পাখার বাতাস দিয়া তাঁহারা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন এবং বারংবার তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন—যাহাতে সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে। কিন্তু গদাধরের কোনই সাড়া পাওয়া গেল না। তখন নিতান্ত ভয়ার্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া প্রসন্নময়ী ব্যাকুলভাবে দেবী ৺বিশালাক্ষীর নামোচ্চারণ ও স্তবস্তুতি আরম্ভ করিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, বিশালাক্ষীর নাম কয়েকবার কানে যাইবামাত্র গদাধরের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল—যেন কিছুই হয় নাই। বিবরণে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গদাধরের যাহা ঘটিয়াছিল তাহা মূর্ছা কিংবা অপর কোন ব্যাধির আক্রমণ নহে। দেবী বিশালাক্ষীর মূর্তি হৃদয়ে চিন্তা করিতে করিতে সে একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল এবং তাহারই ফলে বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইয়াছিল।

গদাধর নবম বৎসরে পড়িলে শুভ দিন দেখিয়া রামকুমার তাঁহার উপনয়নের আয়োজন করিলেন। ব্রাহ্মণ-কুমারের জীবনে উপনয়ন একটি বিশেষ ঘটনা। শাস্ত্রে আছে, ব্রাহ্মণকুলে জন্মিলেই কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। ব্রাহ্মণের সন্তানও শূদ্র হইয়াই জন্মে; উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন হইলে পর তবে সে 'দ্বিজ' আখ্যা লাভ করে। উপনয়ন যেন একটা নূতন জন্ম। প্রাচীনকালে উপনয়ন বলিতে গুরুগৃহে যাওয়া বুঝাইত, এখন অবশ্য তাহা বুঝায় না এবং উপনীতের পক্ষে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য-পালনের ব্যবস্থাও আর নাই। তথাপি প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-বালকের পক্ষেই উপনয়ন সর্বপ্রধান সংস্কাররূপে এখনও প্রচলিত। উহা স্বভাবতঃই বালকদের মনে একটা গভীর ঔৎসুক্য ও শ্রদ্ধার ভাব আনয়ন করিয়া থাকে; বালক গদাধরেরও নিশ্চয়ই করিয়াছিল। অধিকন্তু তাঁহার উপনয়ন সম্পর্কে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা জানা যায়।

উপনয়ন-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবার পর নবীন ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়; জননী বিদ্যমান থাকিলে প্রথম ভিক্ষা তাঁহার নিকট হইতেই লইবার নিয়ম। কিন্তু গদাধরের বেলায় উহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। ধাই-মা 'ধনী'র প্রতি গদাধরের ভালবাসা ছিল অপরিসীম। 'ধনী'র অনুরোধে সে গোপনে তাহাকে কথা দিয়াছিল যে, প্রথম ভিক্ষা তাঁহার নিকট হইতেই গ্রহণ করিবে। ধনী সাগ্রহে দিন গণিতেছিলেন কবে গদাধরের উপনয়ন

হইবে এবং তিনি তাহার ভিক্ষামাতা হইতে পারিবেন। ভিক্ষাগ্রহণের সময় উপস্থিত হইলে বিষয়টি প্রকাশ করিয়া গদাধর কহিল যে, 'ধনী'র নিকট সে প্রতিশ্রুত, সুতরাং প্রথম ভিক্ষা সে ধনীর নিকট হইতেই লইবে। কুলাচার ও দেশাচারের দোহাই দিয়া গদাধরের মত-পরিবর্তনের অনেক চেষ্টা করা হইল, কিন্তু কিছুতেই তাহা সফল হইল না। গদাধর নিজের সঙ্কল্পে অটল। গুরুজনদিগকেই অবশেষে পরাজয় মানিতে হইল। ধাত্রীমাতা হইয়া 'ধনী'র এতকাল সাধ মিটে নাই, ব্রাহ্মণ-কুমারের ভিক্ষামাতা হইয়া এবারে তিনি মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন ও নিজেকে গৌরবান্বিতা মনে করিলেন। পক্ষান্তরে গদাধরও দেখাইল যে, তাহার নিকট ভালবাসার দাবীই অগ্রগণ্য এবং অঙ্গীকার-পালনই প্রধান কর্তব্য ; কুলাচার, লোকাচার প্রভৃতি গৌণ।

উপনয়নের ফলে গদাধর শালগ্রাম স্পর্শ ও পূজা করিবার অধিকার পাইল। উহাতে তাহার হৃদয়ে এক নূতন আনন্দ ও গর্ববোধের সঞ্চার হইল। পরম যত্নসহকারে এখন হইতে সে ৺রঘুবীরের সেবাপূজায় ব্রতী হইল। অসাধারণ শুভসংস্কারসম্পন্ন এই বালব্রহ্মচারীর পূজা শুধু উপচার-প্রদান ও মন্ত্রোচ্চারণের পূজা ছিল না ; শালগ্রামশিলাতে সাক্ষাৎ নারায়ণের অধিষ্ঠান ভাবিয়া তদ্গতচিত্তে সে উপাসনা করিত। রামেশ্বর শিব এবং ৺শীতলা মাতার নিত্যপূজার ভারও সে লইয়াছিল।

একবার শিবচতুর্দশী তিথিতে সারাদিন উপবাসী থাকিয়া সন্ধ্যার পর গদাধর শিবপূজা করিতেছিল। সবেমাত্র প্রথম প্রহরের পূজা শেষ হইয়াছে, এমন সময়ে তাহার প্রিয়সখা গয়াবিষ্ণু* সাঙ্গোপাঙ্গ সমেত আসিয়া উপস্থিত। তাহাদের আগমনের উদ্দেশ্য গদাধরকে সীতানাথ পাইনের বাড়ীতে যাত্রার আসরে লইয়া যাওয়া। শিবরাত্রি উপলক্ষে সেখানে শিবলীলা-বিষয়ক যাত্রাগানের আয়োজন হইয়াছিল ; কিন্তু যাত্রায় যে ব্যক্তির শিব সাজিবার কথা ছিল, সে দৈবাৎ কঠিন পীড়াগ্রস্ত হওয়াতে সমস্ত আমোদ-উৎসব পণ্ড হইবার উপক্রম। গদাধর ব্যতীত এ সঙ্কটে আর কে উদ্ধার করিতে পারে? এমন সুদর্শন, সুকণ্ঠ, অভিনয়পটু বালক গ্রামের মধ্যে দ্বিতীয় কেহই ছিল না। অতএব সকলে মিলিয়া যুক্তি করিয়া গদাধরের বয়স্যদিগকে পাঠাইয়াছিল তাঁহাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত। শিবপূজা ছাড়িয়া যাত্রার আসরে

---

* ধর্মদাস লাহার পুত্র।

যাইতে গদাধর খুবই অনিচ্ছুক ছিল। কিন্তু গয়াবিষ্ণুপ্রমুখ ক্রীড়াসঙ্গীর দল যখন অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, এবং অবশেষে যুক্তি দেখাইল যে, শিবের ভূমিকা অভিনয় করিলে বস্তুতঃ সারাক্ষণ শিবের চিন্তা ও শিবের আরাধনাই করা হইবে, তখন সে সম্মত না হইয়া পারিল না।

যাত্রাভিনয়ে যোগদান করিতে গদাধর গেল বটে, কিন্তু শিবের সাজসজ্জা অঙ্গে ধারণ করিবার সময়েই তাহার ভাবান্তর লক্ষিত হইল। সে যেন নিজেকে ঠিক সামলাইতে পারিতেছিল না। মাথায় জটা, কানে ধুতুরার ফুল, হাতে রুদ্রাক্ষের মালা পরাইয়া এবং সর্বাঙ্গে বিভূতি মাখাইয়া গদাধরকে যখন আসরে নামানো হইল, তখন দেবাদিদেব মহাদেব তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ভর করিয়াছেন! স্তব্ধ বিস্ময়ে সমস্ত সভাজন দেখিতে পাইল তাহাদের চোখের সামনে ধ্যানমগ্ন যোগিরাজ যেন স্বয়ং সমুপস্থিত। ভাবাবিষ্ট গদাধর পাষাণমূর্তির ন্যায় নিস্পন্দভাবে সভাস্থলে দাঁড়াইয়া রহিল। যাত্রার দলের অধিকারী এবং আরও দুই-চারজন বর্ষীয়ান ব্যক্তি কাছে গিয়া গায়ে হাত দিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, গদাধর সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান-শূন্য। বস্তুতঃ তাহার নয়নযুগল হইতে অবিরলধারে প্রেমাশ্রু বিগলিত না হইলে এবং তাহার মুখমণ্ডল এক দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত না থাকিলে তাহার দেহ প্রাণহীন বলিয়াই গণ্য করা হইত। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া সকলে বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া রহিল। বহুক্ষণ ধরিয়া নানাপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও যখন গদাধরের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল না, তখন যাত্রার আসর ভাঙ্গিয়া দেওয়া ব্যতীত গত্যন্তর রহিল না। সমাধিস্থ অবস্থায়ই গদাধরকে বাড়ী পৌঁছানো হইল। সারা রাত্রি এইভাবে কাটিবার পর ভোরবেলায় তাহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছিল।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গদাধরের এই ধরণের ভাবসমাধি আরও ঘন ঘন হইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, কোনও দেবদেবীর ধ্যান করিতে বসিলে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই ধ্যানের দেবতাকে সে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়, তখন আর কোন কিছুরই জ্ঞান থাকে না, বাহিরের জগৎ তখন তাহার নিকট লুপ্ত হইয়া যায়। সাধারণের পক্ষে বালকের মুখে এরূপ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা কঠিন। অতএব আত্মীয়-স্বজনের প্রথমে ধারণা হইয়াছিল যে, গদাধরকে উৎকট বায়ু অথবা মূর্ছারোগ আক্রমণ করিয়াছে।

কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, পুনঃ পুনঃ এইরূপ হওয়া সত্ত্বেও গদাধরের বুদ্ধিসুদ্ধি স্বাভাবিকই রহিয়াছে এবং শারীরিক স্বাস্থ্যেরও কোন প্রকার হানি ঘটে নাই, তখন তাঁহাদের দুশ্চিন্তা অনেকটা প্রশমিত হইল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পাঠাশালার লেখাপড়ায় গদাধরের মোটেই রুচি ছিল না। সঙ্গীত, পুরাণ-পাঠ, যাত্রাভিনয় প্রভৃতিতেই তাহার সমধিক অনুরাগ লক্ষিত হইত। আমোদ-আহ্লাদ এবং ক্রীড়াকৌতুকও সে অত্যন্ত ভালবাসিত। সমবয়স্ক বালকেরা তাহাকে 'নটের রাজা' নির্বাচিত করিয়াছিল। মাণিকরাজার আম্রকানন ছিল তাহাদের রঙ্গভূমি। ছুটির দিনে ত কথাই নাই, অনেক দিন পাঠশালা কামাই করিয়াও গদাধর তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া মাণিকরাজার আমবাগানে গিয়া উপস্থিত হইত। যে যাহার বাড়ী হইতে কিছু কিছু মুড়িমুড়কি সঙ্গে করিয়া আনিত, তাহাই খাইয়া সারাদিন মহোৎসাহে চলিত খেলাধূলা, নাচগান এবং যাত্রাভিনয়। গ্রামে যখন যে যাত্রার পালা অভিনীত হইত, গদাধর তাহার অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির গুণে সেই সমস্ত আগাগোড়া কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিত; তৎপরে বয়স্যদের সহিত মহড়া দিয়া নিজেরা সেগুলি অভিনয় করিত। গদাধরের যাত্রার দল বাগান মুখরিত করিয়া তুলিত। বালকণ্ঠের কলধ্বনিতে, হাসিগানে ও অভিনয়ে বাগানের আকাশ, বাতাস এবং বৃক্ষপল্লব যেন চঞ্চল হইয়া উঠিত। গদাধরের মধ্যে এমন একটি প্রাণ-মাতানো ভাব ছিল যে, তাহার সাহচর্যে প্রত্যেক বালকের অন্তরেই আনন্দের উৎস খুলিয়া যাইত। ছেলের দলের মধ্যে গদাধরের সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন গয়াবিষ্ণু। সামান্য কুলটি পাইলেও গদাধর গায়াবিষ্ণুকে না দিয়া একাকী খাইত না।

যত দিন যাইতে লাগিল, পাঠশালার লেখাপড়ার প্রতি গদাধরের বিতৃষ্ণা ক্রমশঃ আরও বৃদ্ধি পাইল। ধর্মসঙ্গীত, যাত্রা, কথকতা, পুরাণ-পাঠ—এগুলিতেই সে মজিয়া থাকিত। পড়াশুনার জন্য চাপ দিলে মূর্ছারোগ পাছে বাড়িয়া যায় কিংবা অপর কোন অনিষ্ট ঘটে—এই আশঙ্কায় রামকুমার কিছু বলিতেন না, গদাধরকে তাহার আপন ভাবেই চলিতে দিতেন।

ক্ষুদিরাম যখন স্বর্গারোহণ করেন, তখন গদাধরের বয়স ছিল সাত। ঐ ঘটনার ছয় বৎসর পরে অর্থাৎ গদাধরের বয়স যখন তেরো, তখন

চাটুয্যেদের পরিবারে পুনরায় মৃত্যুর করাল ছায়া আপতিত হইল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে রামকুমার রামেশ্বর ও সর্বমঙ্গলার বিবাহকার্য সম্পন্ন করেন। উহার অল্পকাল পরেই রামকুমারের স্ত্রীর অন্তঃসত্ত্বার লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু উহা পরিবারের লোকের মনে আনন্দের সঞ্চার না করিয়া দারুণ উৎকণ্ঠারই সৃষ্টি করিল। নিজের বিবাহের অব্যবহিত পরেই রামকুমার জ্যোতিষ-গণনায় দেখিয়াছিলেন যে, পত্নী সর্বসুলক্ষণা হইলেও প্রথম সন্তানের জন্মই হইবে তাঁহার পক্ষে মারাত্মক। বস্তুতঃ হইলও তাহাই। একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াই তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এই সন্তানটির নাম রাখা হয় 'অক্ষয়'।

রামকুমারের পত্নীবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই যেন পরিবারের লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইলেন। রামকুমারের আয় সহসা কমিয়া গেল, চারিদিকেই নানা বিশৃঙ্খলা ও বাধাবিপত্তি দেখা দিল; এমন কি, পরিবার-প্রতিপালনের জন্য তাঁহাকে ঋণ করিতে হইল। প্রায় ত্রিশ বৎসর সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে গার্হস্থ্য-জীবনযাপনের পর পত্নী-বিয়োগ-বিধুর রামকুমার সংসার অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। বাড়ীতে থাকিয়া আর কিছুতেই পরিবার-প্রতিপালনে সমর্থ হইবেন না—এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় গিয়া ঝামাপুকুরে এক চতুষ্পাঠী খুলিলেন। সাক্ষাৎভাবে টোলের কোন আয় না থাকিলেও, যজন-যাজন, ব্যবস্থা-দান ইত্যাদি সূত্রে তাঁহার কিছু কিছু উপার্জন হইতে লাগিল।

রামকুমারের স্ত্রী পরলোকগমন করাতে বৃদ্ধ বয়সে চন্দ্রাদেবীকে পুনরায় গৃহকর্মে মন দিতে হইল। বিশেষতঃ মাতৃহীন অক্ষয়ের লালন-পালনের সম্পূর্ণ ভার আসিয়া পড়িল তাঁহারই উপর, কারণ রামেশ্বরের স্ত্রী তখনও নিতান্ত বালিকা। রামেশ্বর নিজে ছিলেন ভাবুক-প্রকৃতির মানুষ; সংসারের কাজকর্মে তাঁহার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি কিংবা মনোযোগ ছিল না। অধিকাংশ সময় তিনি অতিথিশালায় সাধুসন্ন্যাসীদের সঙ্গে কাটাইতেন। গদাধর প্রত্যহ রঘুবীরের সেবাপূজা সারিয়া জননীর কাছে কাছে থাকিত এবং যথাসম্ভব তাঁহার গৃহকর্মে সহায়তা করিত।

পাঠশালায় যাতায়াত গদাধরের প্রায় বন্ধ হইয়াই গেল। মায়ের নিকটে সর্বক্ষণ অবস্থানের দরুন ঐ সময়ে পল্লীর স্ত্রীলোকদিগের সহিত তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মে। প্রতিদিন অপরাহ্ণে পাড়ার মেয়েরা চন্দ্রাদেবীর

ঘরে আসিয়া সমবেত হইত এবং গদাধর তাঁহাদিগকে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পড়িয়া শুনাইত। সে যে শুধু একটানা বই পড়িয়া যাইত তাহা নহে, কথক-ঠাকুরের ন্যায় গান ও অভিনয়ের সাহায্যে প্রত্যেক কাহিনী একেবারে জীবন্ত করিয়া তুলিত।

বালক গদাধরের ললিতকণ্ঠের শ্যামাসঙ্গীত, বাউলসঙ্গীত, পদাবলী-কীর্তন এমনই মধুর ও প্রাণস্পর্শী ছিল যে, তাহা শুনিয়া লোকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া যাইত। শোনা যায়, গদাধরের গান শুনিয়া গুরুমহাশয়ের হস্ত হইতে বেত্রদণ্ড খসিয়া পড়িয়াছিল! মানিকরাজার বাগানে ছেলেদের যাত্রার আসর যখন খুব জমজমাট, তখন শাসনের উদ্দেশ্যে পাঠশালার গুরুমহাশয় একদিন তাহাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তাহাদের দলের সর্দার। সকলেই গদাধরকে দেখাইয়া দিল। গুরুমহাশয় গদাধরকে আদেশ করিলেন যাত্রার পালা হইতে একখানি গান গাহিয়া শুনাইবার জন্য। তিনি নিশ্চয়ই ভাবিয়াছিলেন এই কথায় গদাধর লজ্জায় মাথা হেঁট করিবে, আর তাহা না করিয়া যদি সত্যই গান ধরে তবে সর্বসমক্ষে তাহার বে-আদবির নিদর্শন পাওয়া যাইবে। কার্যতঃ ঘটিল তাহার বিপরীত। গুরুমহাশয়ের আদেশে বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ কিংবা লজ্জিত না হইয়া গদাধর সহজ সরলভাবে গান ধরিল। গানের শেষে দেখা গেল গুরুমহাশয় নিজেই ভাবাবিষ্ট। তখন কে কাহাকে শাস্তি দেন!

গ্রামবাসীদের মধ্যে অন্ততঃ দুই ব্যক্তি গদাধরের শৈশবেই তাহার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহাদের একজনের নাম শ্রীনিবাস শাঁখারি, অপর ব্যক্তির নাম সীতানাথ পাইন। উভয়েরই বদ্ধমূল ধারণা জন্মিয়াছিল যে, গদাধর ঐশীশক্তিসম্পন্ন বালক এবং উত্তর-কালে সে নিশ্চয়ই মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত হইবে। তাই তাঁহারা গদাধরকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন এবং মাঝে মাঝে মিষ্টদ্রব্যাদি উপহার দিতেন। সীতানাথ পাইনের পরিবার ছিল বৃহৎ। তিনি স্বয়ং ও তাঁহার বাড়ীর ছেলেমেয়েরা * সকলেই গদাধরকে পরম শ্রদ্ধার চক্ষে

---

* সীতানাথের কন্যাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল রুক্মিণী। তিনি পিত্রালয়েই থাকিতেন এবং খুব বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কতিপয় সন্ন্যাসী ভক্ত ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে যখন কামারপুকুরে যান, তখন তাঁহারা রুক্মিণীদেবীর মুখে শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যজীবনের অনেক কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন।

দেখিতেন ও অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। বৃদ্ধ শ্রীনিবাস গদাধর সম্পর্কে এতই উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন যে, একদা তিনি তাহাকে কাতরভাবে বলিয়াছিলেন, "গদাধর, আমি বুড়ো হয়েছি, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। তুমি এ জগতে যে-সমস্ত আশ্চর্য লীলাখেলা করবে, তা' দেখবার সৌভাগ্য হবে না। আমার শুধু এই প্রার্থনা যে, তখন এ অভাগার কথা একবার মনে করবে এবং সে পরলোকে থাকলেও তা'কে কৃপা করবে।"

আমরা দেখিয়াছি যে, কিশোর গদাধর একদিকে যেমন ভাবুক ও ধ্যানপরায়ণ, তেমনি অপর দিকে ছিল ক্রীড়া-কৌতুকে অনুরাগী এবং রঙ্গরসপ্রিয়। কিন্তু তাহার কথাবার্তা ও হাসিতামাসা সমস্তই ছিল এমন সহজ, সরল ও অনাবিল যে বৃদ্ধেরাও তাহাতে আমোদ উপভোগ করিতেন, ক্রুদ্ধ কিংবা অসন্তুষ্ট হইবার কোন হেতু তাহাতে পাইতেন না। অপরের কণ্ঠস্বর, ভাবভঙ্গী প্রভৃতি নকল করিতে গদাধর ছিল অদ্বিতীয়। বিশেষতঃ মেয়েদের হাবভাব, বেশভূষা সে এমন নিখুঁতভাবে নকল করিত যে, তাহাকে পুরুষ বলিয়া চিনিতে পারে কাহার সাধ্য? বণিক-পল্লীর সীতানাথ পাইনের বাড়ীতে গদাধর সর্বদাই যাতায়াত করিত। উক্ত পাড়ার দুর্গাদাস পাইন ছিলেন মেয়েদের কঠোর অবরোধ-প্রথার পক্ষপাতী। প্রতিবেশী সীতানাথের বাড়ীতে স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে সকলেরই সহিত গদাধরের অবাধ মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা দেখিয়া তিনি বিষম বিরক্ত হইতেন। তাঁহার দৃষ্টিতে উহা নিতান্ত দূষণীয় মনে হইত। তিনি সদর্পে ঘোষণা করিতেন যে, অপর সকলের বাড়ীতে যাহাই হউক না কেন, তাঁহার নিজের বাড়ীতে মেয়েরা অসূর্যম্পশ্যা—তাঁহার অন্দরমহলে ভিন্ন পরিবারের কোন পুরুষ-মানুষ কখনও প্রবেশ করিতে পারে না এবং পারিবেও না। বলা বাহুল্য, এই সকল উক্তিতে কটাক্ষ থাকিত সীতানাথের পরিবারবর্গের এবং গদাধরের প্রতি। দুর্গাদাসের এই সন্দেহাতুর ভাব ও অদ্ভুত শুচিবাই গদাধরের নিকট বড়ই বিসদৃশ ঠেকিত। সে মনে মনে ভাবিল, বৃদ্ধের অহঙ্কার চূর্ণ করিতে হইবে। আর একদিন যখন এই প্রসঙ্গ তুলিয়া দুর্গাদাস খুব গর্বপ্রকাশ করিতেছেন, তখন গদাধর আস্তে আস্তে সম্মুখে গিয়া কহিল, "মহাশয়! আমি কিন্তু ইচ্ছা করলে আপনার বাড়ীর ভেতরেও অনায়াসেই ঢুকতে পারি এবং মেয়েদের সঙ্গে ভাব করে সেখানকার সব খবরাখবর নিয়ে আসতে পারি।" দুর্গাদাস রাগিয়া

জবাব দিলেন, "ভাল, একবার চেষ্টা করেই দেখ না কেন? কেমন পার দেখা যাবে।"

উপরিবর্ণিত কথাবার্তার কয়েকদিন পরে একদা সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুর্গাদাস নিজের বাড়ীর সম্মুখে পায়চারি করিতেছেন, এমন সময়ে লম্বাঘোমটা-পরা একটি মেয়ে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বিনম্রভাবে নিজের পরিচয় দিতে গিয়া কহিল যে, সে নিকটবর্তী অমুক গ্রামের একজন তাঁতি-বৌ, কামারপুকুরের হাটে সুতা বেচিতে আসিয়াছিল—বেচাকেনায় দেরী হওয়াতে সঙ্গীসাথীরা তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে, এখন অন্ধকারে সে একলা যাইতে সাহস পাইতেছে না—যদি দুর্গাদাস দয়া করিয়া রাত্রিকালে তাহাকে আপন আলয়ে স্থান দেন, তবে সে বড়ই অনুগৃহীত ও উপকৃত হয়, ইত্যাদি। দুর্গাদাস তখনই লোক ডাকিয়া তাহাকে বাড়ীর ভিতরে পাঠাইয়া দিলেন। কচি বৌ দেখিয়া আগন্তুকের প্রতি মেয়েমহলে যথেষ্ট কৌতূহল ও সহানুভূতির সঞ্চার হইল। তাঁহারা তাঁতি-বৌকে পরম সমাদরে গ্রহণপূর্বক কিছু জলখাবার খাইতে দিয়া খুব আলাপ জুড়িয়া দিলেন।

এদিকে যখন সন্ধ্যা পার হইয়া রাত্রি ঘনাইয়া আসিল অথচ গদাধর বাড়ী ফিরিল না, তখন চন্দ্রাদেবী রামেশ্বরকে গদাধরের সন্ধানে পাঠাইলেন। রামেশ্বর এ-বাড়ী ও-বাড়ী গিয়া খোঁজ করিতে এবং মাঝে মাঝে উচ্চৈঃস্বরে গদাধরের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। দুর্গাদাসের বাড়ীর কাছে আসিয়া যেমনি ঐরূপ ডাক দিয়াছেন, অমনি 'দাদা, যাচ্ছি গো' বলিয়া তাঁতি-বৌ ঘোমটা খুলিয়া দে ছুট্! চারিদিকে হাসির রোল পড়িয়া গেল; এমন কি, গুরু-গম্ভীর দুর্গাদাস পর্যন্ত সে হাসিতে যোগ না দিয়া পারিলেন না।

অভিনয় ও সঙ্গীত ব্যতীত চিত্রাঙ্কন এবং মূর্তিগঠনেও গদাধরের অসামান্য দক্ষতা ছিল। এ সকল বিদ্যা সে কাহারও নিকট শিক্ষা করে নাই, অথবা তাহাকে শিখিতে হয় নাই। স্বাভাবিক প্রতিভা এবং মনোনিবেশের ফলেই সে এগুলি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছিল। পটুয়া এবং কুমারদের পাশে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে তাহাদের কার্যপ্রণালী দেখিত এবং পরে তাহা নিজে অভ্যাস করিত। মূর্তিগঠনে তাহার হাত এত সুনিপুণ ছিল যে, পাকা কারিগরেরাও তাহার নিকট হার মানিত। তাহাদের তৈরী মূর্তিসমূহের অতি সূক্ষ্ম

দোষত্রুটি গদাধর এমন অভ্রান্তরূপে দেখাইয়া দিত যে, তাহার মতামত তাহারা শ্রদ্ধার সহিত শুনিত এবং অনেক ক্ষেত্রেই গ্রহণ করিত।

সাংসারিক প্রয়োজনে এবং দেখাসাক্ষাতের জন্য রামকুমার মধ্যে মধ্যে কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিতেন। একবার বাড়ী আসিয়া দেখিলেন গদাধর পাঠশালায় যাওয়া সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিয়াছে; গ্রামে এক সখের যাত্রার দল গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা লইয়াই গদাধর একেবারে মত্ত, বড় বড় ভূমিকা সে-ই গ্রহণ করে, আবার অন্যান্য বালকদিগকে সে-ই অভিনয় ও গান শিক্ষা দেয়। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া রামকুমারের মনে বড়ই উদ্বেগ জন্মিল। জননী ও রামেশ্বরের সহিত পরামর্শক্রমে তিনি স্থির করিলেন গদাধরকে এবারে কলিকাতায় নিজের কাছেই লইয়া যাইবেন। আশ্চর্যের বিষয়, গদাধরেরও এই প্রস্তাবে কোনরূপ অমত কিংবা আপত্তি হইল না। ১২৫৯ বঙ্গাব্দের (১৮৫৩ খৃঃ) এক শুভদিনে শুভক্ষণে ৺রঘুবীর ও মাতৃদেবীর চরণবন্দনা করিয়া অগ্রজের সহিত গদাধর কলিকাতায় প্রস্থান করিল।

কামারপুকুরের আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া গেল। আনন্দ যেন গদাধর-মূর্তি ধরিয়া গত সতরো বৎসরকাল কামারপুকুর চির-উৎসবময় করিয়া রাখিয়াছিল। আজ নিয়তির দারুণ আঘাতে সহসা সকল আলো নিভিয়া গেল। সেই কলকণ্ঠের, সেই অমিয়বর্ষী হাসিরাশির স্মৃতিমাত্র প্রতিবাসীর বুক জুড়িয়া বেদনা ও সান্ত্বনার হেতু হইয়া রহিল!

দক্ষিণেশ্বর

দুই উদ্দেশ্যে রামকুমার গদাধরকে কলিকাতায় লইয়া আসিয়াছিলেন। টোলের অধ্যাপনা, গৃহস্থালির কাজকর্ম, যজন-যাজন প্রভৃতি সব দিক সামলানো তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। তাই ভাবিয়াছিলেন, গদাধর কাছে থাকিলে কতক সাহায্য পাওয়া যাইবে। উহা ছিল গৌণ উদ্দেশ্য। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল গদাধরকে লেখাপড়া-শেখানো। বিদ্যাশিক্ষায় গদাধরের অমনোযোগ দেখিয়া এবং পরিবারের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া রামকুমার বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার মনে ভরসা ছিল যে, তাঁহার নিজের তত্ত্বাবধানে ও টোলের সংস্রবে থাকিলে আপনা হইতেই গদাধরের পড়াশুনায় মন বসিবে; আর গদাধরের যেরূপ অদ্ভুত প্রতিভা ও স্মরণশক্তি, তাহাতে লেখাপড়ায় একবার মন বসিলে তাঁহার উন্নতির জন্য আর একটুও ভাবিতে হইবে না।

কামারপুকুরের আনন্দের হাট ও স্নেহময়ী জননীর অঞ্চল হইতে গদাধরকে ছিনাইয়া আনা হইয়াছিল; সুতরাং রামকুমারের মনে বিষম ভাবনাও ছিল যে, কলিকাতার নিরানন্দ বাসাবাড়ীতে হয় ত বেশীদিন তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারা যাইবে না, দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িবেন। কিন্তু কার্যতঃ সমস্যাটা এভাবে দেখা না দিয়া দেখা দিল অন্য আকারে।

গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন। কলিকাতায় আসিয়াই তাঁহার সাহায্যের নিমিত্ত ছোট-খাট যাজনিক ক্রিয়াকর্মের ভার তিনি নিজের উপর লইলেন। এই সূত্রে কয়েকটি পরিবারের সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ হইল। যেখানে যেখানে পূজাপার্বণ করাইতে যাইতেন, সেখানকার লোকজনের সহিত অতি সহজেই গদাধরের আত্মীয়তা জন্মিয়া যাইত; কেননা তাঁহার আচরণ মোটেই ব্যবসাদার পুরোহিতদের মত ছিল না। যজমানের বাড়ীতে পূজার আয়োজনে তিনি নিজেই উৎসাহভরে লাগিয়া যাইতেন—এমন কি, মেয়েদের ছোট-খাট কাজে এমন সহজভাবে সাহায্য করিতেন, একেবারে তিনি যেন তাহাদের চিরপরিচিত

নিতান্ত আপনার লোক! পূজায় বসিলে গদাধর তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ তন্ময়তার সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া আরাধ্য দেবতার অর্চনাদি করিতেন; উহাতে যজমানের হৃদয়ে স্বতঃই ভক্তিশ্রদ্ধার উদয় হইত। অধিকন্তু, তাঁহার মধুর কণ্ঠের ভজন-সঙ্গীত সকলকেই মুগ্ধ করিত।

ক্রমে ক্রমে পাড়ার ভিতরে গদাধরের অনেক সঙ্গী জুটিয়া গেল। তিনি তাহাদের সহিত মিলিয়া খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ ও গানবাজনা করিতেন। নূতন পরিবেশের মধ্যে এইরূপে গদাধর অনায়াসেই নিজেকে মানাইয়া লইলেন। কিন্তু লেখাপড়ায় তাঁহার বিন্দুমাত্র অনুরাগ দেখা গেল না। পাছে বিপরীত ফল হয়, সেই ভয়ে রামকুমার প্রথমে এবিষয়ে ভাইকে কোন কিছু বলিতে সাহস পাইতেন না। কিন্তু যখন মাস কয়েক অতিবাহিত হইবার পরেও গদাধরের মতিগতির কোন পরিবর্তন ঘটিল না, তখন তিনি বলিতে বাধ্য হইলেন। একদিন গদাধরকে নিভৃতে ডাকিয়া পরম স্নেহে নানাভাবে বুঝাইয়া কহিলেন যে, ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিয়া লেখাপড়া না শিখিলে লোকে মূর্খ বলিয়া উপহাস করিবে এবং আহারও জুটিবে না; অতএব একটু কষ্টস্বীকার করিয়া এই বয়সে বিদ্যাভ্যাস করা নিতান্ত আবশ্যক, ইত্যাদি। আশ্চর্যের বিষয়, পিতৃতুল্য অগ্রজের মুখে এরূপ কাতরোক্তি শুনিয়াও গদাধর কিছুমাত্র লজ্জিত কিংবা বিচলিত হইলেন না। নিঃসঙ্কোচে এবং সুস্পষ্ট ভাষায় তিনি জবাব দিলেন যে, চালকলাবাঁধা বিদ্যায় তাঁহার কোনই দরকার নাই—শিখিতে হয় ত এমন বিদ্যা শিখিবেন, যাহাতে ঈশ্বরলাভ হয় এবং জীবনের সকল প্রয়োজন নিঃশেষে মিটিয়া যায়। বালকের মুখে এরূপ উক্তির তাৎপর্য রামকুমারের মোটেই হৃদয়ঙ্গম হইল না। তিনি কনিষ্ঠের একগুঁয়েমির কথা বিলক্ষণ জানিতেন। অতএব মনের দুঃখ মনে চাপিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে ঐভাবে সম্পূর্ণ দুই বৎসর কাটিয়া গেল, কিন্তু গদাধরের জীবনের দিক হইতে এই সময় যে বৃথা নষ্ট হইয়াছিল, তাহা নহে। যে পরাবিদ্যালাভের নিমিত্ত তিনি মনে মনে অতিশয় ব্যাকুল ছিলেন, উহার অনুশীলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র ইত্যবসরে তাঁহার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।

রাণী রাসমণির নাম আমাদের দেশে প্রাতঃস্মরণীয়। এরূপ মহীয়সী নারীর সংখ্যা সব দেশের ইতিহাসেই বিরল। তিনি জন্মিয়াছিলেন হালিশহরের

নিকটবর্তী কোণা গ্রামে এক অতি দরিদ্র গৃহস্থ পরিবারে ; কিন্তু পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন কলিকাতা জানবাজারের প্রসিদ্ধ ধনী জমিদার রাজচন্দ্র দাসের সহিত। চারিটি কন্যাসন্তানের জননী হইবার পর প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করিতে না করিতেই রাণী রাসমণি বৈধব্যদশায় পতিত হন। কুলবধূ হইয়াও বিশাল জমিদারি-পরিচালনার ভার তখন তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। যেমন ছিল তাঁহার ক্ষুরধার বুদ্ধি, তেমনি ছিল তাঁহার তেজস্বিতা। অনেক জটিল মোকদ্দমা তিনি নিজের বুদ্ধিবলেই পরিচালনা করিতেন। শোনা যায়, একবার কোনও মোকদ্দমায় তাঁহাকে জেরা করিতে গিয়া বিপক্ষের উকীল নাস্তানাবুদ হইয়াছিলেন। রাণী রাসমণির সৎসাহস, বুদ্ধিমত্তা ও অকুতোভয়তা সম্পর্কে বহু গল্প প্রচলিত আছে।

জমিদারী-পরিচালনায় রাণীর প্রধান সহায়ক ছিলেন তাঁহার তৃতীয় জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাস। তৃতীয়া কন্যা অকালে পরলোকগমন করিলে চতুর্থ কন্যাকেও মথুরানাথের হস্তেই সমর্পণ করিয়া রাণী তাঁহাকে গৃহজামাতা-রূপে নিজের কাছেই রাখিয়াছিলেন।

রাণী বিষয়বুদ্ধিতে পাকা হইলেও বিষয়ী ছিলেন না। তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্যের অন্ত ছিল না। তিনি খুব কঠোর সংযত জীবনযাপন করিতেন। সংসারে থাকিয়া এবং সংসারের সকল কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করিয়াও তিনি পারমার্থিক চিন্তায় নিবিষ্ট থাকিতেন। রাণী রাসমণির প্রতিকৃতির দিকে তাকাইলে তাঁহার মুখাবয়বের একটা সুসংযত সৌন্দর্য, দৃঢ়তা ও প্রশান্তভাব দর্শকের চিত্তকে সহজেই মুগ্ধ করে এবং তাঁহার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

রাণী রাসমণি ছিলেন ৺মা-কালীর সেবিকা। তাঁহার জমিদারীর শীল-মোহরে লেখা ছিল 'কালীপদ-অভিলাষী শ্রীমতী রাসমণি দাসী'। সকল ইচ্ছা, সকল কাজ তিনি শ্যামাপদে অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমগ্র জীবন ছিল যেন জগজ্জননীর নিকট উৎসর্গীকৃত একখানি নৈবেদ্যের ডালি।

রাণী রাসমণি অনেক দিন যাবৎ তীর্থযাত্রার অভিলাষ মনে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু সাংসারিক কাজের চাপে বাহিরে যাইবার অবকাশ ঘটিয়া উঠিতেছিল না। অবশেষে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মথুরানাথকে সকল কাজের ভার দিয়া

তিনি বারাণসী যাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং যাত্রার আয়োজন-উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তখনও রেলগাড়ী হয় নাই; কাশীধামে যাইতে হইলে নৌকাযোগে কিংবা পদব্রজে যাইতে হইত। রাণীর যাত্রার জন্য আবশ্যক দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ করিয়া অনেকগুলি নৌকা সজ্জিত হইল। সমস্ত আয়োজন একেবারে সম্পূর্ণ; কিন্তু যেদিন প্রভাতে নৌকা ছাড়া হইবে, তাহার পূর্ব রাত্রিতে রাণী স্বপ্ন দেখিলেন, দেবী আদেশ করিতেছেন, 'কাশী যাইবার আবশ্যক নাই, গঙ্গাতীরে মন্দিরনির্মাণ করাইয়া তাহাতে আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা কর, আমি তোমার নিত্যপূজা গ্রহণ করিব।'

তীর্থযাত্রা বন্ধ হইয়া গেল। স্বপ্নাদেশ-প্রতিপালন করাই হইল এখন রাণীর একমাত্র চিন্তা। সেই চিন্তায়ই তিনি সমস্ত মনপ্রাণ ঢালিয়া দিলেন। জমির সন্ধানে চারিদিকে লোক পাঠানো হইল। গঙ্গার এপার-ওপার অনেক খোঁজ করিয়াও উপযুক্ত জমি আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। জমি পছন্দ হয় ত মালিক বিক্রয় করিতে চাহে না; মালিক যে জমি বিক্রয় করিতে রাজী, সেই জমি হয় ত পছন্দ হয় না। অনেক চেষ্টার পর অবশেষে এটর্ণী হেষ্টি সাহেবের নিকট হইতে দক্ষিণেশ্বরে ষাট বিঘা পরিমাণ একখণ্ড পছন্দসই জমি ক্রয় করা হইল এবং দেখিতে দেখিতে সেখানে মন্দির-নির্মাণ আরম্ভ হইয়া গেল। মন্দিরের নক্সা ও পরিকল্পনা রাণী রাসমণির ভক্তি ও ঐশ্বর্যের অনুরূপ বিরাট রকমেরই হইয়াছিল। নির্মাণকার্য শেষ হইতে সময় লাগিল সুদীর্ঘ আট বৎসর। যেমন মনোরম স্থান নির্বাচিত হইয়াছিল, সেই স্থানের উপর গড়িয়া উঠিল তেমনই নয়নাভিরাম দেবালয়। শ্রীরামকৃষ্ণ* বলিতেন, স্থানটি ছিল কবরডাঙ্গা এবং উহার আকৃতি ছিল কূর্মপৃষ্ঠের ন্যায়, অর্থাৎ মধ্যস্থল উঁচু এবং চারিদিক ক্রমশঃ ঢালু। শাস্ত্রমতে এরূপ কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি স্থান তান্ত্রিক সাধনার বিশেষ উপযোগী।

---

* এখন হইতে আমরা গদাধর না বলিয়া 'শ্রীরামকৃষ্ণ' বলিব। কারো কারো মতে এই নাম মথুরবাবুর অথবা শ্রীমৎ তোতাপুরীর দেওয়া। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নহে। রাণী রাসমণির দানপত্রে [শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে উদ্ধৃত) ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দেই 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য' নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ইহাই ছিল তাঁহার পিতৃদত্ত আসল নাম, 'গদাধর' ছিল ডাক নাম। তাঁহার সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর নামের আদিতেই 'রাম' শব্দটি দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—রামকুমার, রামেশ্বর, রামশীলা।

দক্ষিণেশ্বর কলিকাতার প্রায় চারি মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। রাসমণির নির্বাচিত স্থানটি ক্রমে ক্রমে সুন্দর হর্ম্যরাজি ও মনোহর উদ্যানে সুশোভিত হইয়া উঠিল। জলপথে সেখানে গিয়া অবতরণ করিলে, প্রথমেই প্রশস্ত ও দীর্ঘ-সোপানরাজি-শোভিত ঘাট। ঘাটের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলে দুই দিকে ফুলের বাগান। তার পর প্রবেশ-তোরণ। উহার দুই ধারে শ্রেণীবদ্ধভাবে ছয়টি করিয়া শিবমন্দির। তোরণ পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে পশ্চিমমুখী বিষ্ণুমন্দির এবং উহার ঠিক দক্ষিণে প্রায় সংলগ্নভাবে দক্ষিণমুখী কালীমন্দির। কালীমন্দিরটি 'নবরত্ন' অর্থাৎ নয়টি-চূড়াবিশিষ্ট। মন্দিরের সম্মুখে প্রশস্ত নাটমন্দির। প্রাঙ্গণের পূর্ব ও দক্ষিণ সীমায় অনেকগুলি ছোট ছোট ঘর—রান্নাঘর, ভাঁড়ার-ঘর, পরিচারকদের থাকিবার ঘর, ইত্যাদি। উত্তর দিকে একটি ফটক এবং তাহারও দুই পাশে ঘর। পশ্চিম প্রান্তে একখানি নাতিবৃহৎ থাকিবার ঘর; ঐ ঘরটিতেই শ্রীরামকৃষ্ণ বাস করিতেন। ঘরখানির পশ্চিমদিকে একটি গোল বারান্দা—একেবারে গঙ্গার উপরেই বলা যায়। উত্তরদিকেও প্রশস্ত বারান্দা। এইরূপে চক-মিলান প্রাঙ্গণের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দুই কোণে দুইটি নহবতখানা। উত্তরের ফটক পার হইয়া একটু দূরে রাণী রাসমণির বাড়ীর লোকদের বাসের জন্য পৃথক দালান কোঠা প্রভৃতি। মন্দিরের বাহিরে প্রকাণ্ড বাগান; উহাতে তিনটি পুকুর ও নানাবিধ ফল-ফুলের গাছ। তদ্ভিন্ন পঞ্চবটীর অবশেষ একটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থ ও বাগান-বাড়ীর উত্তর সীমায় অবস্থিত একটি বিল্ববৃক্ষ—বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চতুর্দিকে কলকারখানা ও বণিক-সভ্যতার বিবিধ সাজসরঞ্জামের আমদানিতে এই তপঃক্ষেত্রের শান্তরসাস্পদ ভাব ইদানীং প্রায় বিনষ্ট হইয়াছে। যত্নের অভাবে মন্দির এবং উদ্যানবাটিকাও শ্রীহীন হইয়াছে। কিন্তু তবুও সেখানে গেলেই দর্শকের নয়ন-মন মুগ্ধ হয়। জোয়ারে ভাগীরথীর উচ্ছল জলরাশি উহার পাদপীঠ ধৌত করিয়া যখন কলকল নাদে উজান বহিতে থাকে এবং শত শত নৌকা সাদা পাল তুলিয়া গঙ্গাবক্ষে পাড়ি দেয়, তখন সেই স্রোতের টান দর্শকের মনকেও যেন বহুদূরে এবং বহু ঊর্ধ্বে টানিয়া লইয়া যায়। যখন ভক্তিমতী রাসমণি স্বয়ং মন্দিরের তত্ত্বাবধান করিতেন এবং নরদেবতা সেখানে লীলা করিতেন, তখন না জানি কোন্ স্বর্গীয় সুষমা

তথায় বিরাজ করিত! শোনা যায়, মন্দিরনির্মাণে ও মূর্তিপ্রতিষ্ঠায় রাণী রাসমণি অন্যূন নয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন।

মন্দিরনির্মাণের কাজ যতই শেষ হইয়া আসিতে লাগিল, মূর্তিপ্রতিষ্ঠার শুভদিনের আগমন-প্রতীক্ষায় রাণীর মন ততই চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার পথে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা দিল এক দুরূহ প্রতিবন্ধক। রাণী ছিলেন শূদ্রজাতীয়া। একথা কাহারও খেয়াল ছিল না যে, সামাজিক প্রথানুযায়ী তাঁহার নির্মিত মন্দিরে কোন শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ পূজারীর পদ গ্রহণ করিবেন না এবং পূজার ব্যবস্থা যদি বা কোন গতিকে হয়, তবুও ঠাকুরদেবতার অন্নভোগের ব্যবস্থা কিছুতেই হইবে না। এত দিনের এবং এত সাধের বিরাট আয়োজন পণ্ড হইবার উপক্রম দেখিয়া রাণীর মনে দারুণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সঞ্চার হইল। ব্যাকুলভাবে তিনি চতুর্দিকে পণ্ডিতদিগের মতামত চাহিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার মনে এই ভরসা ছিল যে, হয়ত নানা স্থানের পণ্ডিতবর্গের মধ্যে কেহ কোন উপায় নির্দেশ করিয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু উত্তর যাহা আসিল, সমস্তই নৈরাশ্যজনক। দেশ-বিদেশের একজন পণ্ডিতও এরূপ মত প্রকাশ করিলেন না, যাহাতে রাণীর উদ্দেশ্যসাধনের কিছুমাত্র অনুকূল হয়। এমতাবস্থায় রাণী যখন চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছিলেন, তখন ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠী হইতে তাঁহার নিকট আসিল একটি আশার বাণী। পণ্ডিত রামকুমার লিখিয়া পাঠাইলেন যে, যদি রাণী রাসমণি মন্দির কোন ব্রাহ্মণের নামে দান করেন এবং মন্দিরের ব্যয়নির্বাহের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ সম্পত্তিও ঐরূপভাবে ন্যস্ত করেন, তবে সকল দিক রক্ষা পাইতে পারে; কারণ, তাহা হইলে ঐ মন্দিরে পূজকের কাজ করিয়া কিংবা ওখানে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াও কোন ব্রাহ্মণের পতিত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। এই ব্যবস্থা যদিও শাস্ত্রসম্মত, তবু লোকাচারের অনুরোধে এবং সমাজের ভয়ে অন্যান্য পণ্ডিতেরা উহা সমর্থন করিলেন না। তাঁহারা বরঞ্চ ক্ষুব্ধ হইয়া উহার তীব্র প্রতিকূলতা করিলেন। কিন্তু রাণী রাসমণির নিকট রামকুমারের ব্যবস্থা খুবই মনঃপূত হইল। তিনি যেন অন্ধকারে পথ দেখিতে পাইলেন। মন্দির ও মন্দিরসংলগ্ন জমি তিনি তৎক্ষণাৎ আপন কুলগুরুর নামে দানপত্র করিয়া দিলেন।

কিন্তু কেবল কাগজে-কলমে ব্যবস্থাপত্র পাইলেই ত হয় না; ব্যবস্থা

কার্যে পরিণত হওয়া চাই। রামকুমারের ব্যবস্থানুযায়ী মন্দিরের পূজারী হইবার জন্য কোন উপযুক্ত এবং সদাচারী ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইয়া আসিলেন না। রাণীর সেরেস্তায় মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে একজন কর্মচারী ছিলেন। রাণীর সঙ্কট দেখিয়া তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ক্ষেত্রনাথকে বিষ্ণুমন্দিরের পূজার ভার লইতে কোনরকমে রাজী করাইলেন। মহেশচন্দ্রের ধারণা ছিল যে, প্রথমে একজন কেহ অগ্রসর হইলে পর তাঁহার অনুবর্তী হইবার জন্য আরও ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইবে। কিন্তু কার্যতঃ এই আশা পূর্ণ হইল না। বিশেষ যোগ্যতা না থাকিলে কালীপূজার অধিকারী হওয়া যায় না। সাধারণ উপবীতধারী ব্রাহ্মণ পাওয়া গেলেও, কালীপূজার ভার দিবার মত সুযোগ্য ব্রাহ্মণ একজনও পাওয়া গেল না।

এদিকে মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন আগতপ্রায়; আর অপেক্ষা করা চলে না। রামকুমারের সহিত মহেশচন্দ্রের পূর্বাবধি পরিচয় ও বন্ধুত্ব ছিল। মহেশচন্দ্র ভাবিলেন, এই সঙ্কটে রামকুমারের সাহায্য ব্যতীত উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই। কিন্তু রামকুমার যেরূপ আচারনিষ্ঠ পরিবারের লোক, তাহাতে তাঁহাকে রাজী করানো যাইবে বলিয়া মহেশচন্দ্রের মনে কিছুমাত্র ভরসা ছিল না। তবুও একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে অগ্রসর হইলেন। যাইবার সময়ে রাণীমার একখানি পত্র সঙ্গে নিলেন। পত্রে রাণী রাসমণি নিজের বিপন্ন অবস্থার উল্লেখ করিয়া ৺শ্রীশ্রীকালীমাতার মন্দির-প্রতিষ্ঠার কার্যভার গ্রহণ করিতে রামকুমারকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। পত্রখানি রামকুমারের হাতে দিয়া মহেশচন্দ্র তাঁহাকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া কহিলেন যে, তিনি সাহায্য না করিলে কিছুতেই আর মন্দির-প্রতিষ্ঠা হয় না, ভক্তিমতী রাণীর সমস্ত আয়োজন পণ্ড হইয়া যায়। যেহেতু রামকুমার স্বয়ং ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে রাণীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। স্থায়িভাবে পূজকের পদ গ্রহণ করিতে তিনি সম্মত হইলেন না; কিন্তু মন্দির-প্রতিষ্ঠার ভার তিনি গ্রহণ করিলেন।

১২৬২ সাল, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার (১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে) স্নানযাত্রার পুণ্যতিথিতে মন্দির-প্রতিষ্ঠার কার্য মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। দূরদূরান্তর হইতে বহু পণ্ডিত ও গুণিজন নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। সমস্তদিন ব্যাপিয়া পূজা, হোম, পাঠ, কীর্তন, দানদক্ষিণা ও প্রসাদবিতরণ

চলিতে থাকিল। একদিকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে রাণী যথাযোগ্য বিদায় ও প্রণামী দিলেন, অপর দিকে গরীব-দুঃখীর মধ্যে তিনি মুক্তহস্তে অন্নবস্ত্র ও অর্থ বিতরণ করিলেন। বিরাট মহোৎসব ও সমারোহের মধ্যে বিষ্ণুমন্দিরে ৺শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের এবং কালীমন্দিরে ৺ শ্রীশ্রীভবতারিণীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। রৌপ্যনির্মিত সহস্রদল পদ্মের উপর শয়ান মহাদেব—তাঁহার বুকের উপর নৃমুণ্ডমালিনী, খর্পরকরবালিনী, বরাভয়হস্তা ভবতারিণী কালী। অতি মনোহর মূর্তি, দেখিলেই নয়ন-মন মুগ্ধ হয়। মন্দির-প্রতিষ্ঠার কার্য নির্বিঘ্নে ও সুচারু-ভাবে সম্পন্ন হওয়াতে রাণীর আনন্দের সীমা রহিল না। স্বপ্নাদেশ পালন করিতে পারিয়া তিনি নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন।

মন্দির-নির্মাণ ও মন্দির-প্রতিষ্ঠা করিয়াই রাণী রাসমণি ক্ষান্ত রহিলেন না। যাহাতে অক্লেশে ও নির্বিবাদে মায়ের পূজা চিরকাল চলিতে পারে, সেরূপ ব্যবস্থাও অনতিকালমধ্যেই সম্পন্ন হইল। সওয়া-দুই লক্ষ টাকা মূল্যে দিনাজপুর জেলায় এক প্রকাণ্ড জমিদারি কিনিয়া উহার সমগ্র আয় মন্দিরের ব্যয়নির্বাহের জন্য তিনি নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ভবিষ্যতে যাহাতে এই সম্পর্কে গোলযোগের সৃষ্টি না হয়, তদুদ্দেশ্যে মৃত্যুর পূর্বে একটি দানপত্রও সম্পাদন করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গে আবার ফিরিয়া আসা যাউক। তাঁহার কলিকাতায় আগমনের দুই বৎসর পরে দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্পর্কে জ্যেষ্ঠভ্রাতার কার্যকলাপে তাঁহার মনে বড়ই ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। তাঁহার কেবলই মনে হইতেছিল, রামকুমার যেন কুলধর্ম বিসর্জন দিয়া শূদ্রের যাজন ও শূদ্রের প্রতিগ্রহ করিতে যাইতেছেন। মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিবসে তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া আনন্দোৎসবে যোগ দিলেন বটে, কিন্তু আহার-বিষয়ে ওখানকার কোন দ্রব্য কেহই তাঁহাকে গ্রহণ দূরের কথা, স্পর্শ পর্যন্ত করাইতে পারিল না। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য নিজের একটি পয়সা দ্বারা মুড়ি কিনিয়া খাইলেন এবং যখন ঐ স্থানে থাকিতে আর ভাল লাগিল না, তখন জ্যেষ্ঠের অপেক্ষা না করিয়াই তিনি বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

উৎসবান্তে রাণী রামকুমারকে ধরিয়া বসিলেন ৺মায়ের পূজার ভার তাঁহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে, অন্ততঃ যতদিন পর্যন্ত ঐ কাজের জন্য অপর কোন যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া না যায়। রাণীর আগ্রহাতিশয্যে রামকুমার

সম্মতি না দিয়া পারিলেন না। এক সপ্তাহ পরেও যখন রামকুমার বাসায় ফিরিলেন না, তখন শ্রীরামকৃষ্ণের বুঝিতে বাকী রহিল না ব্যাপারটা কোন্ দিকে গড়াইতেছে। দুই-এক দিন অপেক্ষা করিয়া অবশেষে তিনি নিজেই দক্ষিণেশ্বরে গেলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া অত্যন্ত বিরক্তি ও অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। পিতার অশূদ্রযাজিত্ব ও অপ্রতিগ্রাহিত্ব বাল্যাবধি তাঁহার মনে গভীরভাবে মুদ্রিত ছিল। রামকুমারের কার্যকলাপ তাঁহার নিকট মনে হইল যেন কুলধর্মের ও পিতৃ-আচরণের অবমাননা। রামকুমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নানা প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, কোনই অন্যায় অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ তিনি করেন নাই। কিন্তু জ্যেষ্ঠের যুক্তিতর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের মনে বিন্দুমাত্র প্রতীতি জন্মিল না। অবশেষে উভয়ে মিলিয়া সাব্যস্ত হইল যে, 'ধর্মপত্র-পরীক্ষা'* দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে কাহার মত ঠিক। এই পরীক্ষায় রামকুমারেরই জয় হইল। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু মন্দিরের প্রসাদ-গ্রহণে তিনি তখনও সম্পূর্ণ নারাজ। এরূপ মীমাংসা হইল যে, প্রত্যহ সিধা লইয়া গঙ্গাগর্ভে তিনি স্বহস্তে রান্না করিয়া খাইবেন। পতিতপাবনী গঙ্গার গর্ভে কোন বস্তুই অশুচি হয় না; স্পর্শদোষ, প্রতিগ্রহজনিত প্রত্যবায় প্রভৃতি কোন বাচবিচার সেখানে নাই। পরবর্তীকালের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের এই ঘটনা নিতান্ত অদ্ভুত ও খাপছাড়া বলিয়া প্রথম দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে উহার তাৎপর্য বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এই ব্যাপারে আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাই তাঁহার ধর্মবিশ্বাসের এবং আচারনিষ্ঠার গভীরতা ও ঐকান্তিকতা। এই জ্বলন্ত বিশ্বাস ও নিষ্ঠার বলে অগ্রসর হইয়াই তিনি চরম মুক্তিতে পৌঁছিয়াছিলেন। সত্যিকারের নিষ্ঠা মানুষকে ক্রমাগত সম্মুখের দিকে, বন্ধন-মুক্তির পথে লইয়া যায়, কোন একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে না।

* পল্লীগ্রামে রীতি আছে, কোন বিষয় যুক্তিদ্বারা মীমাংসিত না হইলে দৈবের উপর নির্ভর করিয়া দেবতার ঐ বিষয়ে কি অভীপ্সিত তাহা জানিবার জন্য কতকগুলি টুকরা কাগজে বা বিল্বপত্রে 'হাঁ' 'না' লিখিয়া একটি ঘটিতে রাখিয়া কোন শিশুকে একখণ্ড তুলিতে বলা হয়। শিশু 'হাঁ'-লিখিত কাগজ তুলিলে অনুষ্ঠাতা বুঝে, দেবতা তাহাকে ঐ কার্য করিতে বলিতেছেন।

ভবতারিণী-সকাশে

অন্তরে ঘোর বিতৃষ্ণার ভাব লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানকার পবিত্র সৌন্দর্যপূর্ণ আবেষ্টন তাঁহার মনের উপর স্নেহস্পর্শ বুলাইয়া অল্পদিনের মধ্যেই সেই বিতৃষ্ণার ভাব দূর করিয়া দিল। তাঁহার মনে হইল কলিকাতার রুদ্ধ আকাশ-বাতাস হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আবার যেন প্রকৃতির শান্তিময় ক্রোড়ে তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন। অধিকন্তু বরাভয়প্রদা শ্রীশ্রী৺ভবতারিণীর মূর্তির প্রতিও তিনি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

প্রথমাবস্থায় উপযুক্ত সঙ্গীর অভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ত কিছু অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়রাম দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে সেই অভাব শীঘ্র দূরীভূত হইল। আত্মীয়তাসূত্রে হৃদয়ের সহিত শৈশবাবধি তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও বন্ধুত্ব ছিল। সম্পর্কে মামা-ভাগ্নে হইলেও দুইজনের বয়স ছিল প্রায় সমান এবং পরস্পরের মধ্যে প্রীতির বন্ধনও ছিল নিবিড়। যৌবনে উপনীত হইয়া হৃদয়রাম কাজকর্মের চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধির সম্বল না থাকাতে কোনদিকেই সুবিধা হইয়া উঠিতেছিল না। এই সময়ে তিনি শুনিতে পাইলেন যে, জ্যেষ্ঠ মাতুল রামকুমার, রাণী রাসমণির মন্দিরে পূজার ভার পাইয়াছেন এবং কনিষ্ঠ মাতুল শ্রীরামকৃষ্ণও তথায় রহিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনে হইল যে, দক্ষিণেশ্বরে তাঁহাদের নিকট গেলে নিজেরও কর্মসংস্থান হইতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি চলিয়া আসিলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে পুরাতন বয়স্যকে পাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্লাদের সীমা রহিল না।

এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং হৃদয়রামের মধ্যে স্নেহের বন্ধন দৃঢ় থাকিলেও দুইজনের প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। হৃদয়ের মন ছিল বহির্মুখ, কোন সূক্ষ্ম বিষয়ে উহা প্রবেশ করিতে পারিত না, ভগবচ্চিন্তা প্রভৃতির তিনি কোন ধার ধারিতেন না। পক্ষান্তরে শ্রীরামকৃষ্ণের মন ছিল সম্পূর্ণ অন্তর্মুখ, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, উচ্চ হইতে উচ্চতর রাজ্যে উহা ধাবিত হইত—ঈশ্বরলাভই ছিল তাঁহার নিকট জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

জাগতিক ব্যাপারে, এমন কি শরীরপালন-সম্পর্কেও তিনি ছিলেন নিতান্ত উদাসীন। একাদিক্রমে পঁচিশ বৎসরকাল দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া হৃদয়রাম শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলেন। উক্ত সময়ের মধ্যে কঠোর সাধনার ফলে কত যে প্রবল ঝড় শ্রীরামকৃষ্ণের দেহের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঈশ্বরচিন্তায় অনেক সময়ে তিনি উন্মাদের প্রায় হইয়া যাইতেন; স্নান, আহার, নিদ্রা প্রভৃতি অপরিহার্য দৈনন্দিন কর্তব্যের প্রতিও তাঁহার কোন মনোযোগ থাকিত না। ঐ সঙ্কটের সময়ে অপর কোন ব্যক্তি তাঁহার সেবাযত্ন না করিলে, সর্বদা তাঁহাকে চোখে চোখে না রাখিলে তাঁহার শরীর সম্ভবতঃ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িত। হৃদয়রাম তখন ছায়ার ন্যায় সর্বক্ষণ কাছে থাকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে নিজের সাধকজীবনের প্রসঙ্গ উঠিলেই শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়ের নাম করিতেন, আর বলিতেন—হৃদু কাছে না থাকিলে তাঁহার নিজের কি-যে দশা ঘটিত, বলা যায় না, হয়ত শরীর মোটেই টিঁকিত না। এই কারণে হৃদয়রামের দক্ষিণেশ্বরে আগমন একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।*

ভবিষ্যতে সেবাশুশ্রূষার ভার লইতে যেমন হৃদয়রাম আপনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তেমনি অপরদিকে ঠিক ঐ সময়েই শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে অগ্রসর হইয়া আসিলেন এমন এক মহানুভব ব্যক্তি, যিনি তাঁহার সাধনকালের সমস্ত পার্থিব প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বিধাতা-কর্তৃক নিয়োজিত হইয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইনি রাণী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ। মন্দিরপ্রতিষ্ঠার অল্প কয়েকদিন পরেই মথুরবাবু একদিন দেখিতে পাইলেন যে, একটি সুদর্শন যুবক গঙ্গার ধারে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছে। যুবকের কমনীয় মুখকান্তি ও আপন-ভোলা ভাব দেখিয়া কেমন যেন মনে মনে তাঁহার প্রতি একটা আকর্ষণ তিনি অনুভব করিলেন। জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলেন যে, যুবকটি কালীমন্দিরের পূজক রামকুমার চাটুয্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। যুবক পড়াশুনায় অথবা কাজকর্মে

* ১৮৮১ খৃঃ পর্যন্ত হৃদয়রাম দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়াছিলেন। উক্ত সময়ে কোনও কারণ-বশতঃ মন্দিরের মালিকদের বিশেষ বিরাগভাজন হওয়াতে তিনি চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। কিন্তু তখন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন; অতএব হৃদয়রামের সাহায্য তাঁহার পক্ষে আর তত প্রয়োজনীয় ছিল না।

লিপ্ত নহে জানিয়া তিনি রামকুমারের নিকট প্রস্তাব পাঠাইলেন যে, তাঁহার ছোট ভাইটিকেও যদি মন্দিরের কাজে ভর্তি করিয়া দেন তবে বড়ই ভাল হয়। রামকুমার তখন মথুরবাবুর নিকট সকল কথা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন। কহিলেন যে, তাঁহার ভাইটি নিরীহ এবং শান্তশিষ্ট হইলেও বড়ই একগুঁয়ে, তাহার নিজের ইচ্ছা না হইলে তাহাকে রাজী করানো অসম্ভব। বর্তমানে তাহার যেরূপ মনোভাব, তাহাতে কিছুতেই তাহাকে সম্মত করানো যাইবে না, পরে যদি মনোভাবের পরিবর্তন হয় তখন দেখা যাইবে, ইত্যাদি। উদ্দেশ্য তৎক্ষণাৎ সিদ্ধ না হইলেও মথুরবাবু হাল ছাড়িলেন না। আর কিছু না বলিয়া তিনি উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন। অপর দিকে শ্রীরামকৃষ্ণের মনে দৃঢ় সঙ্কল্প—কাহারও চাকুরি করিবেন না, ভগবান্ ভিন্ন কাহারও সেবা করিবেন না। মথুরবাবুর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তিনি তাঁহাকে সর্বদা এড়াইয়া চলেন। মথুরবাবু মান্য ব্যক্তি; তিনি কোন অনুরোধ করিয়া বসিলে উহা প্রত্যাখ্যান করা সমীচীন কিংবা ভদ্রোচিত হইবে না। যাহাতে এরূপ কোন অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়িতে না হয়, তদুদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরবাবুকে দেখিলেই দূরে সরিয়া থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ অসামান্য রূপদক্ষ ছিলেন; তাঁহার ন্যায় মূর্তি গড়িতে কিংবা মূর্তির বেশভূষা করিতে অতি অল্প লোকেই পারিত। একদা তিনি গঙ্গা হইতে ভাল মাটি আনিয়া একটি খুব সুন্দর শিবমূর্তি গড়িয়া একমনে পূজা করিতেছিলেন, এমন সময় মথুরবাবু পিছন হইতে আসিয়া মূর্তিটি দেখিতে পাইলেন। মূর্তির গঠন দেখিয়া তিনি ত বিস্ময়ে অবাক্! বৃষভপৃষ্ঠে মহাদেব সমাসীন, হস্তে ত্রিশূল ও ডমরু, নয়নযুগল ধ্যানে অর্ধনিমীলিত, প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সাজসজ্জা একেবারে নিখুঁত! শ্রীরামকৃষ্ণ শিবের পূজায় গভীরভাবে নিমগ্ন, বাহ্যজ্ঞানশূন্য। মথুরবাবু নিঃশব্দে অনেকক্ষণ পর্যন্ত এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখিলেন এবং যাইবার সময়ে হৃদয়কে চুপি চুপি বলিয়া গেলেন যে, পূজা শেষ হইলে পর মূর্তিটি গঙ্গায় বিসর্জন না দিয়া যেন তাঁহাকে দেওয়া হয়। অতএব পূজান্তে হৃদয় মূর্তিটি মাতুলের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া মথুরবাবুর নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন। মথুরবাবু উহা রাণী রাসমণিকে দেখাইতে লইয়া গেলেন। মূর্তির গঠননৈপুণ্য রাণীমাকেও

মুগ্ধ করিল। মাটির মূর্তিতে এমন অনুপম সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিতে সচরাচর দেখা যায় না। যেরূপ একাগ্রতার সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ মহাদেবের আরাধনায় নিমগ্ন ছিলেন, তাহাও মথুরবাবুর চিত্তে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। ছোটখাট আরও নানাবিধ অভিজ্ঞতার ফলে মথুরানাথ ক্রমেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন; তাঁহার মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে, ইনি সাধারণ যুবক নহেন। কিরূপে ইঁহাকে মন্দিরে পূজকের আসনে বসাইতে পারা যায়—এই চিন্তা মথুরবাবুকে যেন একেবারে পাইয়া বসিল।

একজন যেমন ধরিবার জন্য ব্যগ্র, আর একজন তেমনি ধরা না দিবার জন্য সদা সতর্ক। এইভাবে কিছুদিন গত হইবার পর অবশেষে ধরা দিতেই হইল। একদা মথুরবাবু দর্শনাদি করিতে জানবাজার হইতে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন, এমন সময়ে দূর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া তখনই ডাকিয়া পাঠাইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বড়ই ভাবনায় পড়িলেন, যাইবেন কিংবা যাইবেন না—কিছুই ঠিক করিতে পারেন না। নিকটেই হৃদয়রাম উপস্থিত ছিলেন; মাতুলের এই পলায়নপর ভাব তাঁহার বড়ই অপছন্দ ছিল। তিনি মাতুলকে বুঝাইয়া কহিলেন যে, মথুরবাবু যখন ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, তখন যাওয়া নিতান্ত উচিত, যাইতে অস্বীকার করা কিংবা ইতস্ততঃ করা মোটেই ভাল দেখায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ কারণ দেখাইলেন যে, গেলেই মথুরবাবু চাকুরি লইতে বলিবেন—তখন কি উপায় হইবে? হৃদয় তদুত্তরে কহিলেন যে গঙ্গাতীরে এমন সুন্দর দেবস্থান, এখানে থাকিতে পাওয়াই ত পরম সৌভাগ্য; তা ছাড়া মথুরবাবু ও রাণী রাসমণি উভয়েই অতিশয় উদার এবং দয়ালু ব্যক্তি—উঁহাদের নিকট হইতে কোনরূপ দুর্ব্যবহারের আশঙ্কা করা অনুচিত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন যে শুধু পূজার কাজ হইলে তিনি নিতেও বা পারিতেন, কিন্তু বিগ্রহের অঙ্গে যে-সকল মূল্যবান অলঙ্কারপত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদ রহিয়াছে, সেগুলির তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব; হৃদয় উহার ভার নিতে রাজী থাকিলে তিনি মথুরবাবুর সম্মুখে যাইতে প্রস্তুত আছেন। হৃদয় ত চাকুরির চেষ্টায়ই আসিয়াছিলেন; অতএব এই প্রস্তাবে আনন্দের সহিত সম্মত হইলেন।

মথুরবাবুর মনোভাব শ্রীরামকৃষ্ণ যথার্থ অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে সম্মুখে পাইয়াই মথুরবাবু ধরিয়া বসিলেন মন্দিরের কোন-না-কোন

কাজের ভার তাঁহাকে লইতে হইবে—পূজার ভার লইতে যদি বা আপত্তি কিংবা অনিচ্ছা থাকে, তবে দেবতার অঙ্গরাগ এবং সাজসজ্জার ভার অন্ততঃ তাঁহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে, আর এ বিষয়ে যথেষ্ট যোগ্যতা যে তাঁহার রহিয়াছে, মূর্তিগঠনে নৈপুণ্যই উহার অকাট্য প্রমাণ। শ্রীরামকৃষ্ণ মনে মনে যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই কার্যে পরিণত হইল। নিরুপায়ভাবে তিনি কহিলেন যে, যদি বিগ্রহের অলঙ্কারপত্রের জন্য দায়ী হইতে না হয়, তবে কোন-একটা কাজের ভার লইতে তিনি প্রস্তুত আছেন। হৃদয়ের সহিত পূর্বে যেরূপ পরামর্শ করিয়া আসিয়াছিলেন, অবশেষে তদ্রূপ ব্যবস্থাই হইয়া গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং হৃদয়রাম উভয়েই একসঙ্গে কার্যে নিযুক্ত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রহণ করিলেন কালীমন্দিরে বেশকারীর পদ ; হৃদয়রামের কর্তব্য হইল রামকুমার ও শ্রীরামকৃষ্ণের কাজকর্মে আবশ্যকমত সাহায্যদান। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়াতে মথুরবাবু নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন। ভ্রাতার মতিগতির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন দেখিয়া রামকুমারের মনেও খুব সন্তোষ জন্মিল।

উপরের ঘটনাগুলি কালীমন্দির-প্রতিষ্ঠার পরবর্তী তিন মাসের মধ্যেই হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বেশকারীর পদে নিযুক্ত হইবার অল্প দিন পরেই আবার এমন একটি ব্যাপার ঘটিল, যাহার ফলে রাণী রাসমণি এবং মথুরানাথ তাঁহার প্রতি আরও অধিক অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। জন্মাষ্টমীর পরদিন নন্দোৎসব। সেদিন মধ্যাহ্নে ৺শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদির পর পুরোহিত ক্ষেত্রনাথ শ্রীবিগ্রহকে বিশ্রামঘরে লইয়া যাইবার সময়ে অকস্মাৎ পা পিছলাইয়া পড়িয়া যান। উহার ফলে বিগ্রহের একখানি পা একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। এই দুর্ঘটনায় মন্দিরের সকলেই ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। সংবাদ যখন রাসমণির কাণে পৌঁছিল, তখন তিনিও অত্যন্ত অস্থির হইলেন। এরূপ ঘটনা অমঙ্গলসূচক ; অতএব শীঘ্র প্রতিকার করা আবশ্যক। দেশপ্রথানুযায়ী ভগ্ন প্রতিমাতে দেবপূজা নিষিদ্ধ ; অথচ পূজা না করিয়া বিগ্রহই বা কেমন করিয়া রাখা যায় ? এই সঙ্কটে কি কর্তব্য সেই বিষয়ে পণ্ডিতদের মতামত গ্রহণ করিবার জন্য রাণী রাসমণি মথুরানাথকে আদেশ দিলেন। পণ্ডিতেরা একমত হইয়া ব্যবস্থা দিলেন—ভগ্ন বিগ্রহ গঙ্গাতে বিসর্জন দিয়া নূতন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই

ব্যবস্থানুযায়ী নূতন মূর্তি-নির্মাণের আদেশ তখনই দেওয়া হইল বটে, কিন্তু যে মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠাপূর্বক এতদিন ভক্তিভরে সেবাপূজা করা হইয়াছে, তাহাকে এমনভাবে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিবার প্রস্তাবে রাণীর প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল; উক্ত প্রস্তাব তাঁহার মোটেই মনঃপূত হইল না। বিধান যতই শাস্ত্রসম্মত হউক, রাণীর মন উহাতে কিছুতেই যেন সায় দিতেছিল না। অবশেষে মথুরবাবুর অনুরোধে রাণী রাসমণি শ্রীরামকৃষ্ণের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণের সাত্ত্বিক ভাব ও আচরণ দেখিয়া মথুরবাবু মুগ্ধ হইয়াছিলেন—তাঁহার সুদৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ধর্মের ব্যাপারে শুধু পুঁথিপড়া পণ্ডিতদিগের মতামত অপেক্ষা এই ভক্তিমান, নিষ্ঠাবান্ ও তপস্বী যুবকের মতামত অধিকতর মূল্যবান্। প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট অবস্থায় পাল্টা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যদি রাণীর কোন জামাতার পা ভাঙ্গিয়া যাইত, তবে কি তাঁহাকে বর্জন করা হইত, না চিকিৎসার দ্বারা তাঁহার পা সারাইবার চেষ্টা করা হইত? তিনি দৃঢ়তার সহিত কহিলেন যে, বিগ্রহকে গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিবার পক্ষে কোনই যুক্তি নাই; বিগ্রহের ভগ্ন পদটি জুড়িয়া দেওয়াই সর্বতোভাবে বিধেয়। রাণী রাসমণি ও মথুরানাথের নিকট উক্ত পরামর্শ খুবই সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। যুবকের সহজ, সরল ও সাহসিকতাপূর্ণ উক্তি শুনিয়া তাঁহার প্রতি উভয়ের শ্রদ্ধাভক্তি আরও শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং এমন নিপুণভাবে বিগ্রহের পা জুড়িয়া দিলেন যে, উহা যে কখনও ভাঙ্গিয়াছিল তাহা আর মোটেই বুঝিবার উপায় রহিল না। বিগ্রহের পা ভাঙ্গিবার পরমুহূর্তেই ক্ষেত্রনাথকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এবারে রাণী রাসমণি ও মথুরবাবুর নির্বন্ধাতিশয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ রাধাগোবিন্দের পূজার ভার গ্রহণ না করিয়া পারিলেন না। ওদিকে ৺শ্রীশ্রীভবতারিণীর বেশ-বিন্যাস ও রামকুমারকে সাহায্য করিবার সম্পূর্ণ ভার পড়িল হৃদয়রামের উপরে।

রামকুমারের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। কালীমন্দিরের পূজার ভার কনিষ্ঠকে অর্পণ করিবার জন্য তিনি এখন অতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কালীপূজার জটিল ক্রিয়াকলাপ ও আসন মুদ্রা ইত্যাদি তিনি একে একে শ্রীরামকৃষ্ণকে শিক্ষা দিলেন। তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ না করিলে শক্তিপূজায় অধিকার জন্মে না। সুতরাং কালীপূজার আসনে বসিবার পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণকে দীক্ষাগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। কলিকাতার 'বৈঠকখানা' পল্লীতে

সেই সময়ে কেনারাম ভট্টাচার্য নামে একজন প্রবীণ তান্ত্রিক সাধক বাস করিতেন। রামকুমারের সহিত তাঁহার পূর্বাবধি পরিচয় ছিল এবং দক্ষিণেশ্বরেও তিনি মাঝে মাঝে আসিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহারই নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিলেন। শোনা যায়, ইষ্টমন্ত্র কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন।

৺কালীপূজার ভার শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রদান করিয়া রামকুমার এখন ৺রাধা-গোবিন্দজীর মন্দিরে সরিয়া গেলেন। উহাতে দৈনন্দিন পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইলেও তাঁহার স্বাস্থ্যের বিশেষ কিছু উন্নতি দেখা গেল না। সম্পূর্ণ বিশ্রামলাভ ও উপযুক্ত ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থার জন্য তিনি অবশেষে কামারপুকুরে যাওয়াই স্থির করিলেন। কিন্তু জন্মভূমির ক্রোড়ে ফিরিয়া যাওয়া রামকুমারের ভাগ্যে ছিল না। বাড়ী রওনা হইবার পূর্বে একটি প্রয়োজনীয় কাজ সারিয়া লইবার জন্য তিনি দক্ষিণেশ্বরের অদূরবর্তী শ্যামনগর-মূলাজোড় নামক স্থানে গমন করেন এবং তথায় নিতান্ত আকস্মিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন। জীবনের শেষ কয় বৎসর পরিবার-প্রতিপালনের জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। পত্নীবিয়োগের পর হইতেই জীবন তাঁহার নিকট নিরানন্দ ও ভারস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। অন্তিমকালে আত্মীয়স্বজনের মুখ-দর্শনে পর্যন্ত বঞ্চিত হইয়া যেভাবে রামকুমার ইহসংসার হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন, তাহা বস্তুতঃ মর্মান্তিক।

রামকুমারের মৃত্যুসংবাদে চন্দ্রাদেবীর গৃহে কিরূপ ক্রন্দনের রোল উঠিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণেও এই শোকাবহ ঘটনা দারুণ আঘাত হানিল। পিতৃবিয়োগের পর হইতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই তাঁহাকে পরম স্নেহে লালন-পালন করিয়া আসিতেছিলেন। পিতৃতুল্য অগ্রজের তিরোধানে শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারের অনিত্যতা যেন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিলেন। তাঁহার অন্তরের স্বাভাবিক বৈরাগ্যভাব আরও তীব্রতর হইয়া উঠিল। সব কিছু পরিত্যাগপূর্বক ঈশ্বরলাভের নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

সাধক-জীবন

১

আধ্যাত্মিক সাধনা মানুষের অন্তরের ব্যাপার ; বাহির হইতে উহার যথার্থ এবং সম্যক্ পরিচয়-লাভ অসম্ভব। কোন সাধারণ ব্যক্তি যখন সাধনভজনে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার আচরণ বুঝিতে পারাই অনেক সময়ে আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। আর যখন কোন লোকোত্তর পুরুষ মনোবুদ্ধির অধিকার ছাড়াইয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর প্রদেশে প্রবেশ করেন, তখন কাহার সাধ্য তাঁহার গতিবিধি নির্ণয় করে? কিন্তু তথাপি আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়তম শিষ্যবর্গ তাঁহার নিজমুখে শুনিয়া এবং অন্যান্য সূত্রে অবগত হইয়া এ বিষয়ে যেরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—তাহারই যৎকিঞ্চিৎ এখানে পুনরুল্লিখিত হইল।

আমরা দেখিয়াছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার সময়ে খুব প্রসন্নচিত্তে যান নাই। ঘটনাপরম্পরায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে যাইতে হইয়াছিল বটে, তথাপি মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে কিছুতেই কোন কার্যভার গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছাপ্রবাহে অচিরাৎ সেই সঙ্কল্প ভাসিয়া গেল এবং তাঁহাকে পূজকের আসনে বসিতে হইল। জীবিকার্জনের জন্য যে তিনি উহাতে সম্মত হইয়াছিলেন, একথা আমরা ভাবিতেই পারি না। চাল-কলা-বাঁধা বিদ্যাকে তিনি কিরূপ অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন, তাহার পরিচয় পূর্বেই পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার পক্ষে ৺শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজার ভারগ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মৃন্ময়ী প্রতিমাতে চিন্ময়ীর দর্শনলাভ। উহার প্রমাণ আমরা সূচনাতেই দেখিতে পাই। গৎবাঁধা প্রণালীতে দেবীর দৈনিক পূজা ও ভোগরাগাদি সম্পন্ন করিয়াই তিনি তৃপ্ত কিংবা নিরস্ত থাকিতেন না। তিনি যেন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে জগন্মাতা যদি সত্য হ'ন, তবে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিতে হইবে, তাঁহার কথা শুনিতে হইবে ; নতুবা এই বিরাট মন্দির, এই অনিন্দ্যসুন্দর প্রতিমা, এত জাঁকজমকের পূজারতি—সমস্তই বৃথা।

কোন বিষয়েই 'ম্যাদাটে' ভাব শ্রীরামকৃষ্ণ পছন্দ করিতেন না। যখন

যে বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেন, উহার শেষ সীমায় না পৌছান পর্যন্ত তাঁহার মনে সোয়াস্তি হইত না। তাই এখন শক্তিপূজায় নিয়োজিত হইয়া উহার মূলতত্ত্বে পৌছিবার জন্য তিনি একেবারে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন। পথ দেখাইবার কেহই ছিল না; সুতরাং নিজেই নিজের পথপ্রদর্শক হইলেন। প্রতিদিন বিধিমত দেবীর পূজা-সমাপনান্তে আকুলকণ্ঠে 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিতেন; রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি ভক্ত-সাধকদের রচিত গান তিনি তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে দেবীর সম্মুখে বসিয়া প্রাণ ঢালিয়া গাহিতেন, আর দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িত, বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যাইত। 'মা, দেখা দে। রামপ্রসাদকে যেমন দেখা দিয়েছিলি, তেমনি তোর এই অবোধ সন্তানকে দেখা দে'—এই ছিল তাঁহার আকুল মিনতি; সকাল হইতে সন্ধ্যা, যতক্ষণ ৺ভবতারিণীর সেবাপূজায় নিরত থাকিতেন, ততক্ষণ অবিরাম মাকে ডাকিতেন। গভীর নিশীথে আবার ঘরের বাহিরে নির্জনে বসিয়া মায়ের ধ্যান করিতেন।

দক্ষিণেশ্বরের বাগানবাটীর উত্তর দিকটা তখন ছিল ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সেই জঙ্গলের ভিতরে একটি আমলকী-গাছের তলায় বসিয়া তিনি ধ্যান করিতেন। একে ত বনজঙ্গল এবং সাপখোপের ভয়, তাহা ছাড়া ঐ জায়গাটি এক সময়ে ছিল কবরডাঙ্গা; অতএব দিনের বেলায়ও কেহ ওদিকে পা বাড়াইত না। নিশ্চিন্তমনে এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে ধ্যানধারণা করিবার পক্ষে স্থানটি ছিল খুবই উপযোগী। রাত্রিতে কালীবাড়ীর সমস্ত লোক যখন ঘুমঘোরে অচেতন, তখন চুপিচুপি বাহির হইয়া তিনি সেখানে চলিয়া যাইতেন। কিন্তু ভাগিনেয় হৃদয়ের নিকট এই ব্যাপার বেশীদিন গোপন রহিল না। রাত্রিতে সহসা ঘুম ভাঙ্গিলে হৃদয়রাম দেখিতে পাইতেন মামার বিছানা শূন্য। দুই-চারদিন ঐরূপ দেখিবার পর তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য তিনি একদা নিদ্রার ভান করিয়া বিছানায় শুইয়া রহিলেন। হৃদয়কে নিদ্রিত মনে করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন ঘরের বাহির হইয়াছেন, অমনি হৃদয়রামও উঠিয়া, একটু আড়ালে থাকিয়া তাঁহার পিছু পিছু যাইতে লাগিলেন—দেখিবেন মামা কোথায় যান, কি করেন। যখন দেখিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ হন্ হন্ করিয়া জঙ্গলের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িতেছেন, তখন হৃদয় আর অগ্রসর হইতে সাহস পাইলেন না। মামাকে ভয় দেখাইয়া

ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত তিনি ঢিল ছুঁড়িতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোনই ফল হইল না। পরে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে কহিলেন যে, বনের ভিতরে আমলকীতলায় বসিয়া তিনি সাধনভজন করেন। স্বচক্ষে ব্যাপারটা দেখিবার উদ্দেশ্যে হৃদয় অবশেষে একদিন সাহসে ভর করিয়া বনের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন। ঢুকিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার একেবারে চক্ষু স্থির! দেখিলেন—আমলকীতলায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পূর্ণ উলঙ্গভাবে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সমাসীন, দেহ নিশ্চল—উপবীত পর্যন্ত গলায় নাই, খুলিয়া কাছে রাখিয়া দিয়াছেন। কিছুক্ষণ হাঁক-ডাক করিবার পর শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান ভাঙ্গিল। তখন হৃদয় কহিলেন, "মামা, পাগলের মত নেংটা হয়ে বসে আছ যে!" শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন যে, এরূপভাবেই সম্পূর্ণ পাশমুক্ত হইয়া ধ্যান করিতে হয়। ঘৃণা, লজ্জা, কুল, শীল, ভয়, মান, জাতি, অভিমান—এই অষ্টপাশে মানব জন্মাবধি আবদ্ধ থাকে। এই সকল বন্ধন সম্পূর্ণ ছিন্ন করিতে না পারিলে মন ধ্যেয় বস্তুতে লীন হয় না। পৈতাগাছটি পর্যন্ত গলায় থাকিলে অভিমান জন্মে—আমি ব্রাহ্মণ, বর্ণশ্রেষ্ঠ। এই সমস্ত কথার মর্মগ্রহণের সামর্থ্য হৃদয়ের অবশ্যই ছিল না। হতভম্ব হইয়া তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

ঈশ্বরদর্শনের নিমিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাকুলতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে আহার-নিদ্রা পর্যন্ত ঘুচিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কিসে মায়ের দেখা পাইবেন—অনুক্ষণ শুধু এই এক চিন্তা। পরবর্তীকালে তিনি শিষ্যদিগকে বলিতেন—"তিন টান একত্র না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। বিষয়ীর বিষয়ের উপর, মায়ের সন্তানের উপর, আর সতীর পতির উপর টান—এই তিন টান একসঙ্গে যদি কারো হয়, তবেই সে-ব্যক্তি ঈশ্বরকে পায়।" তিন টান একত্র হওয়া কাহাকে বলে—তাহা নিজের সাধকজীবনে তিনি দেখাইয়াছিলেন।

দিবারাত্রি ব্যাকুলভাবে জগদম্বাকে ডাকিয়াও যখন তাঁহার দেখা পাইলেন না, তখন মনে দারুণ অভিমান জন্মিল। একদা কালীমন্দিরে বসিয়া গান গাহিতে গাহিতে মনে অসহ্য যন্ত্রণার উদয় হইল; ভাবিলেন যে এত ডাকিয়াও যখন মায়ের দেখা পাইলাম না, তখন এ জীবন রাখিয়া আর কাজ কি, ইহার শেষ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ঠিক সেই সময়ে সহসা দৃষ্টি পড়িল মন্দিরের কোণে

রক্ষিত পশুবলির খড়্গের উপর। উহা দ্বারাই জীবনের অবসান ঘটাইবেন ভাবিয়া অসিখানি ধরিতে গেলেন। কিন্তু ওদিকে মায়ের প্রাণও স্থির ছিল না; সন্তানের নিকট তিনি আবির্ভূতা হইলেন। ঠিক কি ভাবে তিনি সন্তানকে কৃপা করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের পক্ষে জানিবার কিংবা বুঝিবার উপায় নাই; ঘটনাস্থলে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন কিংবা ক্ষণকাল পরে আসিয়াছিলেন—তাঁহারাই কি বুঝিতে পারিয়াছিলেন? তাঁহারা শুধু ইহাই দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্ছাপন্নের ন্যায় ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িয়াছেন। তিন দিন পর্যন্ত তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় ছিলেন।

এই প্রথম দর্শনের বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন যে তাঁহার দৃষ্টিতে ঘরদ্বার, জগৎসংসার সমস্তই যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল—দশ দিকেই অনন্ত, অপার, চৈতন্যময় জ্যোতিঃ-সমুদ্র! উহার উত্তাল তরঙ্গমালা তাঁহাকে কোথায় যেন ভাসাইয়া লইয়া গেল। দিনরাত্রি যে কোথা দিয়া আসিল এবং গেল—কিছুই তিনি জানিতে পারিলেন না। যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, তখন তাঁহার কণ্ঠে কাতরস্বরে 'মা, মা' শব্দ উচ্চারিত হইয়াছিল। উহাতে অনুমিত হয় যে, জগৎ-কারণকে তিনি যে শুধু নিরাকাররূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা নহে, জ্যোতিঃ-সমুদ্রের মধ্যে জগদম্বার বরাভয়করা চিন্ময়ী মূর্তিও তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল।

বারেকমাত্র জগন্মাতার দেখা পাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের তৃপ্তি হইল না। একবার যখন দেখা পাইয়াছি, তখন তিনি ত সত্যসত্যই আছেন এবং সন্তানকে দেখা দিয়া থাকেন। তবে কেন অহর্নিশ তাঁহার দেখা পাইব না? যদি না পাই, তাহা আমারই ত্রুটির জন্য। এই প্রকার ভাবিয়া তিনি আরও ব্যাকুলভাবে মাকে ডাকিতে লাগিলেন এবং আরও কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার আহার-নিদ্রা দূরে গেল; বক্ষঃস্থল সর্বদা রক্তিম, চক্ষু দুইটি পলকহীন ও জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ। কোন কোন সময়ে সর্বাঙ্গে এরূপ জ্বালা বোধ করিতেন যে, গঙ্গাতে গলাজলে ডুবিয়া থাকিলেও সেই জ্বালার উপশম হইত না। নানাপ্রকার কবিরাজী তেল ব্যবহার করিয়াও কোন উপকার দর্শিল না। ক্রমে এই গাত্রজ্বালা একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল। একদা পঞ্চবটীতে বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন যেন শরীরের ভিতর হইতে এক ঘোর কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ নির্গত হইয়া গেল এবং

তাঁহার সাক্ষাতেই ত্রিশূলধারী জনৈক শিবানুচরের হস্তে নিহত হইল। আশ্চর্যের বিষয়, গাত্রদাহও তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। এই ঘটনাকে 'পাপ-পুরুষ-নিধন' বলিয়া তিনি শিষ্যদের নিকট বর্ণনা করিতেন।

যতই শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার ঘন ঘন দর্শন পাইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার বাহ্য আচরণে অধিকতর পরিবর্তন দেখা দিল। অবশেষে এমন হইয়া গেল যে, পূজায় বসিয়াও তিনি বিধিবিধান মানিয়া চলিতে পারেন না। অবোধ শিশু যেমন নিঃসঙ্কোচে আপন মায়ের সঙ্গে খেলা করে, মন্দিরে পূজার আসনে বসিয়া তিনি মা-কালীর সহিত তেমনি আচরণ করিতে লাগিলেন। বৈধী-ভক্তির সীমা ছাড়াইয়া তিনি এখন রাগাত্মিকা অথবা প্রেমাভক্তির রাজ্যে পৌঁছিয়াছেন, উপাস্যের নিকট আর কোন সঙ্কোচবোধ নাই—পূজার ফুল হাতে লইয়া নিজের মস্তকে ধারণ করিতেছেন, সর্বাঙ্গে স্পর্শ করাইতেছেন, পরে সেই ফুলই হয় ত দেবতাকে নিবেদন করিলেন। মন্ত্রতন্ত্রের কোন বালাই নাই; যখন খেয়াল হইতেছে, মা-কালীর সহিত আপন মনে বিড় বিড় করিয়া কথা কহিতেছেন। নিবেদিত অন্নাদি কখনও দেবীর মুখে তুলিয়া দিতেছেন, কখনও হয় ত বা নিজের মুখেই পুরিতেছেন। পূজার মন্দির কখনও কলহাস্যে, কখনও বিলাপে, কখনও সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠিতেছে।

এই সকল পাগলামি-কাণ্ড হইতে মামাকে বিরত রাখিতে হৃদয় অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সকলই বৃথা হইল। রাণীমা কিংবা মথুরবাবু কি মনে করিবেন, অপরে কি মনে করিবে—সেদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ ছিল না, চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে এ বিষয়ে সজাগ করা যাইত না। কালী-বাড়ীর খাজাঞ্চী দেখিলেন যে, এ ব্যক্তি ঘোর উন্মাদ; ইঁহাকে পূজার কাজে আর কিছুতেই বহাল রাখা চলে না। অতএব তিনি মথুরবাবুকে সংবাদ দিলেন। সকলেই ভাবিল যে মথুরবাবু আসিয়া এই সকল কাণ্ড দেখিলে সেই মুহূর্তে ভট্টাচার্যের চাকুরী যাইবে। পূর্বে কাহাকেও না জানাইয়া মথুরানাথ অকস্মাৎ একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন কালীমন্দিরে পূজা করিতেছিলেন। মথুরবাবু বাহিরে দাঁড়াইয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে সমস্ত ব্যাপার অবলোকনপূর্বক বাটীতে ফিরিয়া গেলেন। খাজাঞ্চী ভাবিলেন, ভট্টাচার্যের বরখাস্তের হুকুম আসিয়া পৌঁছিল বলিয়া। কিন্তু কার্যতঃ হইল তাহার বিপরীত। সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া মথুরানাথের দৃঢ় প্রত্যয়

জন্মিয়াছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ পাগল নহেন—'ভাবের পাগল', মায়ের কৃপালাভের ফলেই তাঁহার এই পাগলামি দেখা দিয়াছে। ইহা তিনি নিজেদের পক্ষেও পরম সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করিলেন। কারণ, এহেন ভক্তের পূজায় ৺শ্রীশ্রীভবতারিণী জাগ্রতা না হইয়া কদাচ থাকিতে পারেন না। বাটী ফিরিয়া তিনি সমস্ত বিষয় রাণী রাসমণির গোচর করিলেন। পরম উৎসাহভরে তিনি রাণীমাকে কহিলেন যে, বহু ভাগ্যের গুণে এমন-অদ্ভুত পূজক পাওয়া গিয়াছে; দক্ষিণেশ্বরে দেবী এবারে নিশ্চয় জাগ্রতা হইয়া উঠিবেন। রাণীরও বিশ্বাস জন্মিল যে স্বপ্নবৃত্তান্ত এবারে সফল হইতে চলিয়াছে, মা-কালী স্বয়ং কৃপা করিয়া এমন পূজক জুটাইয়াছেন। রাণীর অনুমতিক্রমে মথুরবাবু খাজাঞ্চীকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার নিজের যেমন অভিরুচি, তেমনিভাবে মায়ের পূজা করিতে থাকুন, তাঁহাকে যেন কোনপ্রকার বাধা দেওয়া না হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি রাণী রাসমণি ও মথুরানাথের অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দক্ষিণেশ্বরে আসিলে এই পাগল ঠাকুরটির সঙ্গে কিছুক্ষণ না কাটাইয়া তাঁহারা যাইতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের উপরে তাঁহাদের কিরূপ অপরিসীম শ্রদ্ধা-বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

একদা রাণী রাসমণি কালীমন্দিরে বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে গান গাহিতে অনুরোধ করেন। ভাবাবিষ্ট অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃসঙ্গীত গাহিতেছেন, সঙ্গীতের মধুর ঝঙ্কারে মন্দিরের অভ্যন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—এমন সময়ে তিনি সহসা গান থামাইয়া রাণীর গাত্রে করতল দ্বারা আঘাত করিয়া ভৎর্সনার সুরে বলিয়া উঠিলেন, "এখানেও ঐ চিন্তা!" রাণীর মন বস্তুতঃই বিষয়ান্তরে চলিয়া গিয়াছিল—তিনি একটি মকদ্দমার কথা ভাবিতেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভৎর্সনা-বাক্যে তাঁহার চৈতন্য হইল। নিজের মনের চঞ্চলতার জন্য একদিকে যেমন তিনি লজ্জিতা ও অনুতপ্তা হইলেন, অপর দিকে তেমনি এই তরুণ যুবকের অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় রাণীর অন্তঃকরণ আরও নুইয়া পড়িল। অনুচরেরা ভাবিল যে, পূজারী ঠাকুরের আস্পর্ধা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে; নতুবা রাণীমাকে এমন অপমান করিতে পারে? তাহারা ক্রোধে একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিল। নিরপরাধ ঠাকুরের প্রতি হীনবুদ্ধি লোকদিগের অত্যাচার হইতে পারে বুঝিয়া

রাণী 'ভট্টাচার্য মহাশয়ের কোন দোষ নেই; তোমরা ওঁকে কোন কিছু বোলো না' বলিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ যাহা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবাবিষ্ট অবস্থায় সম্পূর্ণ যন্ত্রচালিতের ন্যায় করিয়াছিলেন, স্বাভাবিক অবস্থায় কখনই ঐরূপ করিতে পারিতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং রাণী রাসমণির চরিত্র-অনুধাবনে এই ঘটনার তাৎপর্য অনেকখানি। উহাতে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে মা-কালীর হাতের যন্ত্র বৈ আর কিছুই মনে করিতেন না। বিন্দুমাত্র অহংজ্ঞান থাকিলে তাঁহার পক্ষে রাণীর গায়ে হাত তোলা দূরের কথা, তাঁহার প্রতি ভর্ৎসনাবাক্য-প্রয়োগ করাও সম্ভবপর হইত না। রাণী রাসমণির ভক্তিশ্রদ্ধা যে কত গভীর এবং আত্মসংযম যে কত দৃঢ় ছিল, তাহারও পরিচয় এই ঘটনাটিতে পাওয়া যায়। তিরস্কারের যথার্থ কারণ রহিয়াছে বুঝিতে পারিয়া তিনি ভৃত্যদের সম্মুখেও এই শাসন মাথা পাতিয়া লইয়াছিলেন, অণুমাত্র বিচলিত হন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমাভক্তির বেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া একেবারে উদ্দাম হইয়া উঠিল। দিবানিশি তিনি ভাবাবিষ্ট অবস্থায় থাকেন, বাহ্য বিষয়ের প্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। যে ভূমিতে আরোহণ করিলে বিধি-বিধান, আচার-অনুষ্ঠান এবং সকল প্রকার কর্মবন্ধন আপনা হইতেই খসিয়া পড়ে, সেই অবস্থায় তিনি পৌঁছিয়াছিলেন। অন্য কাজ ত দূরের কথা, নিজের শরীরযাত্রার এবং নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার সম্পাদন করাও তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নিজের এই অবস্থা উপলব্ধি করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই মথুরবাবুকে তিনি কহিলেন যে, কালীমন্দিরের বাঁধাধরা কাজ আর তাঁহার দ্বারা কুলাইবে না, তাঁহাকে রেহাই দেওয়া হউক। মথুরবাবু তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণেরই পরামর্শ অনুযায়ী হৃদয়রামের উপর ৺শ্রীশ্রীভবতারিণীর নিত্যপূজার ভার দিলেন। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ এবার মন্দিরের পূজাদি সম্পর্কে দায়মুক্ত হইয়া নিশ্চিন্তমনে সাধনমার্গে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

যতদূর জানা যায়, মা-কালীর দর্শনলাভের অল্পকাল পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার কুলদেবতা ৺শ্রীশ্রীরঘুবীরের সাক্ষাৎলাভের নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠেন। উক্ত উদ্দেশ্য-পূরণের নিমিত্ত ভক্তপ্রবর মহাবীরের অনুকরণে দাস্যভক্তিকেই

তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের সেবক এবং দাসানুদাস—এতদ্ব্যতীত অপর কোন চিন্তা অথবা ভাব তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। একাগ্রতা এবং কঠোর সাধনার বলে অচিরকালমধ্যেই তিনি রঘুপতি রামচন্দ্র এবং রামময়জীবিতা জনকনন্দিনীর প্রত্যক্ষ দর্শনলাভে কৃতার্থ হ'ন। *

ভক্তিশাস্ত্রে পাঁচপ্রকার সাধনপ্রণালীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। উহাদের মধ্যে যে-কোন একটিতে সিদ্ধিলাভ করিলেই মানবজীবন ধন্য হইয়া যায়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ মাত্র একটিতে তুষ্ট না থাকিয়া পর পর সমস্ত প্রণালীর সাধনা অভ্যাসপূর্বক তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, যদিও এতৎসম্পর্কে বিশদ কোন বিবরণ পাইবার উপায় নাই। সাধনা অন্তরের জিনিস। শ্রীরামকৃষ্ণ কখন কোন্ ভাবে নিমগ্ন থাকিতেন—উহা তাঁহার নিত্যসঙ্গী হৃদয়রামের পক্ষেও জানা কিংবা বুঝা সম্ভবপর ছিল না। পরবর্তীকালে তিনি স্বয়ং শিষ্যদের নিকট নিজের সাধক-জীবন সম্পর্কে সময় সময় যাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং সেই সকল কথা যেভাবে লিপিবদ্ধ আছে—উহাই আমাদের নিকট একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপাদান, তথ্যসংগ্রহের অপর কোন সূত্র নাই। শান্ত এবং সখ্যভাবের সাধনা তিনি করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে ; কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে এবং কি প্রণালীতে করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ কোথাও দৃষ্ট হয় না। বাৎসল্য এবং মধুরভাবের সাধনার সম্পর্কে কথঞ্চিৎ জানিতে পারা যায়। যথাস্থানে উহার উল্লেখ করা হইবে।

আধ্যাত্মিক জীবনের যাবতীয় তত্ত্ব নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিবেন, ঈশ্বরলাভ সম্পর্কে বিভিন্ন সাধনপ্রণালীর কার্যকারিতা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন—এই এক প্রবল ঝোঁক শ্রীরামকৃষ্ণকে যেন পাইয়া বসিয়াছিল। এই বিষয়ে তাঁহার মনোভাব এবং কার্যপ্রণালীকে আমরা 'বৈজ্ঞানিক' আখ্যা

* শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের নিকট দাস্যভক্তির খুব প্রশংসা করিতেন। "জ্ঞানবিচার পুরুষমানুষ, বাড়ীর বারবাড়ী পর্যন্ত যায়। ভক্তি মেয়েমানুষ, অন্তঃপুর পর্যন্ত যায়। একটা কোনরকম ভাব আশ্রয় করতে হয়, তবে ঈশ্বরলাভ হয়। সনকাদি ঋষিরা শান্তরস নিয়ে ছিলেন। হনুমান দাসভাব নিয়ে ছিলেন। শ্রীদাম-সুদাম ব্রজের রাখালদের সখ্যভাব। যশোদার বাৎসল্যভাব— ঈশ্বরেতে সন্তানবুদ্ধি। শ্রীমতীর মধুরভাব। "হে ঈশ্বর! তুমি প্রভু, আমি দাস—এ ভাবটির নাম দাসভাব। সাধকের পক্ষে এ ভাবটি খুব ভাল।"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

দিতে পারি। জড়বিজ্ঞানের তত্ত্বানুসন্ধায়ী ব্যক্তি যেমন জ্ঞাতব্য বিষয় অথবা বস্তুকে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার ও পরীক্ষা করেন, বিভিন্ন বিচারে ও পরীক্ষায় লব্ধ ফলগুলিকে পূর্বগামীদের বর্ণনার সহিত মিলাইয়া দেখেন এবং সকল প্রকার সন্দেহের নিরসন ও সকল প্রশ্নের সমাধান করিয়া অবশেষে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন, আধ্যাত্মিক সত্যের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিক সেই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। ধর্মের ব্যাপারে কোনরূপ হেঁয়ালি তিনি পছন্দ করিতেন না এবং কোনরূপ বুজরুকির প্রশ্রয় দিতেন না। পরবর্তী জীবনে ধর্মোপদেষ্টারূপেও এই নীতি তিনি অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। প্রত্যেকটি বিষয় নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য তিনি শিষ্যবর্গকে সর্বদাই পরামর্শ এবং উৎসাহ দিতেন। তাঁহার সাধনার মূলমন্ত্র ছিল তীব্র ব্যাকুলতা এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠা। যখন যে পদ্ধতি অনুসরণ করিতেন, তখন পরম যত্ন ও নিষ্ঠার সহিত উহার সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া চলিতেন। তিনি সর্বদাই বলিতেন যে, ঈশ্বরকে পাইতে হইলে মন-মুখ এক করা চাই—তিন টান একত্র হওয়া চাই।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, ঐ সময়ে বহু সাধুসন্ন্যাসী দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া অতিথি হইতেন। সকল সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরাই আসিতেন এবং তাঁহাদের অনেকের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের আলাপ-পরিচয় হইত। আগন্তুকদের মধ্যে হঠযোগী সাধুরাও অবশ্যই থাকিতেন। যতদূর জানা যায়, ঐরূপ কোনও যোগীর নিকট হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ হঠযোগ শিক্ষা করিয়াছিলেন। *

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রথমাবস্থায় একটি আমলকীবৃক্ষের নীচে বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ধ্যানজপ ইত্যাদি করিতেন। বাগানবাটীর কিছু পরিবর্তন উপলক্ষে বৃক্ষটি বিনষ্ট হইয়া যায়। উপযুক্ত স্থানের অভাবে তাঁহার তপস্যার বড়ই অসুবিধা উপস্থিত হয়। সেই অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত ভাগিনেয় হৃদয়ের সাহায্যে তিনি নিজের হাতে পঞ্চবটী রচনা করেন। একটি প্রাচীন

* স্বয়ং অভ্যাস করিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ হঠযোগের পক্ষপাতী ছিলেন না। "হঠযোগে শরীরের উপর বেশী মনোযোগ দিতে হয়। × × × হঠযোগ বেদান্তবাদীরা মানে না। হঠযোগ আর রাজযোগ। রাজযোগে মনের দ্বারা যোগ হয়—ভক্তির দ্বারা, বিচারের দ্বারা যোগ হয়। ঐ যোগই ভাল, হঠযোগ ভাল নয়; কলিতে অন্নগত প্রাণ।"—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

বটবৃক্ষের পার্শ্বে উহা রচিত হইয়াছিল। চারিদিকে তুলসী ও অপরাজিতার বেষ্টনী দিয়া তিনি উহাকে নিভৃত সাধনার উপযোগী একটি পবিত্র ও সুরম্য স্থানে পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনেতিহাসের সহিত এই পঞ্চবটী অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে।

দক্ষিণেশ্বরে সাধকজীবনের সূত্রপাত হইতে প্রায় চারি বৎসরকাল (১৮৫৫-৫৯) শ্রীরামকৃষ্ণ এই সকল নানাভাবের সাধনায় যাপন করিয়াছিলেন। তপস্যার বেগ ও কঠোরতার ফলে ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহার শরীরের উপর যে অত্যাচার ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। মাঝে মাঝে বায়ুর প্রকোপ এমন বৃদ্ধি পাইত যে, সাধারণ লোক তাঁহাকে পাগল বলিয়াই মনে করিত।

রাণী রাসমণি এবং মথুরবাবুর যদিও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ দৈবশক্তিসম্পন্ন পুরুষ এবং জগন্মাতার বিশেষ কৃপাপাত্র, তথাপি তাঁহার নানা বিপরীত আচরণ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের মনেও আশঙ্কা জন্মিয়াছিল যে, অত্যুগ্র তপস্যা শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরে সম্ভবতঃ সহ্য হয় নাই এবং তাহার ফলে ভাবের পাগলামির সহিত সত্যিকার পাগলামিও অল্পবিস্তর যুক্ত হইয়াছে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া মথুরবাবু তখনকার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসার ব্যবস্থা করাইলেন। কিন্তু চিকিৎসায় কোনই ফল দেখা গেল না। শারীরিক ব্যাধি হইলে ত চিকিৎসায় ফল দিবে?

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধকজীবনের সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে সংসৃষ্ট, এমন আর এক ব্যক্তির যৎসামান্য পরিচয় দিয়াই এই অধ্যায় শেষ করা হইবে। হলধারী (ওরফে রামতারক) ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের খুড়তুতো ভাই; বয়সে কিঞ্চিৎ বড়। কাজকর্মের অন্বেষণে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিলে পর শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মীয় জানিয়া মথুরবাবু সাগ্রহে তাঁহাকে মন্দিরে পূজকের কর্মে নিযুক্ত করেন। নিয়মিত পূজার্চনার দায় হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ ইতঃপূর্বেই অবসর লইয়াছিলেন। সুতরাং হৃদয়ের পক্ষে একাকী সকল দিক সামলানো কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে হলধারী আসাতে মথুরবাবু তাঁহাকে কালী-মন্দিরে পূজার ভার দিলেন। যতদূর জানা যায়, ১৮৫৮ হইতে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আট বৎসর কাল তিনি দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীরামকৃষ্ণের সাধকজীবনের বহু ঘটনাই তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত

হইয়াছিল। হলধারী শাস্ত্রজ্ঞ এবং সদাচারী ছিলেন। নিজে বৈষ্ণবমতাবলম্বী হইলেও শক্তিপূজার প্রতি তাঁহার কোনরূপ বিদ্বেষভাব ছিল না। কালী-মন্দিরের পূজারতি প্রভৃতি তিনি যথানিয়মে এবং শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। শুধু একটি বিষয়ে গোলযোগের সৃষ্টি হইল। পশুবলির ব্যাপারে তাঁহার মন কিছুতেই সায় দিত না। যেদিন মা-কালীর নিকট পশুবলি দেওয়া হইত, সেদিন তিনি মনে বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতেন। অবশেষে একদা তাঁহার উপর মায়ের প্রত্যাদেশ হইল শক্তিপূজা পরিত্যাগ করিবার জন্য। তদনুযায়ী তিনি হৃদয়রামের উপর ৺শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজার ভার দিয়া নিজে ৺শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর ঘরে চলিয়া যান।

শাস্ত্রচর্চায় হলধারীর খুব আগ্রহ ছিল। শ্রীমদ্ভাগবত, অধ্যাত্ম-রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি নিয়মিতভাবে পাঠ করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার নিকট বিবিধ শাস্ত্রকথা শুনিয়া নিজের অভিজ্ঞতার সহিত সেগুলি মিলাইয়া দেখিতেন। ভগবৎপ্রেমে আত্মহারা এবং শিশুর ন্যায় সরল শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়া হলধারীরও মাঝে মাঝে মনে হইত যেন শাস্ত্রে বর্ণিত ব্রহ্মজ্ঞানী অথবা মহাপুরুষের সমুদয় লক্ষণ তিনি এই অদ্ভুত যুবকের মধ্যে দেখিতে পাইতেছেন। অতএব শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্পর্কে এক-একবার তাঁহার মনে খুবই উচ্চ ধারণা জন্মিত; কিন্তু পরক্ষণেই তাহা আবার দূর হইয়া যাইত। যেহেতু শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে কখনও শাস্ত্রাদি স্পর্শ করিয়াও দেখেন নাই, অতএব হলধারীর কিছুতেই বিশ্বাস জন্মিত না. যে এহেন অজ্ঞ ব্যক্তি কখনও ঈশ্বরীয় তত্ত্বের অধিকারী হইতে পারে। হলধারীকর্তৃক শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সহসা বলিয়া উঠিতেন—"তুমি শাস্ত্রে যা' যা' পড়ছ, সেই সব অবস্থা এখানকার হয়েছে; আমি ওসব কথা বেশ বুঝতে পারি।" অমনি হলধারী বিদ্যার অভিমানে ফুলিয়া উঠিয়া জবাব দিতেন—"হাঁ, তুই গণ্ডমূর্খ, তুই আবার এসব কথা বুঝবি!"

হলধারী মুখে বেদবেদান্তের বুলি আওড়াইলেও গোপনে সহজিয়া মতের উপাসক ছিলেন। তজ্জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে তাঁহাকে কিছু ব্যঙ্গ করিতেন। হলধারীও ছাড়িতেন না। তিনি কখনও কালীমূর্তিকে তামসিক বলিয়া ঠাট্টা করিতেন, কখনও বা শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতি ও ভাবসমাধি, সব কিছু মিথ্যা বিভ্রম বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। ক্ষণেকের তরে শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়ও সন্দেহ-মেঘে

আচ্ছন্ন হইত। অভিমানাহত ক্ষুব্ধচিত্ত বালকের ন্যায় ভবতারিণীর নিকটে ধন্না দিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন—"মা, একি সত্যি তাই? এতদিন যা' দেখালি, সবই কি ভোজবাজি?" জগজ্জননী অমনি তাঁহার সন্তানকে দেখা দিয়া সকল সংশয় মুহূর্তে দূর করিয়া দিতেন। তখন আর শ্রীরামকৃষ্ণকে থামায় কে? মায়ের আদুরে দুলালের ন্যায় আনন্দে নাচিতে নাচিতে হলধারীর নিকট ফিরিয়া গিয়া তাঁহাকে ধমকাইয়া বলিতেন—"তুই মা'কে তামসী বলিস্? মা কি তামসী? মা যে সব কিছু—ত্রিগুণময়ী আবার শুদ্ধসত্ত্বগুণময়ী।"

হলধারী নিজেকে বেদান্তবাদী বলিয়া মুখে খুব প্রচার করিতেন, কিন্তু আসলে তাঁহার মন ছিল সংসারে আবদ্ধ। অপরপক্ষে দর্শনশাস্ত্রের পাতা কখনো না উল্টাইলেও শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন যথার্থ এবং পুরাপুরি বৈদান্তিক। 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; বিশ্বচরাচরে সব কিছুই ব্রহ্মাত্মক'—বেদান্তের এই সার সত্য ছিল তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষীভূত এবং অনুভবসিদ্ধ। মন হইতে সর্বপ্রকার ভেদভাব নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিবার জন্য অতি দুশ্চর কৃচ্ছ্র সাধন তিনি করিয়াছিলেন। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিলে এই বিষয়ের এবং হলধারীর সহিত তাঁহার পার্থক্যের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। মন্দিরের আশেপাশে যে সমস্ত ভিখারী ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহাদের মধ্যেও ভগবানের আবির্ভাব কল্পনা করিয়া সাধনার অঙ্গ হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণ একদা তাহাদের এঁটো পাতা হইতে প্রসাদ কুড়াইয়া খাইতেছিলেন। উহা দেখিতে পাইয়া হলধারী তিরস্কারের সুরে কহিলেন—"তোর ছেলেমেয়ের কি করে বিয়ে হয় দেখব!" শ্রীরামকৃষ্ণ উহাতে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "তবে রে শালা, শাস্ত্রব্যাখ্যা করবার সময়ে তুই না বলিস্ জগৎ মিথ্যা, আবার সর্বভূতে সমদৃষ্টি করতে বলিস্! তুই বুঝি ভাবিস্ আমি তোর মত জগৎ মিথ্যা বলব—আবার তোর ভেদজ্ঞান করব, ছেলেমেয়ের বাপ হ'ব। ধিক্ তোর শাস্ত্রজ্ঞানে!" *

* "এখানকার ভাব কি জান? বই, শাস্ত্র এসব কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার পথ বলে দেয়। পথ উপায় জেনে লবার পর, আর বই শাস্ত্রে কি দরকার? তখন নিজে কাজ করতে হয়। ... শুধু পাণ্ডিত্যে কি হ'বে? অনেক শ্লোক, অনেক শাস্ত্র পণ্ডিতের জানা থাকতে পারে; কিন্তু যার সংসারে আসক্তি আছে, যার কামিনীকাঞ্চনে মনে মনে ভালবাসা আছে, তার শাস্ত্রধারণা হয় নাই—মিছে পড়া। পাঁজীতে লিখেছে বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজী টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না: এক ফোঁটাই পড়—কিন্তু এক ফোঁটাও পড়ে না।" —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

হলধারী ও শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন পরস্পরের ঠিক বিপরীত। একজন ছিলেন পণ্ডিত হইয়াও মূর্খ, আর একজন অপণ্ডিত হইয়াও জ্ঞানী। কিন্তু হলধারীর সংসর্গ যে শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে নিরর্থক হইয়াছিল, তাহা নহে। হলধারীর নিকট তিনি যে-সকল শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়াছিলেন, সেগুলি তাঁহাকে নিজের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল। অধিকন্তু, পরবর্তীকালে যখন তিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগকে উপদেশদানে প্রবৃত্ত হন, তখন সেই সমস্ত শাস্ত্রকথা এবং শাস্ত্রীয় উপমা প্রভৃতি তাঁহার খুবই কাজে লাগিয়াছিল।

হলধারী-সম্পর্কিত অপর একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক নানারূপ দিব্যদর্শনের বিষয়ে অনাস্থা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া হলধারী একদা কহিলেন যে, ঈশ্বর যখন বাক্য-মনের অতীত বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তখন তিনি কিরূপে চক্ষুগোচর হইতে পারেন? শাস্ত্র যদি সত্য হয়, তবে এই সকল দর্শন নিশ্চয়ই স্বপ্নবৎ অলীক—শুধ্ কল্পনাপ্রসূত। এই কথা শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের মনে বড়ই সন্দেহ উপস্থিত হইল। পরবর্তীকালে শ্রীমৎ প্রেমানন্দ স্বামীর নিকট ব্যাপারটি তিনি এভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন—"ভাবলাম তবে তো ভাবাবেশে যত কিছু ঈশ্বরীয় রূপ দেখেছি, কিংবা আদেশ পেয়েছি, সে সমস্তই ভুল। মা তো তবে আমায় ফাঁকি দিয়েছে! মন বড়ই ব্যাকুল হ'ল এবং অভিমানে কাঁদতে কাঁদতে মা'কে বলতে লাগলাম—'মা, নিরক্ষর মুখ্‌খু বলে আমাকে কি এমনি করে ফাঁকি দিতে হয়?' সে কান্নার তোড় আর থামে না। কুঠিঘরে বসে কাঁদছিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি কি, সহসা মেঝে হতে কুয়াশার মত ধোঁয়া উঠে সামনের কতকটা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল। তারপর দেখি, তার ভিতরে বুক পর্যন্ত দাড়িতে ঢাকা একখানি গৌরবর্ণ জীবন্ত মুখ! ঐ মূর্তি আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে গম্ভীরস্বরে বলে উঠলেন —'ওরে, তুই ভাবমুখে থাক্, ভাবমুখে থাক্, ভাবমুখে থাক্।' তিনবার মাত্র ঐ কথাগুলি বলেই মূর্তি ধীরে ধীরে আবার কুয়াশায় মিলিয়ে গেল এবং কুয়াশার মত ধূমও কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল। ঐরূপ দেখে সে'বার শান্ত হ'লাম।"*

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

অপর একদিন ঐ একই প্রকার সন্দেহ তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। সেইদিনও সন্দেহের কারণ ছিল হলধারীর কূট তর্কজাল। পূজা করিতে বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ের নিকট ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিলেন—"মা, আমার সকল সংশয় দূর করে দিয়ে, যা' আসলে সত্য, তাই আমাকে জানিয়ে দাও।" মা সেই সময়ে 'রতির মা' নাম্নী জনৈকা স্ত্রীলোকের বেশে ঘটের পার্শ্বে আবির্ভূতা হইয়া সেই একই কথা বলিয়াছিলেন—"তুই ভাবমুখে থাক্।" কিয়ৎকাল পরে নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা লাভ করিবার পর এই বাক্যটি তিনি তৃতীয়বার শুনিতে পাইয়াছিলেন। উহার মর্মার্থ পরে ব্যাখ্যা করা হইবে।

বিবাহ ও পরবর্তী দুই বৎসর

মহাপুরুষের জননী হওয়াতে যেমন অসীম গৌরব, তেমনি আবার অপরিসীম দুঃখভোগেরও সম্ভাবনা। শচীমাতার মর্মান্তিক হৃদয়বেদনার কাহিনী বাংলার ঘরে ঘরে সুবিদিত। চন্দ্রাদেবীর ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। একে ত জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যুতে তিনি শোকে মুহ্যমান হইয়াই ছিলেন, এখন আবার শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্তর ও নানাবিধ অদ্ভুত আচরণের কথা কানে পৌছিয়া তাঁহার চিত্ত ব্যথিত ও ব্যাকুল করিয়া তুলিল। শুনিতে পাইলেন, 'গদাই' মানুষের সঙ্গ ছাড়িয়া নির্জনে থাকিতেই অধিক ভালবাসেন। উহাতে তাঁহার এবং রামেশ্বরের মনে আশঙ্কা জন্মিল যে, তিনি সম্ভবতঃ উন্মাদরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। এরূপ অনুমানের যথেষ্ট কারণও বিদ্যমান ছিল; কেননা শৈশবে ও বালককালে তিনি বহুবার মূর্ছা গিয়াছিলেন। বাড়ী আসিবার জন্য চন্দ্রাদেবী পুত্রকে বারংবার সংবাদ পাঠাইতে লাগিলেন। তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস, নিজের স্নেহযত্নে এবং কামারপুকুরের স্নিগ্ধ জলবায়ুর গুণে তাঁহার অসুখ সহজেই সারিয়া যাইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই আহ্বানে সাড়া দিয়া জননী এবং জন্মভূমির স্নেহময় অঙ্কে ফিরিয়া গেলেন। তখন ১২৬৫ বঙ্গাব্দের (১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের) আশ্বিন অথবা কার্তিক মাস।

কামারপুকুরের সর্বজন-পরিচিত এবং আবালবৃদ্ধবনিতার প্রিয়পাত্র, সদানন্দময় সেই গদাধর আর নাই। তাঁহার মুখে সদা বিষণ্ন ভাব—কি যেন এক অমূল্য বস্তু হারাইয়া অনুক্ষণ তাহাই খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। সর্বদা একাকী থাকেন, কাহারও সহিত মেলামেশা করেন না, কথাবার্তা বেশী বলেন না। মানিকরাজার আম্রকানন, শৈশবের ক্রীড়াসঙ্গিগণ—কেহই আর তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না। পুত্রকে ভূতে পাইয়াছে ভাবিয়া চন্দ্রাদেবী রোজা আনাইয়া কত মন্ত্র পড়াইলেন—ঝাড়ফুঁক, তুকতাক করাইলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

কামারপুকুরের দুই প্রান্তের দুইটি শ্মশানের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সংসারের অনিত্যতা স্মরণ করাইয়া দেয় এবং স্বভাবতঃ নির্জন বলিয়া তান্ত্রিক সাধকদের নিকট শ্মশান বড়ই প্রিয় ও পবিত্র স্থান। শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রায়ই 'ভূতির খাল' নামক শ্মশানে গিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসিয়া থাকিতেন। শুধু যে দিনের বেলায় যাইতেন তাহা নহে, রাত্রিতেও যাইতেন। সেখানে গিয়া তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন জন্মাইতে কিংবা তাঁহাকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিতে রামেশ্বর পর্যন্ত অনেক সময়ে সাহস পাইতেন না। এইভাবে কয়েক মাস কাটিবার পর শ্রীরামকৃষ্ণের মানসিক স্থৈর্য অনেকটা ফিরিয়া আসিল এবং চালচলনও প্রায় স্বাভাবিক হইল। শ্মশানে গিয়া নির্জনে তপস্যা একেবারে যে ছাড়িয়া দিলেন তাহা নয়; মাঝে মাঝে সেখানে যাইতেন, কিন্তু আগেকার মত সর্বদা বিমর্ষ কিংবা অন্যমনস্ক থাকিতেন না, লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেন ও মেলামেশা করিতেন। খুব সম্ভবতঃ ইষ্টদেবতার পুনঃ পুনঃ দর্শনলাভ করাতেই ঐরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। কারণ যাহাই হউক না কেন, এই পরিবর্তনের ফলে আত্মীয়স্বজন সকলেই খুব আশ্বস্ত বোধ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স এখন প্রায় তেইশ বৎসর। মতিগতির একটু পরিবর্তন দেখিয়া চন্দ্রাদেবী এবং রামেশ্বর ভাবিলেন, এবার অবিলম্বে তাঁহার বিবাহ-কার্য সম্পন্ন করা নিতান্ত প্রয়োজন। সাধারণতঃ লোকে যেমন ভাবে, তেমনি তাঁহারাও মনে করিলেন যে, সংসারের দায় ঘাড়ে চাপিলে শ্রীরামকৃষ্ণের উদাসীন ভাব আপনা হইতেই দূরীভূত হইয়া যাইবে। বিবাহের কথা ক্রমশঃ শ্রীরামকৃষ্ণের কানে পৌঁছিল। আশ্চর্যের বিষয়, তিনি উহাতে কিছু-মাত্র বিরক্তি কিংবা অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন না। বরঞ্চ গৃহে আসন্ন উৎসবের প্রতীক্ষায় বালকবালিকারা যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তিনিও তেমনি আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহার রহস্য কে ভেদ করিবে? তিনি কি জগদম্বার আদেশ পাইয়াছিলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মতি ও ইচ্ছা আছে জানিয়া চন্দ্রাদেবী এবং রামেশ্বর পরম উৎসাহভরে বিবাহের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। বেশী টাকা পণ দিয়া পছন্দমত বধূ ঘরে আনিবার সামর্থ্য তাঁহাদের ছিল না। সেজন্য বড়ই মুশকিলে পড়িলেন; পাত্রী মনোমত হয় ত পণের মাত্রা অত্যধিক; যেখানে পণ কম, সেখানে আবার পাত্রী অপছন্দ। রামেশ্বর খুঁজিয়া খুঁজিয়া হতাশ হইয়া গেলেন; সকল দিক বজায় রাখিয়া মনোমত পাত্রী কিছুতেই পাওয়া যায় না। এই সংকটে পড়িয়া চন্দ্রাদেবী ও রামেশ্বর যখন ভয়ানক দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন ভাবাবেশে বলিলেন—"বৃথা এখানে-ওখানে

খুঁজে ত কোনই লাভ হবে না; জয়রামবাটীতে যাও, সেখানে রামচন্দ্র মুখুয্যের ঘরে আমার জন্য পাত্রী কুটো-বাঁধা হয়ে আছে।” সন্ধান করিয়া জানা গেল, বস্তুতঃই রামচন্দ্র মুখুয্যের একটি কন্যা আছে এবং বিবাহ দিতেও তিনি প্রস্তুত, কিন্তু কন্যাটির বয়স নিতান্ত অল্প, মাত্র পাঁচ বৎসর। উপায়ান্তর না দেখিয়া এই শিশুকন্যাকেই ঘরে আনিতে চন্দ্রাদেবী রাজী হইলেন। পণের পরিমাণ সাব্যস্ত হইল তিন শত টাকা। সমস্ত যোগাড়যন্ত্র করিয়া রামেশ্বর অবিলম্বে শুভবিবাহ সম্পন্ন করিলেন। ১২৬৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ) এই পরিণয় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কন্যার নাম সারদামণি।

গহনাপত্র দিবার মত সঙ্গতি চন্দ্রাদেবীর ছিল না। সুতরাং বিবাহের পর নূতন বধূকে সাজাইবার জন্য লাহাবাবুদের বাড়ী হইতে কিছু অলঙ্কার ধার করিয়া আনিয়াছিলেন। বৈবাহিকের মনস্তুষ্টির জন্য এবং বাহিরের সম্ভ্রমরক্ষার জন্যই উহা করিতে হইয়াছিল। উৎসবান্তে সেগুলি ফিরাইয়া দিবার সময় উপস্থিত হইলে পর কোন্ প্রাণে অবোধ বালিকার গাত্র হইতে গহনাগুলি খুলিয়া লইবেন, সেই চিন্তায় চন্দ্রাদেবীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। জননীর অন্তরের ব্যথা শ্রীরামকৃষ্ণ অনায়াসে বুঝিতে পারিয়া কহিলেন —“মা, তুমি ভেবো না, আমি সব ঠিক করে দিচ্চি।” তার পর বালিকার ঘুমন্ত অবস্থায় এরূপ কৌশলে ও সন্তর্পণে তাঁহার গাত্র হইতে গহনাগুলি খুলিয়া লইলেন যে, সে কিছুমাত্র টের পাইল না। নিদ্রাভঙ্গে বালিকাসুলভ কৌতূহলে সে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, তাহার গহনাগুলি কোথায় গেল। চন্দ্রাদেবী তখন তাহাকে কোলে লইয়া সান্ত্বনাচ্ছলে বলিয়াছিলেন, “মা, তুমি দুঃখ কোরো না—এর চেয়ে অনেক ভাল ভাল গয়না গদাধর তোমাকে পরে এনে দেবে।” দৈবক্রমে নববধূর খুল্লতাত এই ঘটনার প্রায় পরমুহূর্তেই তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত আসেন এবং গহনাসংক্রান্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশপূর্বক কন্যাকে আপন সঙ্গেই পিত্রালয়ে লইয়া যান। চন্দ্রাদেবী উহাতে অত্যন্ত মর্মাহত হওয়াতে শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন—“মা, ওরা যাই বলুক ও করুক, বিয়ে ত আর ফিরছে না!”

পুত্রের বিবাহ সম্পন্ন করিয়া চন্দ্রাদেবী এক দারুণ দুশ্চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। তাঁহার মনে ভরসা জন্মিল যে, ছেলে যখন স্বেচ্ছায়

বিবাহ-বন্ধন স্বীকার করিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই সংসারে তাহার মন বসিবে। বিবাহের পর প্রায় দেড় বৎসরকাল শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরেই অবস্থান করিয়াছিলেন। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার পূর্বে কর্মস্থলে ফিরিয়া গেলে পুরাতন বায়ুরোগ আবার প্রবল হইয়া উঠিতে পারে—এই আশঙ্কায় চন্দ্রাদেবী সম্ভবতঃ তাঁহাকে যাইতে দেন নাই। দেশপ্রথানুযায়ী ঐ সময়ের মধ্যে তিনি একবার শ্বশুরালয়ে যাইয়া বধূকে সঙ্গে করিয়া 'জোড়ে' বাটী ফিরিয়াছিলেন।

পারিবারিক অবস্থা সচ্ছল না থাকাতে শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে অধিককাল গৃহে বসিয়া থাকা সম্ভবপর ছিল না। ১২৬৭ বঙ্গাব্দের শেষভাগে (১৮৬০ খৃঃ) তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তথায় অল্পকাল গত হইতে না হইতেই পূর্বেকার সেই ভাবোন্মাদ-অবস্থা আবার তাঁহাকে পাইয়া বসিল। সব কিছু ভুলিয়া দিবারাত্র তিনি শুধু 'মা' 'মা' বলিয়া পাগল। আহার-নিদ্রা সব দূরে গেল, সর্বাঙ্গে অনল-দহনের ন্যায় তিনি জ্বালা বোধ করিতে লাগিলেন। অঙ্গুলি দ্বারা চোখের পাতা বুজাইতে চেষ্টা করিলেও চোখে পলক পড়িত না। মথুরবাবুর নির্দেশানুযায়ী হৃদয়রাম মাঝে মাঝে তাঁহাকে স্বনামধন্য কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের নিকট চিকিৎসার জন্য লইয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু ঔষধপত্রে কোনই ফল পাওয়া গেল না। একদিন যখন তাঁহারা গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের বাটীতে গিয়াছেন, সেই সময়ে পূর্ববঙ্গীয় কোনও বিচক্ষণ কবিরাজ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি রোগীর লক্ষণ শুনিয়া বলিলেন যে, উহার ব্যাধি যোগজ, ঔষধপত্রে উহা সারিবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ পরবর্তীকালে বলিতেন যে, উক্ত কবিরাজই সর্বপ্রথম তাঁহার অনিদ্রা, গাত্রজ্বালা প্রভৃতির যথার্থ কারণ নির্দেশ করিতে পারিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের পুনরায় রোগাক্রান্ত হওয়ার সংবাদ যখন কামারপুকুরে পৌঁছিল, তখন চন্দ্রাদেবী কিরূপ উদ্বিগ্ন হইলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। পাগলিনীর ন্যায় তিনি বাটীর সম্মুখের শিবমন্দিরে 'হত্যা' দিলেন। সেখানে আদেশ পাইলেন মুকুন্দপুরের শিবের নিকট প্রার্থনা জানাইবার জন্য। কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ মুকুন্দপুরে যাইয়া তথাকার শিবমন্দিরে আবার 'হত্যা' দিয়া পড়িলেন। বৃদ্ধার দুঃখে এবং ঐকান্তিক প্রার্থনায় বিগলিত হইয়া মহাদেব স্বপ্নাদেশে জানাইলেন যে ভয়ের কারণ নাই, ঐশ্বরিক আবেশে শ্রীরামকৃষ্ণের ঐরূপ দশা ঘটিয়াছে, শীঘ্রই তিনি আবার সম্পূর্ণ সুস্থ

ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবেন। এই দৈববাণীতে আশ্বস্ত হইয়া মহাদেবকে পূজাদানপূর্বক চন্দ্রাদেবী গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের তপস্যার বেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতেছে। সাধনার পথে তিনি অবিশ্রাম গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছেন। কোন-একটা অবস্থা লাভ করিয়া কিছুতেই সেখানে স্থির হইয়া থাকিতে পারেন না, উহার পরবর্তী এবং উচ্চতর অবস্থায় পৌছিবার জন্য তৎক্ষণাৎ উঠিয়া-পড়িয়া লাগেন। সাধনার সেই তোড়ের মুখে শুচি-অশুচি-জ্ঞান, লজ্জাসরম-বোধ প্রভৃতি সমস্তই ভাসিয়া গেল; এমন কি, গলায় পৈতা এবং পরনে কাপড় আছে কি না তাহারও খেয়াল থাকিত না। "আশ্বিনের ঝড়ের মত একটা কি এসে কোথায় কি উড়িয়ে নিয়ে গেল! আগেকার চিহ্ন কিছুই রইল না। হুঁস নাই। কাপড় পড়ে যাচ্ছে, তা' পৈতে থাকবে কেমন করে?" শ্রীরামকৃষ্ণের তখন দিব্যোন্মাদ-অবস্থা। তাঁহার আচরণ বালকবৎ, পিশাচবৎ, উন্মত্তবৎ হইয়া গিয়াছিল। যিনি এক সময়ে রাণী রাসমণির প্রতিগ্রহের ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি এখন নীচজাতীয় লোকের রান্না-করা অন্ন পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিতেছেন, মেথরের সঙ্গে পায়খানা সাফ করিতেছেন, এঁটোপাতা হইতে খাদ্যবস্তু কুড়াইয়া খাইতেছেন। পরমুহূর্তেই হয় ত 'মা' 'মা' রবে চিৎকার করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছেন, কিংবা ভাগীরথীর তীরে বালুতে মুখ ঘষিতেছেন, আর কহিতেছেন যে মায়ের দেখা না পাইলে এ জীবন কিছুতেই রাখিবেন না। কিন্তু মাঝে মাঝে যখন পঞ্চবটীতে গিয়া ধ্যানস্থ হইয়া বসেন, তখন একেবারে নিশ্চল, নিস্পন্দ। যত্নের অভাবে মাথার চুল জটায় পরিণত হইয়াছে। ধ্যানাসনে যখন আসীন, তখন পাখীরা উড়িয়া আসিয়া নির্ভয়ে সেই জটার উপর বসিতেছে এবং পূজার চাউল কুড়াইয়া খাইতেছে। স্পন্দহীন দেহের উপর দিয়া সাপ বাহিয়া উঠিতেছে, শ্রীরামকৃষ্ণের কিছুমাত্র হুঁস নাই; সাপও বুঝিতেছে না যে সে মানুষের গায়ের উপর চড়িতেছে—দেহ এমনি কাঠ হইয়া রহিয়াছে। * একমাত্র তীব্র ইচ্ছা ও ব্যাকুলতার সহায়ে সমস্ত

* "যার ঈশ্বর-দর্শন হয়েছে, তার বালকের স্বভাব হয়। সে ত্রিগুণাতীত—কোন গুণের আঁট নাই। আবার শুচি-অশুচি তার কাছে দুই-ই সমান; তাই পিশাচবৎ। আবার পাগলের মত কভু হাসে, কভু কাঁদে; এই বাবুর মত সাজে-গোজে, আবার খানিক পরে ন্যাংটা, বগলের নীচে কাপড় রেখে বেড়াচ্ছে! তাই উন্মাদবৎ। আবার কখন বা জড়ের ন্যায় চুপ করে বসে আছে—জড়বৎ।"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি সিদ্ধিলাভের পথে যেভাবে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা আমাদের ন্যায় সাধারণ মানবের পক্ষে ধারণার অতীত। পরবর্তীকালে এ-বিষয় বুঝাইতে গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন যে, নিরন্তর ত্যাগ ও সংযম-অভ্যাসের ফলে মন যখন সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া যায়, তখন ঐ শুদ্ধ মন মূর্তি পরিগ্রহপূর্বক সাধককে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারে। নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেন যে, তাঁহার শরীর হইতে এক ত্রিশূলধারী যুবক-সন্ন্যাসী মাঝে মাঝে বাহির হইয়া আসিত এবং তাঁহাকে সাধনপথে উৎসাহিত করিত, কখনও বা চিত্ত একাগ্র করিবার নিমিত্ত ভয় দেখাইত আর বলিত—'অন্য সকল চিন্তা দূর করে দিয়ে শুধু ইষ্টচিন্তায় যদি মগ্ন হয়ে না থাকবি, ত এই ত্রিশূল তোর বুকে বসিয়ে দেবো।'

ঐ সময়কার অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, "আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাবল্যে সাধারণ জীবের শরীর-মনে ঐরূপ হওয়া দূরে থাকুক, উহার একচতুর্থাংশ বিকার উপস্থিত হইলে শরীরত্যাগ হয়। দিবারাত্রের অধিকাংশ ভাগ মা'র কোনরূপ দর্শনাদি পাইয়া ভুলিয়া থাকিতাম, তাই রক্ষা; নতুবা (নিজ শরীর দেখাইয়া) এ খোলটা থাকা অসম্ভব হইত। এখন হইতে আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল তিলমাত্র নিদ্রা হয় নাই। চক্ষু পলকশূন্য হইয়া গিয়াছিল, সময়ে সময়ে চেষ্টা করিয়াও পলক ফেলিতে পারিতাম না। কত কাল গত হইল, তাহার জ্ঞান থাকিত না, এবং শরীর বাঁচাইয়া চলিতে হইবে, একথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। শরীরের দিকে যখন একটু-আধটু দৃষ্টি পড়িত, তখন উহার অবস্থা দেখিয়া বিষম ভয় হইত; ভাবিতাম, পাগল হইতে বসিয়াছি না কি? দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চক্ষে অঙ্গুলি প্রদানপূর্বক দেখিতাম, চক্ষুর পলক উহাতেও পড়ে কি না। তাহাতেও চক্ষু সমভাবে পলকশূন্য থাকিত! ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিতাম এবং মাকে বলিতাম, 'মা, তোকে ডাকার ও তোর উপর একান্ত বিশ্বাস ও নির্ভর করার কি এই ফল হ'ল? শরীরে বিষম ব্যাধি দিলি?' আবার পরক্ষণেই বলিতাম, 'তা যা' হবার হোক গে, শরীর যাক্; তুই কিন্তু আমায় ছাড়িস্ নি, আমায় দেখা দে, কৃপা কর, আমি যে মা তোর পাদপদ্মে একান্ত শরণ নিয়েছি, তুই ভিন্ন আমার যে আর অন্য গতি একেবারেই নাই।' ঐরূপ কাঁদিতে কাঁদিতে মন আবার অদ্ভুত

উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া উঠিত, শরীরটাকে অতি তুচ্ছ, হেয় বলিয়া মনে হইত এবং মার দর্শন পাইয়া ও অভয়বাণী শুনিয়া আশ্বস্ত হইতাম।"*

ঐ সময়ে ভাবাবেশে যে-সকল অস্বাভাবিক আচরণ শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে করিতেন, তাহা লোকমুখে কিছু কিছু জানিতে পারা গিয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করা হইতেছে: দক্ষিণেশ্বরে যে দ্বাদশ শিবমন্দির রহিয়াছে, উহাদের একটির ভিতরে দাঁড়াইয়া একদা তিনি শিবমহিম্নস্তোত্র আবৃত্তি করিতেছিলেন। শিবের মহিমা কীর্তন করিতে করিতে জগৎসংসার সমস্তই ভুলিয়া গেলেন, মনের মধ্যে শিব ছাড়া আর কিছুই নাই। স্তোত্রের শ্লোক, চরণ প্রভৃতি সব ওলট-পালট হইয়া যাইতে লাগিল। যে স্থানে আছে যে, স্বয়ং বাগ্‌দেবী অনন্তকাল ধরিয়া লেখনী চালনা করিলেও শিবের মহিমা লিখিয়া শেষ করিতে পারিবেন না, সেখানটায় আসিয়া একেবারে উন্মাদের প্রায় হইয়া গেলেন; তারস্বরে বারবার শুধু বলিতে লাগিলেন, "মহাদেব গো! তোমার গুণের কথা আমি কেমন করে বল্‌ব!" চীৎকারের সঙ্গে অবিরলধারে নয়নাশ্রু বিগলিত হইতেছে। ক্রন্দন ও বিলাপ আর কিছুতেই থামে না। এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া চারিদিকে লোক জড় হইয়া গেল। মথুরবাবু ঐ সময়ে দক্ষিণেশ্বরে কুঠি-বাড়ীতেই ছিলেন; তিনিও আসিলেন এবং একটু দূরে দাঁড়াইয়া সেই অপরূপ দৃশ্য প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ঠাট্টা করিয়া বলিল, "ওঃ, ছোট ভটচাযের পাগলামি! আমি বলি আর কিছু। আজ বড্ড বাড়াবাড়ি দেখ্‌চি।" সমর্থনের সুরে অপর একজন কহিল, "শেষে শিবের ঘাড়ে চড়ে বসবে না তো হে? হাত ধরে টেনে আনা ভাল।" ঐরূপ কথাবার্তা শুনিয়া মথুরবাবু সকলকে সতর্ক করিবার নিমিত্ত কহিলেন, "যার মাথার উপর মাথা আছে, সেই যেন ভটচায মহাশয়কে ছুঁতে যায়।" বহুক্ষণ এইভাবে গত হইবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন। চারিদিকে লোকজন সমবেত এবং মথুরবাবুকেও উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ভাবদশাগ্রস্ত অবস্থায় নিশ্চয়ই কোন অদ্ভুত কাণ্ড তিনি করিয়া বসিয়াছেন। তজ্জন্য মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইয়া মথুরানাথের কাছে গিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি বেসামাল হয়ে কিছু করে ফেলেছি নাকি?" মথুরবাবু তাঁহার পায়ে মাথা ঠেকাইয়া বলিলেন,

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

"না বাবা, তুমি স্তব পাঠ করছিলে ; পাছে কেউ না বুঝে তোমায় বিরক্ত করে, তাই আমি এখানে দাঁড়িয়েছিলাম।"

ঐ সময়কার অপর একটি ঘটনাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একদা শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ঘরের বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন; অদূরে কুঠি-বাড়ীতে আপন কামরায় বসিয়া মথুরানাথ তাঁহাকে দেখিতেছিলেন। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইবার পর সহসা তিনি উঠিয়া আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ে একেবারে লুটাইয়া পড়িলেন এবং শিশুর ন্যায় ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ত চক্ষু স্থির! ব্যস্তসমস্ত হইয়া তিনি মথুরানাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্যাপারখানা কি। "বল্লুম—'তুমি এ কি করচ? তুমি বাবু, রাণীর জামাই, লোকে তোমায় এমন করতে দেখলে কি বলবে? স্থির হও, ওঠ।' সে কি তা শোনে! তার পর ঠাণ্ডা হয়ে সকল কথা ভেঙ্গে বললে। অদ্ভুত দর্শন হয়েছিল। বললে—'বাবা, তুমি বেড়াচ্চ, আর আমি স্পষ্ট দেখলুম যখন এদিকে আগিয়ে আসচ, দেখচি তুমি নও, আমার ঐ মন্দিরের মা। আর যাই পেছন ফিরে ওদিকে যাচ্চ, দেখি কি যে সাক্ষাৎ মহাদেব! প্রথম ভাবলুম, চোখের ভ্রম হয়েছে; চোখ ভাল করে পুঁছে ফের দেখলুম—দেখি তাই! এইরূপ যতবার করলুম, দেখি তাই।' এই বলে, আর কাঁদে। আমি বল্লুম, 'আমি ত কৈ কিছু জানি না বাবু'—কিন্তু সে কি শোনে! শুনে ভয় হল, পাছে একথা কেউ জেনে গিন্নিকে (রাণী রাসমণিকে) বলে দেয়। সেই বা কি ভাববে—হয়ত বলবে, কিছু গুণটুন করেছে। অনেকবার বুঝিয়ে-সুজিয়ে বলায় তবে সে ঠাণ্ডা হয়। মথুর কি সাধে এতটা করত—ভালবাসত? মা তাকে অনেক সময় অনেক রকম দেখিয়ে-শুনিয়ে দিয়েছিল।"*

উপর্যুক্ত ঘটনার পর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণকে মনে মনে ইষ্টরূপে গ্রহণ করিয়া মথুরানাথ তাঁহার সেবাযত্নে আরও অধিক মনোযোগী হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের যাহা যাহা সম্ভাব্য প্রয়োজন, তাহা মিটাইবার সম্যক্ ব্যবস্থা পূর্ব হইতে করিয়া দিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না, ব্যবস্থানুযায়ী সমস্ত ঠিকভাবে চলে কি না, তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। কঠোর তপস্যায় ও মহাভাবের প্রাবল্যে শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর যাহাতে একেবারে ভাঙ্গিয়া না পড়ে, সেই উদ্দেশ্যেই জগজ্জননী যেন মথুরানাথকে সেবকরূপে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন।

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ইহলোকে নির্দিষ্টকার্য-সমাপনান্তে রাণী রাসমণির দিব্যধামে প্রস্থানের সময় আর বেশী বিলম্ব ছিল না। ১২৬৭ বঙ্গাব্দের মাঝামাঝি (১৮৬১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে) তিনি জ্বর ও উদরাময়ে শয্যাগত হইয়া পড়েন। একদা সহসা পড়িয়া গিয়া পেটে খুব আঘাত লাগিয়াছিল; তাহা হইতেই ব্যাধির সূত্রপাত হয়। ঔষধপত্রে কোনই ফল হইতেছিল না; উপরন্তু মানসিক অশান্তিতে ব্যাধির প্রকোপ আরও বাড়িয়া যায়। জ্যেষ্ঠা কন্যা পদ্মমণির আচরণে রাণী ঐ সময়ে বড়ই মর্মাহত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণেশ্বরে মন্দির-প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে দিনাজপুরে একটি প্রকাণ্ড জমিদারি কিনিয়া রাণী রাসমণি উহার সম্পূর্ণ আয় মন্দিরের নিত্যপূজা ও পালপার্বণের ব্যয়নির্বাহের জন্য বরাদ্দ করিয়া দিয়াছিলেন। ব্যবস্থা পাকা করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত সম্পত্তি দানপত্রের দ্বারা দেবোত্তর করিয়া দিবার ইচ্ছা প্রথমাবধিই তাঁহার মনে ছিল; কিন্তু আলস্যবশতঃ অথবা অপর যে-কোন কারণেই হউক, সেই ইচ্ছা এতদিন কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। এখন মৃত্যুকাল আসন্ন জানিয়া দানপত্র-সম্পাদনের জন্য তিনি অতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। অবিলম্বে দানপত্র লিখিত হইল এবং রাণী তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন। কিন্তু উত্তরাধিকারী বিদ্যমানে বিধবা রাণী কর্তৃক সম্পাদিত উক্ত দানপত্র আইনতঃ নির্দোষ ও ত্রুটিশূন্য কি-না, এ-বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ ছিল। রাণীর চারি কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা পদ্মমণি ও কনিষ্ঠা জগদম্বা সেই সময়ে জীবিত এবং উভয়েই তখন শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত। মাতার স্বাক্ষরিত দানপত্রে তাঁহাদের সম্পূর্ণ সম্মতি রহিয়াছে—একথা দুজনে লিখিয়া দিলে ভবিষ্যতে গোলযোগের সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব এই ধরনের একটি অঙ্গীকারপত্র-সম্পাদনের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা হইল। কনিষ্ঠা জগদম্বা তৎক্ষণাৎ তাহা করিয়া দিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠা পদ্মমণি বহু অনুরোধ-উপরোধেও তাহা করিলেন না। উহার ফলে মৃত্যুশয্যাশায়ী রাণীর মনের উপর একটা গভীর বিষাদের ছায়া পতিত হইল। দারুণ আক্ষেপের ভাব মনোমধ্যে পোষণ করিয়াই ইহজগৎ হইতে বিদায় লইতে তিনি বাধ্য হইলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাণী রাসমণি কর্তৃক দেবোত্তর-দানপত্র স্বাক্ষরিত হয়, আর তাহার পরদিনই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে রাণী রাসমণিকে কালীঘাটে আদিগঙ্গার তীরের

বাটীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল; অন্তিমকাল আসন্ন বুঝিয়া যখন অন্তর্জলির জন্য তাঁহাকে গঙ্গাগর্ভে নামানো হয়, তখনও কিন্তু তাঁহার জ্ঞান বিলুপ্ত হয় নাই। সম্মুখে অনেকগুলি প্রদীপ জ্বলিতেছে দেখিয়া সেই মুমূর্ষু অবস্থায় তিনি বলিয়া উঠিলেন, "সরিয়ে দে, সরিয়ে দে, ওসব রোশনাই আর ভাল লাগছে না; এখন আমার মা আসছেন, তাঁর শ্রীঅঙ্গের প্রভায় চারদিক আলো হয়ে উঠেছে!" অল্পক্ষণ পরেই আবার কহিলেন, "মা এলে! পদ্ম যে সহি দিলে না। কি হবে মা?"* এই কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়াই রাণী চিরনিদ্রায় অভিভূতা হইলেন, মায়ের সেবিকা জগজ্জননীর স্নেহময় অঙ্কে চির-আশ্রয় লাভ করিলেন। রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ।

রাসমণির মৃত্যুর পর মথুরবাবুই তাঁহার বিশাল জমিদারির কর্মকর্তা হইলেন। কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া ইষ্টের প্রয়োজনে নিজের ইচ্ছামত খরচ করিবার এইবার তাঁহার অবাধ অধিকার জন্মিল। শোনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার জন্য ঐ সময়ে তিনি কতক ভূসম্পত্তি পৃথক্‌ভাবে লেখাপড়া করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাতে এমনই বিরক্তি প্রকাশ করেন যে, মথুরবাবু জীবনে আর কখনও ঐ প্রসঙ্গ তুলিতে সাহস পান নাই। কিন্তু কাগজে-কলমে দানপত্র করিয়া না দিলেও মথুরবাবু মনে মনে সর্বস্ব সঁপিয়া দিয়া নিজেকে শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের তল্পিবাহকরূপে জ্ঞান করিতে শিখিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে একটি গল্প এখানে বলা যাইতে পারে, গল্পটি বড়ই সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী। মথুরানাথ মাঝে মাঝে 'বাবা'কে জানবাজারের বাড়ীতে লইয়া গিয়া রাজার ন্যায় তাঁহাকে সম্মান ও পরিচর্যা করিতেন। তাঁহার আহার্য-পরিবেশনের জন্য একপ্রস্থ সোনার ও রূপার বাসন কিনিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি আসিলে পর এগুলি তাঁহার ব্যবহারে লাগাইতেন, আর বলিতেন, "বাবা, তুমিই ত এ-সকলের মালিক, আমি তোমার দেওয়ান বই ত নয়; এই দেখ না তুমি সোনার থালায়, রূপোর বাটি-গেলাসে খেয়ে বেশ উঠে চলে গেলে, এ-গুলোর দিকে ফিরেও তাকালে না, আর আমি সে-গুলো মাজিয়ে, ঘসিয়ে, পালিশ করিয়ে তুলিয়ে রাখি—আবার তুমি এলে পর বের করা হবে। চুরি-টুরি যায় কি না, ভাঙ্গা-ফুটো হল কি না—তার প্রতিও নজর রাখি।

* দুঃখের বিষয়, রাণীর আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে এই দেবোত্তরসম্পত্তি লইয়া মামলা-মকদ্দমার সৃষ্টি হয় এবং সম্পত্তি দেনার দায়ে বাঁধা পড়ে।

আমার কাজ হচ্ছে খবরদারি।” শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “তবে ত বেশ হয়েচে।” এরূপ কথাবার্তা হয়, আর দুজনেই খুব আনন্দ উপভোগ করেন।

মূল্যবান্ বস্ত্রাদিও মথুরানাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে মধ্যে মধ্যে উপহার দিতেন। একবার একজোড়া খুব দামী শাল উপহার দিয়াছিলেন। শালজোড়া পাইয়া প্রথমে ত বালকের ন্যায় তিনি মহা খুশী ; গায়ে জড়াইয়া বারংবার নিজের দিকে তাকান এবং ঘুরিয়া-ফিরিয়া মহা স্ফূর্তির সহিত সকলকে দেখান—কেমন সুন্দর শাল এবং কেমন মানানসই ! কিন্তু অল্পক্ষণ যাইতে না যাইতেই মনের ভাব বদলাইয়া গেল। তখন বিচার করিতে লাগিলেন—“এতে আর আছে কি ? কতকগুলো ভেড়ার লোম বই ত নয়। পঞ্চভূতের বিকারে যেমন অন্য সব জিনিস তৈরী, এও ঠিক তাই। এতে সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না, বরঞ্চ গায়ে দিলে অভিমান বাড়ে, মনে হয় আমি মস্ত একজন, অপর সকলের চেয়ে বড়। আর অভিমান-অহঙ্কার বাড়লেই মানুষের মন ঈশ্বর থেকে দূরে সরে যায়। এতে এত দোষ !” এই সিদ্ধান্ত করিয়া শালজোড়া মাটিতে ফেলিয়া, পায়ে মাড়াইয়া থুথু দিতে লাগিলেন, এমন কি, অবশেষে আগুনে পোড়াইতে উদ্যত হইলেন। ঐ সময়ে দৈবক্রমে কেহ একজন সেখানে আসিয়া পড়ে এবং শালজোড়াকে আশু বিনাশ হইতে কোন রকমে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। মথুরবাবু যখন শালের দুর্দশার বিষয় জানিতে পাইলেন, তখন কিছুমাত্র দুঃখ প্রকাশ না করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন—“বাবা বেশ করেছেন।” তিনি জানিতেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের মন সম্পূর্ণ অনাসক্ত, সুতরাং ঐরূপ আচরণ মোটেই অস্বাভাবিক নহে ; অন্যের যাহা মানায় না, শ্রীরামকৃষ্ণের তাহা মানায়।

ভবতারিণীর নিকট একান্তভাবে আত্মসমর্পণপূর্বক শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের মন হইতে বিষয়বাসনার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন। একদা হাতের মুঠোয় একসঙ্গে টাকা ও মাটি লইয়া তিনি ‘টাকা—মাটি’ বলিতে বলিতে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করেন। সেই যে কাঞ্চনকে মৃত্তিকাজ্ঞানে বর্জন করিলেন, তাহার পর হইতে টাকাকড়ি আর কখনও স্পর্শ করিতে পারিতেন না, ছুঁইতে গেলে হাতের আঙুল বাঁকিয়া যাইত।* একবার কোনও মাড়োয়ারী সওদাগর

* “তাঁকে পেলে সবাইকে পাব। টাকা মাটি, মাটিই টাকা—সোনা মাটি, মাটিই সোনা—এই বলে ত্যাগ কল্লুম ; গঙ্গার জলে ফেলে দিলুম। তখন ভয় হলো যে মা লক্ষ্মী যদি রাগ করেন। লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য অবজ্ঞা কল্লুম। যদি খ্যাঁট বন্ধ করেন। তখন বল্লুম, ‘মা, তোমায় চাই, আর কিছু চাই না’ ; তাঁকে পেলে সব পা’ব।”

তাঁহার সেবার জন্য দশ হাজার টাকা জমা দিতে চাহিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন করজোড়ে অনুনয়ের দ্বারাও উৎসাহী দাতাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, তখন জগদম্বাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "মা! আমায় যারা তোর নিকট থেকে সরিয়ে নিতে চায়, এরূপ ঘোর বিষয়ী লোকদের এখানে আনিস্ কেন?" এই কথায় ধনী ব্যক্তিটির অবশেষে কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হয়, তিনি লজ্জিতভাবে প্রস্থান করেন।

সাধক-জীবন

২

তান্ত্রিক সাধন : বাৎসল্য ও মধুরভাবের সাধন

১২৬৮ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে (১৮৬১ খৃঃ) একদা সকাল বেলায় শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরসংলগ্ন উদ্যানে ফুল তুলিতেছিলেন, এমম সময়ে একখানি নৌকা বকুল-তলার ঘাটে* আসিয়া লাগিল। জনৈকা প্রৌঢ়া ভৈরবী নৌকা হইতে তীরে নামিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছোট দু'টি পুঁটলি—একটিতে সামান্য কাপড়-চোপড়, অপরটিতে কয়েকখানি পুঁথিপত্র। ভৈরবীর আলুলায়িত কেশপাশ পিঠের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে—দেহে অসামান্য রূপলাবণ্য। তিনি নৌকা হইতে নামিয়া দক্ষিণেশ্বর ঘাটের চাঁদনির দিকে অগ্রসর হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একটু সরিয়া আসিয়া হৃদয়কে কহিলেন ভৈরবীকে তাঁহার নিকট আহ্বান করিয়া আনিতে। হৃদয় প্রশ্ন করিলেন—একজন অপরিচিতা রমণীকে ডাকিলেই বা তিনি আসিবেন কেন ? শ্রীরামকৃষ্ণ এই আপত্তি না শুনিয়া পুনরায় জেদ করিয়া কহিলেন—"তুই যা' না, তাঁকে আমার কথা বল্, নিশ্চয়ই তিনি আসবেন।" হৃদয়রাম বিলক্ষণ জানিতেন যে, মাতুল কোন বিষয়ে গোঁ ধরিলে তাঁহাকে নিরস্ত করিবার উপায় নাই। সুতরাং আর প্রতিবাদ না করিয়া ভৈরবীর নিকট গমনপূর্বক বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন যে, ভগবদ্ভাবে মাতোয়ারা তাঁহার মাতুল মন্দিরবাটীতেই থাকেন এবং সন্ন্যাসিনীর দর্শনলাভের নিমিত্ত ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করিতেছেন। আশ্চর্যের বিষয়, হৃদয়ের আমন্ত্রণে বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার অনুগমন করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে দেখিবামাত্র ভৈরবী সবিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইলেন, মুখে এরূপ ভাব, যেন নিতান্ত অপ্রত্যাশিতরূপে কোনও

* কালীবাড়ীর মন্দির-প্রাঙ্গণের বরাবর সমস্ত গঙ্গাতীর পোস্তা-বাঁধানো। তাহাতে দুইটি ঘাট। প্রাঙ্গণ-মধ্য হইতে সোজা গঙ্গাতে যাইবার নিমিত্ত চত্বর-সমন্বিত একটি বড় ঘাট ; উহাকে বলা হয় দক্ষিণেশ্বরের ঘাট। পোস্তার উত্তর প্রান্তে মেয়েদের ব্যবহারের জন্য অপেক্ষাকৃত ছোট আরেকটি ঘাট ; উহাই বকুলতলার ঘাট।

বাঞ্ছিত ব্যক্তির সন্ধান এবং দেখা পাইয়াছেন। ক্ষণকালমধ্যে নিজেকে সামলাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন—"বাবা! তুমি এখানে? গঙ্গাতীরে আছ জেনে আমি কত খুঁজে বেড়াচ্চি—এতদিনে দেখা পেলাম।" শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্চর্যান্বিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "মা! তুমি কেমন করে আমার বিষয় জানলে?" ভৈরবী তদুত্তরে বলিলেন, "আমার উপর জগদম্বার আদেশ ছিল—তিনজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। দু'জনের সঙ্গে পূর্ববঙ্গে আগেই দেখা হয়েছে, তৃতীয় ব্যক্তি তুমি।" বলিতে বলিতে ভৈরবী আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন, যেন কতকালের হারানিধির সন্ধান পাইয়াছেন। ভৈরবীর স্নেহপূর্ণ বাক্যে শ্রীরামকৃষ্ণকেও যেন একটু বিচলিত দেখা গেল।

যতদূর জানিতে পারা যায়, ভৈরবী ব্রাহ্মণী যশোহর জেলার কোনও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণপরিবারের কন্যা; নাম ছিল 'যোগেশ্বরী'। বৈষ্ণবগ্রন্থাদিতে এবং তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। আর শুধু যে শাস্ত্র-পুস্তক কণ্ঠস্থ কিংবা বিচার করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন, তাহা নহে, সাধনার দ্বারা শাস্ত্রনিহিত সত্য তিনি নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। দৈবনির্দেশ-অনুযায়ী যে দুইজন সাধকের সহিত মিলনের কথা তিনি উল্লেখ করিলেন, তাঁহাদের একজনের নাম ছিল 'চন্দ্র', অপর ব্যক্তির নাম 'গিরিজা'।* তাঁহারা উভয়েই ছিলেন বরিশালের অধিবাসী। এবারে তৃতীয় ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইয়া এবং তাঁহার দেহের অসামান্য লক্ষণাদি দেখিয়া ভৈরবীর বিস্ময় ও আনন্দের আর সীমা রহিল না।

শ্রীরামকৃষ্ণেরও প্রথম দর্শনেই ভৈরবীকে মনে হইল যেন নিতান্ত আপনার লোক। সমভাবের ভাবুক ছিলেন বলিয়া দেখা হইবামাত্র উভয়ের মধ্যে

* পরবর্তীকালে চন্দ্র এবং গিরিজার সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের মিলন ঘটিয়াছিল। যোগ-সাধনায় উঁহারা দু'জনেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সিদ্ধাইয়ের মোহগর্তে পড়িয়া প্রকৃত ঈশ্বরলাভের পথ হইতে বিচ্যুত হন। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় তাঁহারা পুনরায় ঐ পথে প্রবর্তিত হইয়াছিলেন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার বিদেশগমনের পর 'চন্দ্র' নামধারী অতি শান্ত ও সাধুপ্রকৃতি জনৈক ভদ্রলোক বেলুড় মঠে উপস্থিত হইয়া কিছুদিন তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি অনেক সময়ে মঠাধ্যক্ষ শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ স্বামিজীর সহিত নিভৃতে বহুক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা বলিতেন। তাঁহার আচরণে ও কথাবার্তায় মঠের সাধুদের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, তিনিই ভৈরবী-বর্ণিত 'চন্দ্র'।

পারমার্থিক প্রসঙ্গ আরম্ভ হইয়া গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার নানাবিধ অলৌকিক দর্শন ও উপলব্ধির কথা—সাধনার ফলে তাঁহার দেহ-মনের যে-সকল অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছিল এবং যাহার জন্য লোকে তাঁহাকে পাগল বলিত, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত অকপটে খুলিয়া বলিলেন। এই সকল কথা শুনিয়া ভৈরবীর বিস্ময়ের মাত্রা আরও চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল। শ্রীরামকৃষ্ণকে আশ্বস্ত করিবার নিমিত্ত অতিশয় স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে তিনি কহিতে লাগিলেন, "বাবা! কে তোমায় পাগল বলে? এ ত সাধারণ পাগলামি নয়! শাস্ত্রে যাকে 'মহাভাব' বলে সেই অবস্থাই তোমার হয়েছে। শ্রীরাধা, শ্রীগৌরাঙ্গ এই মহাভাবেই পাগল সেজেছিলেন। ভক্তিশাস্ত্রে এসব কথা পরিষ্কারভাবে লেখা রয়েছে; বই খুলে আমি তোমাকে স্পষ্ট দেখিয়ে দেবো। যে-সকল ভক্ত ভগবানকে পাবার জন্য ব্যাকুলভাবে চেষ্টা করেন, এবং যাঁরা অত্যুত্তম অধিকারী ও মহাভাগ্যবান্, শুধু তাঁদেরই মধ্যে এই মহাভাবের সঞ্চার হয়ে থাকে। ভগবৎ-সাক্ষাৎকার-লাভ করতে হলে এই অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতেই হবে, তাছাড়া অন্য পথ নেই।" ভৈরবীর এই আশ্বাসবাক্যে শ্রীরামকৃষ্ণের বহুদিনের ভয়-ভাবনা প্রশমিত হইল। ভৈরবীকে তিনি মাতার ন্যায় এবং ভৈরবীও তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় গ্রহণ করিলেন।

ভৈরবী-ব্রাহ্মণী কালীবাটীতেই অবস্থানপূর্বক অধিকাংশ সময় পঞ্চবটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তত্ত্বকথার আলোচনায় ও সাধনভজনে ব্যাপৃত রহিলেন। এইরূপে কয়েকদিন গত হইবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবীকে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার পক্ষে এভাবে কালীবাটীতে থাকা সঙ্গত নহে, লোকনিন্দা হইতে পারে। ব্রাহ্মণীও এই যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারিয়া দক্ষিণেশ্বরের অদূরে আরিয়াদহ নামক স্থানে গঙ্গার ঘাটের * উপরেই একটি বাসস্থান ঠিক করিয়া লইলেন। সেখান হইতে তিনি প্রত্যহ দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ যোগজ ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন এবং অনেক কবিরাজী চিকিৎসা করাইয়াও কোনই ফল পাওয়া যাইতেছিল না। একটি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক উপসর্গ ছিল—শরীরে জ্বালাবোধ। বেলাবৃদ্ধির সঙ্গে

* যে ঘাটের চাঁদনীতে ভৈরবী বাসস্থান করিয়াছিলেন, উহা 'দেবমণ্ডলের ঘাট' নামে পরিচিত ছিল।

সঙ্গে তিনি সর্বশরীরে তীব্র জ্বালা অনুভব করিতেন, গঙ্গার জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়া থাকিয়া এবং মাথায় ভিজা কাপড় জড়াইয়া রাখিয়াও সেই জ্বালার কিছুমাত্র উপশম হইত না। ভৈরবী এবারে যোগশাস্ত্রবিহিত অতি সহজ উপায়ে সেই উপসর্গ দূর করিয়া দিলেন। উপায়টি আর কিছুই নহে, শরীরে চন্দনের অনুলেপন এবং গলায় সুগন্ধি পুষ্পের মাল্যধারণ। উহাতে সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা নিঃশেষে দূরীভূত হইয়া গেল। অপর একটি উপসর্গ দেখা দিয়াছিল—অস্বাভাবিক ক্ষুধা। ব্রাহ্মণী তাহারও প্রতিবিধান করিলেন। তাঁহার নির্দেশে নানাপ্রকার খাদ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ একটি প্রকোষ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণকে বসাইয়া রাখা হইল; খাদ্যসম্ভার বহুক্ষণ পর্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া নয়ন-মন তৃপ্ত হওয়াতে সেই উৎকট ক্ষুধা যেন আপনা হইতে চলিয়া গেল। এরূপে মাতার ন্যায় স্নেহে এবং যত্নে ভৈরবী-ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণকে ক্রমশঃ আরও কাছে টানিতে লাগিলেন।

ভৈরবী-ব্রাহ্মণীর মুখে বিবিধ শাস্ত্রীয় সাধন-পদ্ধতির কথা শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের মনে স্বভাবতঃই আগ্রহ জন্মিল—সেগুলি একে একে পরীক্ষা করিয়া নিজের অভিজ্ঞতার সহিত মিলাইয়া দেখিবেন। এতদিন শুধু আজন্ম-শুদ্ধ মন ও তীব্র ব্যাকুলতার সহায়ে তিনি সমাধির অবস্থায় পৌঁছিয়াছিলেন। গুরুশিষ্য-পরম্পরাক্রমে যে-সকল শাস্ত্রনির্দিষ্ট সাধনপ্রণালী স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতভূমিতে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের এযাবৎ বিশেষ পরিচয় ঘটে নাই। কেনারাম ভট্টাচার্যের নিকটে তিনি তান্ত্রিক দীক্ষা লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে দীক্ষা ছিল মোটের উপর একটা লৌকিক ব্যাপার, কোন বিশিষ্ট সাধনপদ্ধতি তিনি সেই দীক্ষাদাতার নিকট লাভ করেন নাই, কিংবা তাঁহার নিকট অভ্যাস করেন নাই। এবারে উপযুক্ত গুরু-শিষ্যের মিলন ঘটিল। ভৈরবী দেখিলেন, নিজের বিদ্যা নিঃশেষে দান কবিবার মত এমন উপযুক্ত পাত্র আর মিলিবে না; অপরদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিতে পাইলেন যে, সাধন-জগতের বহুতর জ্ঞাতব্য বিষয় ভৈরবীর নিকট শিক্ষা করা যাইতে পারে এবং শিক্ষালাভের এমন উত্তম সুযোগ আর হয় ত মিলিবে না। সুতরাং ভৈরবী যখন তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতি শিখাইবার প্রস্তাব করিলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ ৺ভবতারিণীর আদেশ গ্রহণপূর্বক তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

প্রাচীন বৈদিক যুগের ঋষিগণ প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি এই দু'য়ের কোনটাকেই আত্যন্তিক ভাবে বড় করিয়া দেখিতেন না; উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানপূর্বক

তাঁহারা ধর্মজীবন যাপন করিতেন। সাংসারিক সুখসমৃদ্ধিও হইবে, আবার অন্তকালে মোক্ষলাভও হইবে—এই ছিল তাঁহাদের আদর্শ। তাহা ছাড়া অধিকারিভেদ স্বীকৃত হইত; কর্মকাণ্ডের ভিতর দিয়া মানুষ ধাপে ধাপে মোক্ষলাভের দিকে অগ্রসর হইবে—ইহাই ছিল বেদনির্দিষ্ট পন্থা। তৎপরে বৌদ্ধযুগ; সে যুগে সন্ন্যাসধর্মের প্রাবল্য ও জয়জয়কার। অধিকারী অনধিকারী বিচার না করিয়া আপামর-সাধারণ ও স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলকেই মোক্ষের উপদেশ, নির্বাণের উপদেশ দেওয়া হইতে লাগিল। উহাতে যে সমাজের ঘোরতর অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। অধিকাংশ নরনারীর পক্ষে নিবৃত্তিমার্গ অনুসরণ করা কিছুতেই সম্ভবপর হইতে পারে না। ফলে ভগবান্ তথাগতের প্রচারিত ধর্মের সহজেই বিকৃতি ঘটিয়াছিল এবং বৌদ্ধসমাজে নানারকম অনাচার ও ব্যভিচার প্রবেশ করিয়াছিল।

তন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই, প্রাচীন বৈদিক আদর্শের পুনরুজ্জীবন। কথিত আছে, বৈদিক ধর্মের দুর্দশা দেখিতে পাইয়া স্বয়ং মহাদেব আগম অথবা তন্ত্রশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। তন্ত্রে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দু'য়েরই উপদেশ আছে, আর সেই সঙ্গে আছে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ-চিন্তন। কুণ্ডলিনী-শক্তির জাগরণ এবং ষট্‌চক্রভেদ তান্ত্রিক সাধনার প্রধানতম অঙ্গ। তন্ত্রমত শাক্ত ও বৈষ্ণব, উভয় সম্প্রদায়েই প্রচলিত হইয়াছিল; কিন্তু কালক্রমে তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতির মধ্যেও বহু কদাচার প্রবেশলাভ করে। পঞ্চমকার, শক্তিগ্রহণ, নরবলি প্রভৃতির সহিত জড়িত হইয়া তান্ত্রিক সাধনা সাধারণ গৃহস্থের নিকট একটা বিভীষিকার বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। যাহাই হউক, আসলে তন্ত্র যে বৈদিক ধর্মেরই প্রকারভেদ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; তন্ত্রে তিন রকম ভাবের সাধন-প্রণালী উক্ত হইয়াছে; যথা—পশুভাবের সাধন, বীরভাবের সাধন ও দিব্য-ভাবের সাধন। যাঁহারা রিপুজয় করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের জন্য পশুভাবের সাধনই বিহিত। এই পন্থায় সাধককে সর্বপ্রকার প্রলোভন হইতে দূরে থাকিয়া কঠোর সংযম অভ্যাসপূর্বক ধ্যান-জপ ইত্যাদির সাহায্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হয়। যাঁহারা বীরভাবের সাধক তাঁহাদের মধ্যে কুণ্ডলিনীশক্তি পূর্বেই জাগরিতা হইয়াছেন, তাঁহারা আগুন লইয়া খেলিবার অধিকারী, প্রলোভনের বিবিধ সামগ্রীর মাঝখানে বসিয়া তাঁহারা পরব্রহ্মে মনকে লয়

করিয়া দিতে চাহেন, তাঁহারা উজান বাহিয়া চলেন—উহাই তাঁহাদের অবলম্বিত পন্থা। বীরভাবের সাধনার অপর নাম বামাচার। দিব্যভাবের যাঁহারা সাধক, তাঁহারা আরও উচ্চস্তরের—তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রামের মোড় ঘুরিয়া গিয়াছে, তাঁহাদের সকল বৃত্তি ভগবন্মুখী; সত্য, অহিংসা, দয়া, তুষ্টি প্রভৃতি গুণ তাঁহাদের নিকট নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে।

তান্ত্রিক সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ একান্ত তন্ময় হইয়া উহাতে ডুবিয়া গেলেন। সাধনের জন্য দুইটি মুণ্ডাসন রচিত হইল—একটি পঞ্চবটীতে, অপরটি উদ্যানের উত্তরসীমায় অবস্থিত বিল্ববৃক্ষের নীচে। তান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে বহুবিধ উপকরণের আবশ্যক হয়, তাহার অনেকগুলি আবার অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। ভৈরবী স্বয়ং সেই সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। সাধনার পদ্ধতি যতই কঠিন হউক না কেন, সামান্য চেষ্টাতেই শ্রীরামকৃষ্ণের তাহা আয়ত্ত হইয়া যাইত। যে-সকল কঠিন প্রক্রিয়ায় সাফল্যলাভ করিতে অত্যন্ত উচ্চাধিকারী এবং অধ্যবসায়ী সাধকেরও মাস বর্ষ গত হইয়া যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ সেগুলি অবলীলাক্রমে কয়েক দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেন। মুগ্ধ বিস্ময়ে ভৈরবী চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেন এবং তাঁহার নিজের অন্তরে ভাবের বন্যা প্রবাহিত হইত। উমার বিদ্যাভ্যাসের বর্ণনাপ্রসঙ্গে কালিদাস লিখিয়াছেন যে, শরৎকালে গঙ্গায় যেমন দূরদূরান্তর হইতে হাঁসের শ্রেণী আপনা আপনি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া আসে, তেমনি সমুদয় বিদ্যা উমার নিকট আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এক্ষেত্রেও আমরা ঠিক তাহাই দেখিতে পাই। নানাবিধ সাধনপদ্ধতি শ্রীরামকৃষ্ণের যেন বহু পূর্ব হইতেই আয়ত্ত করা ছিল। সেই সমস্ত সিদ্ধি তাঁহার জীবনে প্রতিভাত হইবার জন্য শুধু যেন একটু ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতেছিল। যোগেশ্বরী ভৈরবী-ব্রাহ্মণী আসিয়া সেই ইঙ্গিতটুকু যোগাইবামাত্র এক অফুরন্ত বিকাশের পথ খুলিয়া গেল।

বিষ্ণুক্রান্তায় প্রচলিত চৌষট্টিখানা তন্ত্রের সমুদয় সাধন শ্রীরামকৃষ্ণ ন্যূনাধিক দুই বৎসরকালের মধ্যে সমাপ্ত করেন। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তান্ত্রিক সাধনার উপকরণ যে পঞ্চতত্ত্ব, সেগুলি স্থূলভাবে গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও অনুভব করেন নাই। 'কারণ' শব্দটি কানের ভিতরে প্রবেশ করিতেই তিনি জগৎ-কারণের উপলব্ধিতে তন্ময়

হইয়া যাইতেন *; 'যোনি' শব্দ শ্রবণমাত্র জগদ্‌যোনির উদ্দীপনায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। বীরাচারের সাধনসমূহও ভৈরবী তাহা দ্বারা সম্পন্ন করাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু যেহেতু তিনি দিব্যভাবে আরূঢ় ছিলেন এবং স্ত্রীলোকমাত্রকেই জগন্মাতার অংশ বলিয়া প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেন, অতএব ঐ সাধনার বিবিধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে তাঁহাকে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হয় নাই। বামাচারের প্রশংসা পরবর্তীকালে তিনি কখনও করিতেন না। বরঞ্চ শিষ্যদিগকে সর্বদা সাবধান করিয়া দিতেন, কেহ যেন বামাচারের পথে চলিতে চেষ্টা না করেন। †

শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট নিজের অধ্যাত্মবিদ্যার ঝুলি নিঃশেষে উজাড় করিয়া দিবার পরেও ভৈরবী-ব্রাহ্মণী কিন্তু দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন না। যাঁহার জন্য তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইয়াছিলেন, সেই মহাবস্তু কি এখানেই পাইয়া গেলেন?

ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণকে সাধন-পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াই যে ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে; শ্রীরামকৃষ্ণের অলোকসামান্যত্ব প্রচার করিতেও তিনি উদ্যোগী হইয়াছিলেন। প্রথমাবধিই তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ইনি অসামান্য ব্যক্তি—এমন কি, অবতার-পুরুষ। দক্ষিণেশ্বরে আসিবার অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তাঁহার এই ধারণা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মথুরবাবুর কানে প্রথম একথা পৌঁছিবার পর আপত্তির সুরে তিনি কহিয়াছিলেন যে, শাস্ত্রমতে অবতারের সংখ্যা ত মাত্র দশজন, অতএব শ্রীরামকৃষ্ণ কি করিয়া অবতার হইতে পারেন? ইহার উত্তরে ভৈরবী দেখাইয়া দিলেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতে চব্বিশজন অবতারের কথা বর্ণনা করিবার পর ব্যাসদেব শ্রীহরির আরও

* "কারণের বোতল একজন এনেছিল, আমি ছুঁতে গিয়ে আর পারলুম না। ···সহজানন্দ হলে অমনি নেশা হয়ে যায়। মদ খেতে হয় না। মার চরণামৃত দেখে নেশা হয়ে যায়। ঠিক যেমন পাঁচ বোতল মদ খেলে হয়।"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

† "কি জান? আমার ভাব মাতৃভাব, সন্তানভাব। মাতৃভাব অতি শুদ্ধভাব, এতে কোন বিপদ নাই। ভগ্নীভাব—এও মন্দ নয়। স্ত্রীভাব—বীরভাব বড় কঠিন। ···বড় কঠিন! ঠিক ভাব রাখা যায় না। নানা পথ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার। মত পথ। যেমন, কালীঘরে যেতে নানা পথ দিয়ে যাওয়া যায়। তবে কোন পথ শুদ্ধ, কোন পথ নোংরা; শুদ্ধ পথ দিয়ে যাওয়াই ভাল।" —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

অসংখ্যবার অবতরণের কথা বলিয়া গিয়াছেন। অধিকন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্রেও মহাপ্রভুর পুনরাগমনের কথা স্পষ্টভাবে লিখিত রহিয়াছে। ভৈরবী আরও কহিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর-মনে যে-সমস্ত লক্ষণ প্রকট, তাহাদের সহিত শ্রীচৈতন্যের সম্পর্কে বর্ণিত লক্ষণসমূহের বিশেষ মিল দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে আহ্বানপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলে এ-বিষয়ে সকল সন্দেহের নিরসন অনায়াসেই হইতে পারে। ভৈরবী-ব্রাহ্মণীর মুখে একথা শুনিয়া মথুরানাথের মনে বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণকে যদিও তিনি অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন, তবুও এতদিন তাঁহাকে তিনি মা-কালীর বিশেষ কৃপা-প্রাপ্ত একজন শ্রেষ্ঠ সাধক বলিয়াই জানিতেন, তাহার অধিক কিছু জ্ঞান করিতেন না। ভৈরবীর অভিমতের সত্যাসত্য-নিরূপণের জন্য তিনি সেই সময়কার দুইজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে দক্ষিণেশ্বরে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন—একজন ভক্তিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ, অপর ব্যক্তি তন্ত্রশাস্ত্রে পারদর্শী গৌরীকান্ত। তাঁহারা উভয়েই ভৈরবীর মত সমর্থনপূর্বক শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার-লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু পূর্বাপর এ-বিষয়ে নিতান্ত উদাসীন ছিলেন। ঈশ্বরচিন্তায় তিনি এরূপ নিমগ্ন এবং উচ্চতম আধ্যাত্মিক রাজ্যে পৌঁছিবার জন্য তিনি দিবারাত্র এরূপ যত্নবান থাকিতেন যে, তাঁহার সম্পর্কে কে কি বলে সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপমাত্র ছিল না। তাঁহার হৃদয় ছিল শিশুর ন্যায় সরল; বিন্দুমাত্র অহমিকা তাহাতে স্থান পাইত না।

ভৈরবী-ব্রাহ্মণীর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের যথার্থ মাহাত্ম্য গোপন ছিল বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ তাঁহাকে ঐশ্বরিক ভাবের পাগল বলিয়া মনে করিত, আবার অনেকে ভাবিত সাধারণ পাগল। ভৈরবী যখন শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ মহিমা ঘোষণা করিলেন, বস্তুতঃ তখন হইতেই ৺শ্রীশ্রীভবতারিণীর অদ্ভুত সেবকের নাম লোকমুখে প্রচারিত হইতে থাকে। বহু সাধুসন্ত এবং ধর্মপিপাসু ব্যক্তি ঐ সময় হইতেই দক্ষিণেশ্বরে আসিতে আরম্ভ করেন। মথুরানাথ উহাতে যারপরনাই প্রীত ও আনন্দিত হইয়া নিজেকে অশেষ ভাগ্যবান্ বলিয়া গণ্য করিতে লাগিলেন। মন্দিরের নিত্যপূজা এবং পালপার্বণ আরও খুব জমকালোভাবে সম্পন্ন হইতে লাগিল। ৺শ্রীশ্রীভবতারিণীর ও শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনার্থী লোকদের

যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয়, সেই উদ্দেশ্যে অতিথিশালার ব্যয়ের বরাদ্দ তিনি পূর্বাপেক্ষা বাড়াইয়া দিলেন। 'অন্নকূট' উৎসব করিয়া একবার খুব দানদক্ষিণা করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশক্রমে অপর কোনও উপলক্ষ্যে সাধুদের মধ্যে প্রচুর বস্ত্র, কম্বল ও কমণ্ডলু বিলাইয়া দিলেন। এইভাবে দক্ষিণেশ্বরে আনন্দের হাট দিন দিন খুব জমিয়া উঠিতে লাগিল।

বিভিন্ন প্রণালীর তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াই যে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধ পূর্ণ হইল এবং তিনি তপস্যা ছাড়িয়া দিলেন, তাহা নহে। পরবর্তীকালে তিনি বলিতেন যে, সাধনভজনের ব্যাপারেও সানাইয়ের পোঁ ধরিয়া থাকার ন্যায় একঘেয়ে অনুশীলন তাঁহার একেবারেই ভাল লাগিত না। নানা রকম যন্ত্র, নানা রাগরাগিণী বাজিবে, তবে ত আসর জমিবে এবং আনন্দের মাত্রা পূর্ণ হইবে! অবশ্য এই কথা শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় ঈশ্বরকোটির পক্ষেই বলা সম্ভব এবং শোভন। অপরের পক্ষে এরূপ উক্তি বাতুলতার পরিচায়ক ভিন্ন আর কি হইতে পারে? সাধারণ মানব একটিমাত্র ভাব অবলম্বন করিয়া তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিলেই নিজেকে ধন্য মনে করে; নানা ভাবের সাধনায় সিদ্ধিলাভ তাহার পক্ষে কল্পনার অতীত। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। "আমার ভাব কি জান? আমি মাছ সব রকম খেতে ভালবাসি। আমার মেয়েলি স্বভাব (সকলের হাস্য)। আমি মাছ ভাজা, হলুদ দিয়ে মাছ, টকের মাছ, বাটি-চচ্চড়ি—এ সব তা'তেই আছি। আবার মুড়িঘণ্টোতেও আছি, কালিয়া-পোলোয়াতেও আছি (সকলের হাস্য)।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত)

তান্ত্রিক সাধনা-সমাপনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় বৈষ্ণব সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। শান্ত, দাস্য ও সখ্য ভাবের সাধনা পূর্বেই করিয়াছিলেন; বাকী ছিল শুধু বাৎসল্য ও মধুর ভাবের সাধনা। এই দুই ভাবের সাধনায় তিনি যে এবারে উদ্যোগী হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? পূর্বেই একথা বলা হইয়াছে যে, ভৈরবী শাক্ত এবং বৈষ্ণব, উভয় প্রকার সাধন-প্রণালীতেই সিদ্ধা ছিলেন। সুতরাং অনুমিত হয় যে, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের সাধনায় তিনিও শ্রীরামকৃষ্ণকে উৎসাহিত করিয়া থাকিবেন। অধিকন্তু বাৎসল্যভাবের সাধনার এক উত্তম সুযোগ ঐ সময়ে দৈবক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

তখনকার দিনে ৺গঙ্গাসাগরতীর্থ ও ৺পুরীধাম-যাত্রী সাধুসন্ন্যাসীরা

ভাগীরথীর তীর ধরিয়া যাতায়াত করিতেন। যেহেতু দক্ষিণেশ্বরে সাধুসেবার উত্তম বন্দোবস্ত ছিল, অতএব পরিব্রাজক তীর্থযাত্রীদের মধ্যে অনেকেই সেখানে অতিথি হইতেন এবং কেহ কেহ বা দুই-চারিদিন সেখানে থাকিয়া বিশ্রাম করিতেন। ৺শ্রীশ্রীভবতারিণীর মহিমা এবং তাঁহার অদ্ভুত পূজারীর খ্যাতিও আবার অনেককে আকৃষ্ট করিত। 'জটাধারী' নামক জনৈক রামায়েৎ সাধু ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কিংবা তাহার নিকটবর্তী সময়ে সম্ভবতঃ ঐরকম কোন সূত্রেই আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিল 'রামলালা' নামক বিগ্রহ—বালক রামচন্দ্রের ক্ষুদ্র একটি পিতলের মূর্তি। সেই মূর্তিকে সাক্ষাৎ কৌশল্যাতনয় জ্ঞানে জটাধারী অষ্টপ্রহর উঁহার সেবাযত্নে ব্যাপৃত থাকিতেন। আর শুধু সেবাযত্ন নহে—খেলা-ধূলা, হাসি-ঠাট্টা, মান-অভিমান সব কিছুই তিনি রামলালার সহিত করিতেন। রামলালা ব্যতীত সংসারে তাঁহার আর কোন চিন্তা কিংবা আকর্ষণের বস্তু ছিল না। বালক শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বাৎসল্যরসে জটাধারীর মন একেবারে অভিষিক্ত ছিল। বিগ্রহের মধ্যে বালক রামচন্দ্রকে তিনি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেন।

জটাধারীকে দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, ইনি যেমন-তেমন সাধু নহেন—শ্রীরামচন্দ্রের বিশেষ কৃপালাভে ইঁহার জীবন ধন্য হইয়াছে। রামলালা এবং জটাধারীর মধ্যে যে অলৌকিক লীলাখেলা চলিত, অপরের তাহা নয়ন-গোচর হইত না; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের তাহা অগোচর রহিল না। অপর পক্ষে জটাধারীও দেখিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদা ভগবৎপ্রেমে বিভোর। তাই যে-কথা সাধারণ লোকের নিকট কখনও প্রকাশ করেন নাই,—রামলালার প্রতি তাঁহার সেই নিবিড় ভালবাসার কথা—শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট সহজেই খুলিয়া বলিলেন। ঐ সকল কথা শুনিয়া রামলালা এবং তাঁহার ভক্তটির প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের মনে বড়ই কৌতূহল ও অনুরাগের সঞ্চার হইল। বালক-কাল হইতেই তিনি শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত। আশৈশব বাড়ীতে ৺শ্রীশ্রীরঘুবীরের সেবাপূজা দেখিয়াছিলেন এবং উপনয়নের পরে নিজেও অনেক দিন পর্যন্ত রঘুবীরের সেবাপূজা করিয়াছিলেন। সাধক-জীবনে ইতঃপূর্বে দাস্যভাব অবলম্বনপূর্বক শ্রীরামচন্দ্রের এবং জনক-নন্দিনীর সাক্ষাৎ দর্শনও তিনি পাইয়াছিলেন। এবারে জটাধারীর সংসর্গে তাঁহার মন বাৎসল্যভাবে ভাবিত হইল।

জটাধারীর নিকট গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণপূর্বক অত্যল্পকালমধ্যেই বাৎসল্যভাবের সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিলেন। একটি আশ্চর্য ব্যাপারও ঘটিল। রামলালা যেন জটাধারীকে ছাড়িয়া ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেদিকে যান, দেখিতে পান রামলালা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন। জটাধারীর ন্যায় তিনিও 'রামলালা'কে আপন সন্তানজ্ঞানে তাঁহার প্রতি লালন, পালন, তাড়ন, ভৎর্সন প্রভৃতি সবরকম ব্যবহারই আরম্ভ করিয়া দিলেন। এমন কি, রামলালার বালকসুলভ চাপল্যে বিরক্ত হইয়া তিনি দুই-একদিন তাঁহাকে এমন কঠোর শাসন করিলেন যে, এজন্য পরিশেষে অনুতপ্ত হইতে হইল। এই রকম করিয়া তিনজনের ভাব যখন খুব জমিয়া উঠিয়াছে, তখন জটাধারী একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসিয়া বাষ্পাকুললোচনে ও হর্ষবিষাদ-মিশ্রিত স্বরে নিবেদন করিলেন, "রামলালা তাঁর অপার করুণায় আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন। যেরূপে আমি তাঁকে দেখতে চেয়েছিলাম, সেই রূপেই তিনি আমাকে দর্শন দিয়েছেন। একথাও তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, তোমাকে ছেড়ে তিনি অন্যত্র যেতে ইচ্ছা করেন না। তাঁকে তোমার নিকট রেখে এখন আমি হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করতে চাই। তাই বিদায় নিতে এসেছি। তিনি তোমার নিকট পরম সুখে থাকবেন—এতেই আমার আনন্দ।" এই কথা বলিয়া জটাধারী চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। রামলালা দক্ষিণেশ্বরেই রহিয়া গেলেন। *

প্রভু, সখা, মাতা-পিতা প্রভৃতি মায়িক সম্পর্ক ভগবানের সহিত স্থাপন করিয়া ক্রমশঃ তাঁহার নিকটবর্তী হওয়াই বৈষ্ণব মতানুযায়ী বিবিধ সাধন-প্রণালীর উদ্দেশ্য। যদিও প্রত্যেক ভাবের সাধনাতেই পরিণামে ভগবানকে লাভ করা যায়, তথাপি সাধক ও শাস্ত্রকারদিগের দৃষ্টিতে সকল পন্থাই একেবারে সমান বলিয়া বিবেচিত হয় না। ভগবানের প্রতি ঘনিষ্ঠতা যাহাতে যত অধিক মাত্রায় বিদ্যমান, তদনুযায়ী বিভিন্ন সাধনপ্রণালীর তারতম্য করা হয়। এই বিচারে মধুর ভাবের সাধনা যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না; শান্ত ও দাস্য-ভাবের সাধনায় ভগবানের প্রতি সম্ভ্রমের ভাবই প্রবল। সখ্যভাবে সম্ভ্রমের ভাব কমিয়া গিয়া মেলামেশার ভাব প্রাধান্যলাভ করে। বাৎসল্যভাবে প্রেমাস্পদের সহিত ঘনিষ্ঠতা আরও অধিক। কিন্তু মধুরভাবেই

* রামলালার বিগ্রহ ৺শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরে রক্ষিত আছে।

ঘনিষ্ঠতার পরাকাষ্ঠা। অধিকন্তু নায়কের প্রতি নায়িকার যে প্রেম, তাহাতে মধুর ভাব ত থাকেই, তা ছাড়া অপর চারি ভাবও অল্পবিস্তর বিদ্যমান থাকে। নায়িকা নায়ককে গুরুজনজ্ঞানে শ্রদ্ধা করে, ভৃত্যের ন্যায় সেবা করে, সখার ন্যায় তাঁহার সুখদুঃখের অংশ গ্রহণ করে, মাতার ন্যায় যত্ন করে, আবার নায়কের প্রতি নিজের দেহ, মন, প্রাণ সব কিছু উৎসর্গ করিয়া দেয়। নায়কের সুখই তাহার একমাত্র কাম্য; নিজের জন্য সে কিছুই চাহে না। এজন্যই শ্রীরাধার প্রেমের এত মহিমা। এই প্রেমের লক্ষণ, ক্রমবিকাশ প্রভৃতি বিশদ্‌ভাবে বৈষ্ণব-শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর জীবনে সেই প্রেমের বাস্তব রূপ এবং প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কখন 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' বলিয়া বিলাপ করিতেছেন, বিরহানলে দগ্ধ হইতেছেন, কিংবা অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইতেছেন, আবার কখনও মিলনানন্দে গর্গর মাতোয়ারা কিংবা জড়প্রায় সমাধিমগ্ন!

মধুর ভাবের সাধনায় ব্রতী হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে ঠিক প্রকৃতির ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বভাবই ছিল এই যে যখন যে-ভাব অবলম্বন করিতেন তাহাতেই ষোল-আনা মনপ্রাণ ঢালিয়া দিতেন এবং বাহিরেও তদ্রূপ আচরণ করিতেন। নিজেকে যখন শ্রীকৃষ্ণের নায়িকাজ্ঞানে সাধনা আরম্ভ করিলেন, তখন দিবারাত্র সেই ভাবেই বিভোর; নিজের পুরুষবুদ্ধি একেবারে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। কিছুকাল ঐভাবে অতিবাহিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শনলাভের পর পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন।* পরবর্তী জীবনে প্রেমের কথা বলিতে গেলেই তিনি শ্রীরাধা ও শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমের মহিমা গভীর আবেগের সহিত বর্ণনা করিতেন। "তোমরা প্যাম্ প্যাম্ কর, কিন্তু প্রেম কি সামান্য জিনিস গা? চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল। প্রেমের দুইটি লক্ষণ। প্রথম—জগৎ ভুল হয়ে যাবে। এত ঈশ্বরেতে ভালবাসা যে বাহ্যশূন্য! চৈতন্যদেব 'বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে, সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে।' দ্বিতীয় লক্ষণ—নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, এর উপরও মমতা থাকবে না; দেহাত্মবোধ একেবারে চলে যাবে।" রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক কীর্তন গাহিতে গাহিতে কিংবা শুনিতে শুনিতে তিনি সহজেই

---

* শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার মূল সুর—সন্তানভাবে জগজ্জননীর উপাসনা, একান্তভাবে তাঁহার ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ। পূর্বাপর তাঁহার জীবন এই নির্ভরশীলতার উদাহরণ।

সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। তাঁহার একটি অতি প্রিয় সঙ্গীত ছিল 'রাধার দেখা কি পায় সকলে, রাধার প্রেম কি পায় সকলে। অতি সুদুর্লভ ধন—না করলে আরাধন, সাধন বিনে সে ধন এ ধনে কি মিলে।'

বৈষ্ণব সাধনা দ্বৈতভাবের সাধনা। কিন্তু মধুরভাবের সাধনা বস্তুতঃ অদ্বৈত-ভাবের দিকেই লইয়া যায়। পুরুষ যদি ষোল-আনা নায়িকার ভাব গ্রহণ করিতে পারে, তবে তাহার পুরুষবুদ্ধি চলিয়া যায়, অর্থাৎ সে যে পুরুষ সেই জ্ঞান আর থাকে না। যাহা প্রত্যক্ষ এবং যে সংস্কার জন্মাবধি দৃঢ়মূল, তাহা এভাবে দূর করিতে পারিলে, তৎপরে কল্পনার সাহায্যে আরোপিত স্ত্রীবুদ্ধি দূরে ছুঁড়িয়া ফেলা কঠিন কাজ হইতে পারে না। আত্মা যে পুরুষও নয়, স্ত্রীও নয়, "নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত"—এই ধারণা তখন সুস্পষ্ট ও বদ্ধমূল হয়। এ যেন কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা।

দ্বিতীয়তঃ, সগুণ ও নির্গুণ ঈশ্বরবাদের একমাত্র সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় শুধু গোপীপ্রেমে। এ যেন উভয়ের মিলনভূমি। স্বামী বিবেকানন্দ এ-বিষয়টি খুব স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "আমরা জানি-মানুষ সগুণ ঈশ্বর হইতে উচ্চতর ধারণা করিতে অক্ষম। আমরা ইহাও জানি, দার্শনিক দৃষ্টিতে সমগ্র জগদ্ব্যাপী—সমগ্র জগৎ যাঁহার বিকাশমাত্র—সেই নির্গুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসই স্বাভাবিক। এদিকে আমাদের প্রাণ একটা সাকার বস্তু চায়, এমন বস্তু চায়, যাহা আমরা ধরিতে পারি, যাঁহার পাদপদ্মে প্রাণ ঢালিয়া দিতে পারি। সুতরাং সগুণ ঈশ্বরই মানব-স্বভাবের চূড়ান্ত ধারণা। কিন্তু যুক্তি এই ধারণায় সন্তুষ্ট হইতে পারে না। এই সেই অতি প্রাচীন, প্রাচীনতম সমস্যা—যাহা ব্রহ্মসূত্রে বিচারিত হইয়াছে, যাহা লইয়া বনবাসকালে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের সহিত বিচার করিয়াছিলেন—যদি একজন সগুণ, সম্পূর্ণ দয়াময়, সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর থাকেন, তবে এ নরকবৎ সংসারের অস্তিত্ব কেন? কেন তিনি ইহা সৃষ্টি করিলেন? তাঁহাকে একজন মহাপক্ষপাতী ঈশ্বর বলিতে হইবে। ইহার কোনরূপ মীমাংসাই হয় নাই; কেবল গোপীপ্রেম সম্পর্কে শাস্ত্রে যাহা পড়িয়া থাক, তাহাতেই ইহার মীমাংসা হইয়াছে। কৃষ্ণের প্রতি কোন বিশেষণ প্রয়োগ করিতে তাহারা চাহিত না; তিনি যে সৃষ্টিকর্তা, তিনি যে সর্বশক্তিমান্, তাহা তাহারা জানিতে চাহিত না। তাহারা কেবল বুঝিত তিনি প্রেমময়; ইহাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট।...গোপীপ্রেমে ঈশ্বর-রসাস্বাদের উন্মত্ততা, ঘোর

প্রেমোন্মত্ততা মাত্র বিদ্যমান; এখানে গুরু, শিষ্য, শাস্ত্র, উপদেশ, ঈশ্বর, স্বর্গ সব একাকার; ভয়ের ধর্মের চিহ্নমাত্র নাই, সব গিয়াছে, আছে কেবল প্রেমোন্মত্ততা। তখন সংসারের আর কিছু মনে থাকে না, ভক্ত তখন সংসারে সেই কৃষ্ণ, একমাত্র সেই কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না, তখন তিনি সর্ব-প্রাণীতে কৃষ্ণ দর্শন করেন, তাঁহার নিজের মুখ পর্যন্ত তখন কৃষ্ণের ন্যায় দেখায়, তাঁহার আত্মা তখন কৃষ্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া যায়।"

মধুরভাবে সাধনা প্রেমবলে একত্বানুভূতিরই সাধনা। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, মধুরভাবের সাধনার দ্বারা সাযুজ্যলাভের ঠিক পরেই তিনি বেদান্তোক্ত অদ্বৈতসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবমতোক্ত পঞ্চ-ভাবের সাধনাকে যদি একটি সোপানশ্রেণীরূপে কল্পনা করি, তবে মধুরভাবের সাধনা উহার শেষ ধাপ। আর সেখান হইতে অদ্বৈতানুভূতির স্তরে আরোহণ করা খুবই স্বাভাবিক এবং সহজ। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, মধুরভাবের সাধনা সমাপ্ত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতসাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।
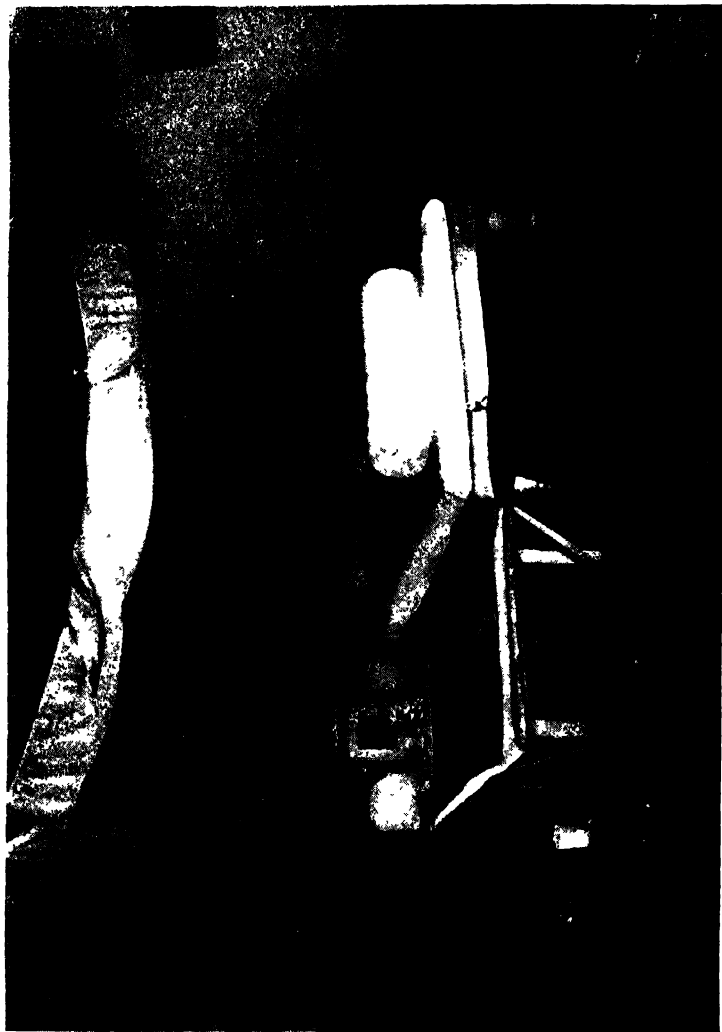
দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহাভ্যন্তর

সাধক-জীবন

৩

অদ্বৈত-সাধন ঃ ইস্‌লাম ও খ্রীষ্টধর্মের সাধন

বেদান্তদর্শনের সারকথা "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" ; নামরূপাত্মক জগতের সব কিছুই নিয়ত পরিবর্তনশীল—অসৎ ; ব্রহ্মই একমাত্র চিরন্তন সৎ বস্তু। কিন্তু একথা শুধু কানে শুনিলে, বইয়ে পড়িলে, অথবা নানা যুক্তি-সহায়ে বিচার করিলেই ধারণা হইয়া যায় না। শাস্ত্র বলেন যে, এই দুরূহ তত্ত্বের উপলব্ধির জন্য চাই কঠোর সাধনা। সংযম এবং অভ্যাসের ফলে যখন সাধকের মন হইতে ভোগবাসনা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয়, অন্তরে বিবেকবৈরাগ্য সদা জাগরূক থাকে—মুক্তির জন্য প্রাণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখনই শুধু ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সম্ভাবনা জন্মে। বৈদান্তিক সাধনার শেষ সোপান নির্বিকল্প সমাধি। সেই অবস্থাতেই অদ্বৈততত্ত্বের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়,—দেশ, কাল, নিমিত্ত এবং নামরূপের অতীত পূর্ণব্রহ্মের সাক্ষাৎ উপলব্ধি ঘটে। সেই জ্ঞান বাক্য-মনের অতীত ; শাস্ত্র এবং মহাপুরুষেরা বলেন যে, ভাষায় উহা প্রকাশ করা যায় না। * সেখানে পৌঁছিলে গুরু-শিষ্য, উপাস্য-উপাসকের ভেদ পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। †

'অদ্বৈতজ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান'—একথা ভারতভূমিতে চিরকাল কীর্তিত হইয়া আসিয়াছে। সেই জ্ঞানলাভের পথ যে কত কঠিন এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবার

---

* "ব্রহ্ম কি, তা মুখে বলা যায় না। যা'র হয় সে খবর দিতে পারে না। একটা কথা আছে, কালাপানিতে গেলে জাহাজ আর ফেরে না। চার বন্ধু ভ্রমণ করতে করতে পাঁচিলে-ঘেরা একটা জায়গা দেখতে পেলে। খুব উঁচু পাঁচিল। ভিতরে কি আছে দেখবার জন্য সকলে বড় উৎসুক হল। পাঁচিল বেয়ে একজন উঠলো। উঁকি মেরে যা দেখলে তাতে অবাক্ হয়ে হা হা হা হা বলে ভিতরে পড়ে গেল। আর কোন খবর দিলে না। যেই উঠে, সেই হা হা করে পড়ে যায়। তখন খবর আর কে দেবে?" —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

† "শুকদেব ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য জনকের কাছে গিয়েছিল। জনক বললে—আগে দক্ষিণা দাও। শুকদেব বললে—আগে উপদেশ না পেলে কি করে দক্ষিণা হয়? জনক হাসতে হাসতে বললে—তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হলে আর কি গুরু-শিষ্যবোধ থাকবে? তাই আগে দক্ষিণার কথা বললাম।" —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

পূর্বে কত যে দুস্তর বাধা অতিক্রম করিতে হয়, তাহার যৎসামান্ত আভাস শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের কথায়ই এখানে দেওয়া হইতেছে। "বেদে ব্রহ্মজ্ঞানীর নানারকম অবস্থার বর্ণনা আছে। জ্ঞানপথ বড় কঠিন পথ। বিষয়বুদ্ধির—কামিনীকাঞ্চনে আসক্তির লেশমাত্র থাকতে জ্ঞান হয় না। ...এই সম্বন্ধে বেদে সপ্তভূমির কথা আছে। এই সাত ভূমি মনের স্থান। যখন সংসারে মন থাকে, তখন লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভি মনের বাসস্থান। মনের তখন উর্দ্ধদৃষ্টি থাকে না—কেবল কামিনীকাঞ্চনে মন থাকে! মনের চতুর্থ ভূমি হৃদয়। তখন প্রথম চৈতন্য হয়েছে। আর চারিদিকে জ্যোতিঃদর্শন হয়। তখন সে-ব্যক্তি ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ দেখে অবাক্ হয়ে বলে—এ কি, এ কি! তখন আর নীচের দিকে (সংসারের দিকে) মন যায় না।

"মনের পঞ্চম ভূমি কণ্ঠ। মন যার কণ্ঠে উঠেছে, তার অবিদ্যা অজ্ঞান সব গিয়ে, ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোন কথা শুনতে বা বলতে ভাল লাগে না। যদি কেউ অন্য কথা বলে, সেখান থেকে উঠে যায়।

"মনের ষষ্ঠ ভূমি কপাল। মন সেখানে গেলে অহর্নিশ ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। তখনও একটু 'আমি' থাকে। সে-ব্যক্তি সেই নিরূপম রূপ দর্শন করে উন্মত্ত হয়ে, সেই রূপকে স্পর্শ আর আলিঙ্গন করতে যায়, কিন্তু পারে না। যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো, মনে হয়, এই আলো ছুঁলাম ছুঁলাম; কিন্তু কাচ-ব্যবধান আছে বলে ছুঁতে পারা যায় না।

"শিরোদেশ সপ্তম ভূমি। সেখানে মন গেলে সমাধি হয় ও ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। কিন্তু সে অবস্থায় শরীর অধিক দিন থাকে না।" *

মধুরভাবের সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর শ্রীরামকৃষ্ণকে অদ্বৈতসাধনায় ব্রতী করাইবার জন্যই যেন ভগবৎপ্রেরিতের ন্যায় এক অত্যাশ্চর্য জীবন্মুক্ত সন্ন্যাসী ঠিক ঐ সময়ে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উঁহার নাম পরিব্রাজকাচার্য পরমহংস শ্রীমৎ তোতাপুরী। উক্ত মহাপুরুষের জীবনকথা সম্পর্কে শুধু এইটুকু জানা যায় যে, পূর্ব-পাঞ্জাবের কোনও পল্লীগ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। শৈশবাবধিই মনে বৈরাগ্যভাব প্রবল থাকায় কৈশোরে গৃহত্যাগ করিয়া তিনি নাগা-সন্ন্যাসীদের দলে ভর্তি হইয়াছিলেন। নর্মদাতীরে কোনও নির্জন স্থানে সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরব্যাপী সাধনার অন্তে তিনি নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা লাভ

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

করেন। স্বীয় গুরুর দেহত্যাগের পর তিনি সম্প্রদায়ের মোহান্ত নির্বাচিত হন। কুরুক্ষেত্রের সন্নিকটে লাদানা নামক স্থানে শ্রীমৎ তোতাপুরীর মঠ ছিল।

পরিব্রাজকবেশে নানা তীর্থে বিচরণ করিতে করিতে তোতাপুরী ৺গঙ্গাসাগর পর্যন্ত গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিবার পথে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন সম্ভবতঃ ১২৭১ বঙ্গাব্দের (১৮৬৫ খৃঃ) শেষ ভাগ। তাঁহার ঋজু, উন্নত ও বলিষ্ঠ দেহ এবং উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয় দেখিলেই দর্শকের তৎক্ষণাৎ ধারণা জন্মিত যে, ইনি সাধারণ ব্যক্তি নহেন—পুরুষসিংহ। তোতাপুরী যখন দক্ষিণেশ্বর-ঘাটের চাঁদনী হইতে মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন ফটকের পার্শ্বে উপবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িতেই তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবোজ্জ্বল বদনমণ্ডল এবং শারীরিক লক্ষণ দেখিয়াই তোতাপুরীর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, এ ব্যক্তি যোগমার্গে বহুদূর অগ্রসর। এমন উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া তিনি সরাসরি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমাকে উত্তম অধিকারী বলে বোধ হচ্ছে; তুমি কি বেদান্ত-সাধন করবে?" শ্রীরামকৃষ্ণ শান্তভাবে উত্তর দিলেন, "মাকে (৺ভবতারিণীকে) জিজ্ঞেস না করে আমি কিছুই বলতে পারি না; তিনি যেমন চালান, আমি তেমনি চলি। তিনি যদি অনুমতি দেন, তবেই আপনার প্রস্তাবে রাজী হতে পারি।" সন্ন্যাসী কহিলেন—"বেশ, তাই হ'ক। তোমার মাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও। আমি এখানে বেশীদিন থাকব না।" শ্রীমৎ তোতাপুরীর কথানুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণ কালীমন্দিরে গিয়া অল্পক্ষণ পরেই ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, মায়ের অনুমতি হইয়াছে, বেদান্ত-সাধনের নিমিত্ত তিনি প্রস্তুত।

শ্রীমৎ তোতাপুরী ছিলেন ঘোর অদ্বৈতবাদী, শক্তিপূজায় তাঁহার বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না; কারণ, শক্তি ত অলীক মায়া! শ্রীরামকৃষ্ণকে ৺ভবতারিণীর উপর একান্ত নির্ভরশীল দেখিয়া তাঁহার মনে মনে হাসি পাইল; কিন্তু বাহিরে তিনি কিছুই প্রকাশ করিলেন না,—ভাবিলেন, অদ্বৈতসাধনার পথে কিছুদূর অগ্রসর হইলে পর অর্বাচীন শিষ্যের এই অজ্ঞ সংস্কার আপনা হইতে দূর হইয়া যাইবে।

তোতাপুরীজী শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিলেন যে, বেদান্তমত-সাধন করিতে হইলে

আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাসগ্রহণ নিতান্ত আবশ্যক। শ্রীরামকৃষ্ণের তাহাতে আপত্তি ছিল না; কিন্তু তিনি কহিলেন যে, কাজটি গোপনে সম্পন্ন করিতে হইবে। এই অনুরোধের একটি বিশেষ কারণ ছিল। কিছুদিন পূর্বে চন্দ্রাদেবী দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন। জীবনের শেষ কয়দিন গঙ্গাতীরে এবং প্রাণাধিক পুত্র গদাধরের নিকটেই অতিবাহিত করিবেন—উহাই ছিল তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে আগমনের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ জননীকে অতিশয় ভালবাসিতেন ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। তাই, মথুরবাবুকে বলিয়া তাঁহার থাকিবার সমস্ত ব্যবস্থা করাইয়া দিয়াছিলেন। মথুরানাথ চন্দ্রাদেবীকে আপন পিতামহীর ন্যায় জ্ঞান করিতেন এবং তাঁহার সরলতায় ও লোভশূন্যতায় একেবারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।* যাহাতে জননীর প্রাণে আঘাত লাগিতে পারে, এমন কিছু করিতে শ্রীরামকৃষ্ণের মনে প্রবৃত্তি ছিল না। পুত্রকে মুণ্ডিতমস্তক ও গৈরিক-পরিহিত দেখিলে মায়ের মনে দারুণ কষ্ট হইবে, এই আশঙ্কায়ই তিনি প্রকাশ্যে

---

* নিজের অবিদ্যমানে অথবা অবস্থার পরিবর্তনে যাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভরণ-পোষণের কোন কষ্ট না হয়, তদুদ্দেশ্যে কিছু ধনসম্পত্তি পৃথক্ করিয়া দিবার ইচ্ছা মথুরবাবু অনেকদিন যাবৎ মনে পোষণ করিতেছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের বিরাগ-ভয়ে মুখ ফুটিয়া কখনও বলিতে সাহস পাইতেন না। একবার শ্রীরামকৃষ্ণের নামে একখানা তালুক গোপনে লিখিয়া দিবার পরামর্শ করিতে যাইয়া ধরা পড়িয়া যান। বিষয়টি শ্রীরামকৃষ্ণের কর্ণগোচর হইবামাত্র তীব্র ভর্ৎসনাবাক্য-প্রয়োগের দ্বারা তিনি মথুরকে নিরস্ত করেন। চন্দ্রাদেবীর আগমনের পর মথুর ভাবিলেন, এবারে সুযোগ উপস্থিত—সম্পত্তিগ্রহণে বৃদ্ধাকে অবশ্যই রাজী করানো যাইবে। অল্পকালের মধ্যেই গভীর স্নেহবন্ধনে চন্দ্রাদেবীর সহিত নিজেকে আবদ্ধ করিয়া কথাবার্তাচ্ছলে একদিন তাঁহাকে বলিলেন—"ঠাকুরমা! তুমি ত আমার নিকট কখনও কিছু চাইলে না! যদি তুমি আমাকে আপন-জন বলে মনে কর, তবে তোমার ইচ্ছামত যা হোক কিছু চেয়ে নাও। নইলে বুঝব, তুমি আমাকে পর ভাব।" অকস্মাৎ এই অনুরোধবাক্য শুনিয়া চন্দ্রাদেবী বড়ই বিব্রত বোধ করিলেন। টাকাকড়ি, বিষয়সম্পত্তি প্রভৃতিতে তাঁহার কোনই আসক্তি ছিল না; কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। অবশেষে কহিলেন—'বাবা, তোমার কল্যাণে খাওয়া-পরার ত কোন কষ্টই এখানে নাই; সকল ব্যবস্থাই তুমি করে দিয়েছ, কিছুই বাকী রাখনি; কি আর চাইব বল?" কিন্তু মথুরবাবু ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি বারংবার অনুরোধ করাতে বৃদ্ধা শেষে হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"যদি নেহাৎ দেবে, আমার মুখে দেবার গুলের অভাব, এক আনার দোক্তাতামাক আনিয়ে দাও।" এই উক্তি শুনিয়া মথুরের চোখে জল আসিল। তিনি চন্দ্রাদেবীর পায়ে মাথা ঠেকাইয়া কহিলেন—"এমন মা না হলে কি অমন ছেলে হয়!"

সন্ন্যাসগ্রহণে ও সন্ন্যাসের বাহ্য চিহ্নধারণে আপত্তি করিয়াছিলেন। শ্রীমৎ তোতাপুরী উহা বুঝিতে পারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের প্রস্তাবেই রাজী হইলেন এবং সন্ন্যাসদীক্ষা-প্রদানের জন্য দিন নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

শ্রীমৎ তোতাপুরীর আগমনকালে ভৈরবী-ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরেই অবস্থান করিতেছিলেন। আরও প্রায় আড়াই বৎসরকাল পরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তিনি স্বয়ং প্রধানতঃ বীরভাবের সাধিকা হইলেও বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত বিবিধ সাধনপ্রণালীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং তৎসমুদায়ের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগও ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের মধুরভাব-সাধনকালে ভৈরবী বস্তুতঃ তাঁহাকে উৎসাহ ও সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে বৈদান্তিক মতে অদ্বৈতভাবের সাধনায় প্রবৃত্ত দেখিয়া ভৈরবীর মনে শঙ্কা উপস্থিত হইল। তাঁহাকে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত তিনি কহিলেন, "বাবা, ওঁর কাছে বেশী যাওয়া-আসা করো না, বেশী মেশামিশি করো না; ওঁদের সব শুষ্ক পথ। ওঁর সঙ্গে মিশলে তোমার ঈশ্বরীয় ভাবপ্রেম সব নষ্ট হয়ে যাবে।" কিন্তু জগন্মাতার নির্দেশ পাইয়াছেন বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ উহাতে কর্ণপাত করিলেন না।

নির্ধারিত শুভদিনে পঞ্চবটীর সাধন-কুটীরে শ্রীমৎ তোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণকে সন্ন্যাসদীক্ষা প্রদান করিলেন। দীক্ষাদানকার্য লোক-চক্ষুর অন্তরালেই সম্পন্ন হইয়াছিল; গুরু এবং শিষ্য ব্যতীত অপর তৃতীয় ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু এ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ পরবর্তীকালে আপন শিষ্যদের নিকট যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদের অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। উক্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, গুরুসকাশাৎ ব্রহ্মোপদেশ লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নির্বিকল্প সমাধির রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ব্যাপারটি নিম্নলিখিত-রূপ বর্ণিত আছে :

বিরজা হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠান শেষ হইবার পর ব্রহ্মজ্ঞ গুরু 'নেতি নেতি' বিচারের দ্বারা শিষ্যকে ব্রহ্মস্বরূপোপলব্ধির দিকে লইয়া যাইতে উদ্যোগী হইলেন। ব্রহ্মজ্ঞানাত্মক বেদান্তবাক্যাবলীর পুনরাবৃত্তি করিয়া গুরুগম্ভীর অথচ আবেগপূর্ণ কণ্ঠে শ্রীমৎ তোতাপুরী শিষ্যের প্রতি কহিতে লাগিলেন—"নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাব দেশকালাদিদ্বারা সর্বদা অপরিচ্ছন্ন একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই নিত্যসত্য। অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া নিজ প্রভাবে তাঁহাকে নামরূপের দ্বারা খণ্ডিতবৎ

প্রতীয়মান করাইলেও তিনি কখনো বাস্তবিক ঐরূপ নহেন। কারণ, সমাধিকালে মায়াজনিত দেশকাল বা নামরূপের বিন্দুমাত্র উপলব্ধি হয় না। অতএব নামরূপের সীমার মধ্যে যাহা কিছু অবস্থিত, তাহা কখনও নিত্যবস্তু হইতে পারে না; তাহাকে দূরে পরিহার কর। নামরূপের দৃঢ় পিঞ্জর সিংহবিক্রমে ভেদ করিয়া নির্গত হও। আপনাতে অবস্থিত আত্মতত্ত্বের অন্বেষণে ডুবিয়া যাও। সমাধিসহায়ে তাহাতে অবস্থান কর; দেখিবে, নামরূপাত্মক জগৎ তখন কোথায় লুপ্ত হইবে, ক্ষুদ্র 'আমি'-জ্ঞান বিরাটে লীন ও শুদ্ধীভূত হইবে এবং অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে নিজ স্বরূপ বলিয়া সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিবে।

"যে জ্ঞান অবলম্বনে এক ব্যক্তি অপরকে দেখে, জানে, বা অপরের কথা শুনে, তাহা অল্প অর্থাৎ ক্ষুদ্র; যাহা অল্প, তাহা তুচ্ছ—তাহাতে পরমানন্দ নাই; কিন্তু যে জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া এক ব্যক্তি অপরকে দেখে না, জানে না, বা অপরের বাণী ইন্দ্রিয়গোচর করে না—তাহাই ভূমা অর্থাৎ মহান্, তৎসহায়ে পরমানন্দে অবস্থিতি হয়। যিনি সর্বদা সকলের অন্তরে বিজ্ঞাতারূপে রহিয়াছেন, কোন্ মনবুদ্ধি তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হইবে?"

এই সকল বেদান্তবাক্য উচ্চারণ করিয়া তোতাপুরী শিষ্যকে বলিলেন—"এবারে নামরূপের অতীত পরব্রহ্মে মন লীন কর।" গুরুর নির্দেশানুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণ সমগ্র জগৎ মন হইতে মুছিয়া ফেলিলেন, কিন্তু বরাভয়করা জগজ্জননীর মূর্তি কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। গুরুকে বলিলেন—"বৃথা চেষ্টা, নির্গুণ ব্রহ্মে পৌছানো আমার পক্ষে অসম্ভব।" তোতাপুরী উহাতে উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "কি, পার না? তোমাকে এ করতেই হবে।" কুটীরের চারিদিক খুঁজিয়া এক টুকরা ভাঙ্গা কাচ তিনি কুড়াইয়া আনিলেন এবং উহার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রূমধ্যে সজোরে বিদ্ধ করিয়া কহিলেন—"এই বিন্দুতে মন স্থির কর।" শিষ্য তাহাই করিলেন এবং জগজ্জননীর মূর্তি পুনরায় আবির্ভূত হইবামাত্র মনে মনে কল্পনা করিলেন যেন জ্ঞান-অসি দ্বারা সেই মূর্তিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিয়াছেন। যেমনি উক্তরূপ ভাবনা, অমনি একেবারে নির্বিকল্প সমাধি—নামরূপের অতীত, বাক্যমনের অগোচর, নির্গুণ ব্রহ্মেতে মনের সম্পূর্ণ লয়! শ্রীমৎ তোতাপুরীর অভিলাষ পূর্ণ হইল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাছে বসিয়া থাকিয়া যখন দেখিলেন যে, শিষ্যের দেহ একেবারে স্পন্দহীন, তখন নিঃশব্দে বাহিরে আসিয়া কুটীরের দ্বার

অর্গলবদ্ধ করিয়া দিলেন এবং দরজা খুলিবার নিমিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে কোন সঙ্কেত আসে কি না, তাহার অপেক্ষায় কান পাতিয়া নিকটেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু কুটীরের অভ্যন্তর হইতে কোনই সাড়া আসিল না। ক্রমে ক্রমে তিন দিন, তিন রাত্রি অতিবাহিত হইল; তথাপি কুটীর সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। তোতাপুরী নির্বাক বিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন—এও কি সম্ভব? চল্লিশ বৎসর-ব্যাপী কঠোর সাধনার বলে তিনি যে অবস্থায় পৌঁছিয়াছিলেন, এ ব্যক্তি একদিনেই তাহা লাভ করিল! তাঁহার মনে ভয় হইতে লাগিল হয় ত বা কিছু গোলযোগ ঘটিয়াছে। আর অপেক্ষা অনুচিত বিবেচনায় কুটীরের দ্বার খুলিয়া তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং শিষ্যের দেহ পরীক্ষাপূর্বক দেখিতে পাইলেন যে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ, এমন কি হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া পর্যন্ত স্তব্ধ,—কিন্তু মুখমণ্ডল প্রশান্ত, জ্যোতিপূর্ণ। বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তোতাপুরী বলিয়া উঠিলেন, 'য়াহ্ ক্যা দৈবী মায়া'! বেদান্তোক্ত জ্ঞানমার্গের চরম লক্ষ্যস্থল যে নিবিকল্প সমাধি, তাহা যদি কেহ একদিনের চেষ্টাতেই লাভ করে, তবে তাহাকে দৈবী মায়া ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? শ্রীমৎ তোতাপুরীর কণ্ঠনিঃসৃত 'হরি ওঁ' মন্ত্রের গম্ভীর নিনাদে তখন কুটীরের অভ্যন্তর কাঁপিয়া উঠিল। যৌগিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে শ্রীমৎ তোতাপুরী শিষ্যের সমাধি ভাঙ্গাইলেন। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিতে পাইলেন যে, গুরু অসীম করুণাভরে ও স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন। ধীরে ধীরে গাত্রোত্থানপূর্বক তিনি শ্রীগুরুর পদধূলি গ্রহণ করিলেন। গুরু-শিষ্যের মিলন সার্থক ও সম্পূর্ণ হইল।

শ্রীমৎ তোতালুরী সাধারণতঃ এক জায়গায় তিন রাত্রি থাকিতেন না, কিন্তু এই অদ্ভুত শিষ্যের আকর্ষণে তিনি দক্ষিণেশ্বরে একাদিক্রমে এগারো মাস কাটাইয়া দিলেন। যিনি হৃৎকুণ্ডে অনল জ্বালিয়া সমস্ত সংসারিক বন্ধন তাহাতে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন, কোন্ আকর্ষণে এই দীর্ঘকাল তিনি দক্ষিণেশ্বরে কাটাইয়াছিলেন, সেই রহস্য কে উদ্‌ঘাটন করিতে পারিবে?

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে পঞ্চবটীতে মুক্ত আকাশের নীচে শ্রীমৎ তোতাপুরী আসন পাতিয়াছিলেন। আসনের পাশে সারাক্ষণ ধুনি জ্বলিত। শরীরে বস্ত্রধারণের অভ্যাস তাঁহার ছিল না; তজ্জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার

কথা বলিবার সময়ে 'ন্যাংটা' নামে উল্লেখ করিতেন। দিনেরবেলায় শ্রীমৎ তোতাপুরী সাধারণতঃ একখানা চাদর মুড়ি দিয়া চুপচাপ শুইয়া থাকিতেন, শুইয়া শুইয়াই সম্ভবতঃ ধ্যান করিতেন। রাত্রিতে চরাচর নিস্তব্ধ হইলে পর যোগাসনে বসিতেন। নির্বিকল্প সমাধির ভূমিতে আরোহণ এবং তথা হইতে অবরোহণ—তাঁহার নিকট ছিল ইচ্ছাধীন ব্যাপার।

সাধক-জীবনের সূচনা হইতেই শ্রীমৎ তোতাপুরী ছিলেন জ্ঞানপথের পথিক। ভক্তিপথে কখনও পা বাড়ান নাই; তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, ভক্তিমার্গ শুধু নিম্নাধিকারীদের জন্য। ঈশ্বরের প্রতি মাতা, পুত্র, সখা, পতি প্রভৃতি সম্পর্ক আরোপ করিয়া ঈশ্বরলাভের প্রয়াস তাঁহার নিকট নিতান্ত হাস্যকর বলিয়া মনে হইত। অপর পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সর্বোপরি মাতৃভাবের সাধক; শক্তিকে তিনি কখনও হেয় জ্ঞান করিতেন না, কিংবা মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতেন না। যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকা-শক্তি অবিভাজ্য, তেমনি ব্রহ্ম ও শক্তিকে তিনি এক বলিয়াই জানিতেন—জগন্মাতাকে সমগ্র অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন, শরণাগত ভাবে তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইতেন। নির্বিকল্প সমাধিলাভের অবস্থায় পৌঁছিবার পরেও তাঁহার এই ভাব দূরীভূত হইল না। এ সম্পর্কে শ্রীমৎ তোতাপুরীর সহিত তাঁহার মতের মিল হইত না।

বাল্যাবধি শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যাস ছিল সন্ধ্যাকালে হরিনাম-কীর্তন। সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে কিছুক্ষণ ধরিয়া বারংবার বলিতেন—"হরি বোল, হরি বোল; হরি গুরু, গুরু হরি; হরি প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন; মন কৃষ্ণ, প্রাণ কৃষ্ণ, জ্ঞান কৃষ্ণ, ধ্যান কৃষ্ণ, বোধ কৃষ্ণ, বুদ্ধি কৃষ্ণ—জগৎ তুমি, জগৎ তোমাতে; আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী" ইত্যাদি।* অদ্বৈতভাব-সাধনের পরেও তিনি এই অভ্যাস বজায় রাখিয়াছিলেন। একদিন পঞ্চবটীতে শ্রীমৎ তোতপুরীর নিকটে বসিয়া কথাবার্তা বলিতে বলিতে সন্ধ্যা হইয়া গেলে পর কথাবার্তা বন্ধ রাখিয়া তিনি ঐরূপ নামকীর্তন আরম্ভ করেন। তোতাপুরী ভাবিলেন—এ আবার কি কাণ্ড! যে ব্যক্তি বেদান্তমার্গে নির্বিকল্প সমাধির অবস্থায় পৌঁছিয়াছে,

* শিষ্যদিগকে এবং অপরাপর ব্যক্তিদিগকেও ঐরূপ করিতে তিনি উপদেশ দিতেন—গাছের নীচে দাঁড়াইয়া হাততালি দিলে যেমন কাক উড়িয়া যায়—তেমনি দিনান্তে হাততালি দিয়া হরিনাম করিলে সমস্ত বিষয়বাসনা, পাপচিন্তা দূরে চলিয়া যাইবে। প্রথমে উক্ত উপায়ে মনকে সংসার হইতে গুটাইয়া তৎপরে ধ্যান-জপাদি করিতে হইবে।

তার নিম্নাধিকারীর ন্যায় হাততালি দিয়া নামগান করা কেন? প্রকাশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে ঠাট্টা করিয়া কহিলেন, "আরে, কেঁও রোটি ঠোক্‌তে হো?" শ্রীরামকৃষ্ণ তদুত্তরে হাসিয়া কহিলেন—"দূর্‌ শালা! আমি ঈশ্বরের নাম কর্‌ছি—আর তুমি কিনা বল্‌ছ, আমি রুটি ঠুক্‌ছি!" শ্রীরামকৃষ্ণের সরল উত্তর শুনিয়া তোতাপুরীও হাসিতে লাগিলেন।

অপর একদিন সন্ধ্যার পর শ্রীমৎ তোতাপুরী ও শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীতে ধুনির পাশে বসিয়া অদ্বৈত-তত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে ভৃত্যদের মধ্যে কেহ তামাক খাইবার উদ্দেশ্যে ধুনির কাঠ টানিয়া উহা হইতে জ্বলন্ত অঙ্গার সংগ্রহ করিতে লাগিল। নাগা সাধুরা ধুনীরূপী অগ্নিকে অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকেন এবং শ্রীমৎ তোতাপুরীর মনেও উক্ত সংস্কার বদ্ধমূল ছিল। লোকটিকে ধুনির আগুন নাড়াচাড়া করিতে দেখিয়া বিষম ক্রোধভরে চিমটা লইয়া তিনি তাহাকে মারিতে উদ্যত হইলেন; কিংবা হয়ত তাড়াইবার উদ্দেশ্যেই ক্রোধের ভান করিলেন। লোকটি ভয় পাইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু এই ব্যাপার দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের হাসি আর ধরে না। শ্রীমৎ তোতাপুরী কহিলেন—"তুমি হাস্‌ছ; কিন্তু একবার ভেবে দেখ লোকটার কি আস্পর্ধা!" তখন শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর করিলেন, "তা ত বটে; কিন্তু সেইসঙ্গে তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের দৌড়টাও দেখ্‌ছি। এইমাত্র বল্‌ছিলে—ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নাই, প্রাণী বল, বস্তু বল, সব তাঁরই প্রকাশ। আর পরমুহূর্তেই সে-কথা একেবারে ভুলে গিয়ে লোকটাকে মারতেই উঠ্‌লে! তাই ভাবছি যে, মায়ার কি প্রভাব!" এই কথা শুনিয়া তোতাপুরী খুব গম্ভীর হইয়া গেলেন। ক্ষণকাল পরে তিনি কহিলেন—"হঁা, ঠিক বলেছ, ক্রোধ বড় পাজী।"

দক্ষিণেশ্বরে কয়েকমাস অবস্থানের পর শ্রীমৎ তোতাপুরী কঠিন আমাশয়ে আক্রান্ত হন। তাঁহার সুস্থ সবল দেহে পূর্বে কখনও রোগযন্ত্রণা ভুগেন নাই। এখন আমাশয়ের প্রবল আক্রমণে তিনি বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। মথুরবাবু পরম যত্নসহকারে তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন বটে, কিন্তু চিকিৎসায় কোনই ফল দেখা গেল না। অবশেষে একদিন ব্যাধির যন্ত্রণা অসহ্য বোধ হওয়াতে শ্রীমৎ তোতাপুরী মনে মনে স্থির করিলেন যে, যত অনিষ্টের গোড়া দেহটাকে আর রাখিবেন না। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া গভীর নিশীতে একাকী গঙ্গার জলে নামিলেন; উদ্দেশ্য, ভাগীরথীতে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ

করিবেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! হাঁটিতে হাঁটিতে তিনি গঙ্গার প্রায় অপর তীরে যাইয়া পৌঁছিলেন, কোথাও হাঁটু-জলের অধিক পাইলেন না; সুতরাং ডুবিয়া মরা আর হইল না। এ কি অদ্ভুত মায়ার খেলা! শ্রীমৎ তোতাপুরীর চিরপোষিত ধারণার সমস্তই যেন ওলট-পালট হইয়া গেল। তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইল যে, পরব্রহ্ম যেমন সত্য ও নিত্য, মায়ারূপিণী জগন্মাতাও তেমনি নিত্যরূপিণী ও সর্বব্যাপিনী। এক্ষণে বুঝিলেন যে, নিজের অজ্ঞাতসারে হইলেও জগন্মাতার কৃপা পাইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে পারিয়াছেন। 'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে'—আর সেই মহামায়া যদি নিজগুণে কৃপা না করেন, তবে কাহার সাধ্য মায়ার রাজ্য অতিক্রম করে?

পরদিন সকালে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্যকার ন্যায় পঞ্চবটীতলে শ্রীমৎ তোতাপুরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, তখন দেখিতে পাইলেন, তিনি যেন রাতারাতি এক নূতন মানুষে পরিবর্তিত হইয়াছেন, তাঁহার নয়নদ্বয় অপূর্ব করুণামাখা এবং মুখমণ্ডল প্রেমানন্দে ঝলমল। তিনি শিষ্যকে সস্নেহে কাছে বসাইয়া পূর্বরাত্রির ঘটনা বিবৃত করিলেন এবং কহিলেন যে, এবারে তাঁহার ভ্রম ঘুচিয়াছে, 'মা'কে তিনি এখন স্বীকার করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ উহাতে বালকের ন্যায় আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—"তা' হ'লে আমার ধারণাই ঠিক। মা আমাকে অনেক আগেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন—ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্ন, যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা-শক্তি।" এই ব্যাপারের কয়েক দিন পরেই শ্রীমৎ স্বামী তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বর হইতে চিরপ্রস্থান করেন; তাঁহার আর কোন সন্ধান কখনও পাওয়া যায় নাই।*

শ্রীমৎ তোতাপুরী চলিয়া যাইবার পর আরও প্রায় ছয় মাসকাল পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতভাবে বিভোর ছিলেন। সারাক্ষণ তিনি নির্বিকল্প সমাধি-ভূমিতে অবস্থান করিতেন। অনেক জোর-জবরদস্তির দ্বারা মাঝে মাঝে তাঁহাকে সাধারণ ভূমিতে নামাইয়া যৎসামান্য খাদ্যদ্রব্য মুখে পুরিয়া দেওয়া হইত। এই সময়ে যেন দৈবপ্রেরিত হইয়াই একজন সাধুপুরুষ কালীবাটীতে আসেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বারা পরে প্রচুর লোক-কল্যাণ সাধিত হইবে

* ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়া গিয়াছেন যে, উত্তর-পশ্চিম ভারতে শ্রীমৎ তোতাপুরীর সমাধিস্থানে লোকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া থাকে; কিন্তু জায়গাটির নাম উল্লেখ করেন নাই। 'The Master As I Saw Him'— (Udbodhan) ৩৯১ পৃ:

বুঝিতে পারিয়া তিনি উপর্যুক্ত উপায়ে তাঁহার দেহরক্ষায় সাহায্য করিতেন। ঐরূপ চেষ্টা ব্যতিরেকে সেই সময়ে তাঁহার শরীর টিকিত কিনা সন্দেহ। ন্যূনাধিক ছয় মাসকাল এইভাবে অতিবাহিত হইবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ দৈববাণী শুনিতে পাইলেন—'ওরে, তুই ভাবমুখে থাক্'।* উক্ত নির্দেশ-বাক্য পালন-পূর্বক অবশিষ্ট জীবন তিনি ভাবমুখে অবস্থান করিয়াছিলেন। নির্বিকল্প সমাধিভূমিতে যখন ইচ্ছা আরোহণ করিতেন বটে, কিন্তু অনতিকাল পরেই আবার সাধারণ ভূমিতে নামিয়া আসিতেন।

ক্রমাগত অনেক দিন ধরিয়া একটানাভাবে অদ্বৈতভূমিতে অবস্থানের ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তিনি কঠিন আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। কেহ কেহ বলেন যে, এই আক্রমণ এক হিসাবে উপকারই করিয়াছিল; কারণ, ব্যাধির যন্ত্রণা শ্রীরামকৃষ্ণের মনকে দেহের প্রতি টানিয়া নামাইতে কিয়ৎপরিমাণে সাহায্য করিত। তাহা না হইলে সেই সময়েই তাঁহার আত্মা হয় ত দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া চলিয়া যাইত। কিন্তু ইহা অনুমান-মাত্র; আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির পক্ষে এ-বিষয় ধারণার অতীত। এইটুকু আমরা শুধু জানি যে, অদ্বৈতভাবের প্রাবল্য হ্রাস পাইবার পরেও অনেক দিন পর্যন্ত তিনি আমাশয়ে ভুগিয়াছিলেন। সেই সময়ে যদিচ তত ঘন ঘন সমাধিমগ্ন হইতেন না, তথাপি মুখে বেদান্তের কথা সর্বদা লাগিয়া থাকিত। জ্ঞানমার্গী সাধুদের সহিত ঐ সময়ে ব্রহ্ম ও মায়ার স্বরূপ সম্বন্ধে খুব আলোচনা হইত। "অস্তি, ভাতি, প্রিয়" † প্রভৃতি নিগূঢ় বেদান্ত-তত্ত্ব অতি প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক-ভাবে সকলের নিকট তিনি ব্যাখ্যা করিতেন।

* নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি হইতে ইহার অর্থ স্পষ্ট হইবে—

"আমিত্বের একেবারে লোপ করিয়া নির্গুণভাবে অবস্থান করিও না; কিন্তু যাহা হইতে যত প্রকার বিশ্বভাবের উৎপত্তি হইতেছে, সেই বিরাট 'আমি'ই তুমি, তাঁহার ইচ্ছাই তোমার ইচ্ছা, তাঁহার কার্যই তোমার কার্য—এই ভাবটি ঠিক ঠিক সর্বদা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া জীবন যাপন কর ও লোক-কল্যাণ সাধন কর।"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

"পঞ্চমভূমি আর ষষ্ঠভূমির মাঝখানে বাচখেলান ভাল! ষষ্ঠভূমি পার হয়ে সপ্তমভূমিতে অনেকক্ষণ থাকতে আমার সাধ হয় না।"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

"অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে কি সকলে ধরতে পারে? কিন্তু নিত্যে উঠে যে বিলাসের জন্য লীলায় থাকে, তারই পাকাভক্তি।"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

† 'অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপমতো দ্বয়ম্॥'

এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর যখন শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছে, তখন গোবিন্দ রায় নামক জনৈক সুফী দরবেশ দক্ষিণেশ্বরে আসেন। সুফীরা অনেকটা বাউল সম্প্রদায়ের মত; মুসলমান হইলেও উঁহারা উগ্রপন্থী নহেন, বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের উপর উঁহারা ততটা জোর দেন না। গোবিন্দ রায়ের আচরণ দেখিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন যে, ইঁহার ধর্মমত যাহাই হউক, ইনি প্রকৃত সাধক এবং সাধনমার্গে বস্তুতঃ অগ্রসর। অমনি তাঁহার মনে ইচ্ছা জন্মিল ইঁহার অনুষ্ঠিত মুসলমানী সাধনপ্রণালীতে কি আছে, তাহা দেখিতে হইবে। উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত তিনি বিনা দ্বিধায় গোবিন্দ রায়ের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন, এবং অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সুফী-সাধনার মূলতত্ত্বে পৌঁছিয়া সেই পন্থা ছাড়িয়া দিলেন।

উপর্যুক্ত ঘটনার প্রায় সাত বৎসর পরে শ্রীরামকৃষ্ণ খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কেও প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করেন। সাধক-জীবনের প্রসঙ্গ শেষ করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে তাহা এখানেই বর্ণিত হইতেছে—যদিও সময়ের হিসাবে উহা অনেক পরবর্তী ঘটনা। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের নিকটেই শম্ভুচরণ মল্লিক নামক জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির একটি বাগানবাড়ী ছিল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মল্লিক মহাশয়ের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের আলাপ-পরিচয় হয়। অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াও শম্ভুচরণ ঈশ্বরে অনুরক্ত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তিনি এতদূর আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধাশীল হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে আপন গুরু বলিয়া জ্ঞান করিতেন। মথুরানাথের পরলোকগমনের পর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তিনিই যোগাইতেন এবং তজ্জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে নিজের দ্বিতীয় 'রসদ্দার' আখ্যা দিয়াছিলেন। যীশুখ্রীষ্টের প্রতি শম্ভুবাবুর বড়ই ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল এবং খ্রীষ্টধর্মসংক্রান্ত অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তিনি অধ্যয়ন ও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি সেগুলি হইতে মাঝে মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণকে পড়িয়া শুনাইতেন। তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনার ফলে যীশুর এবং যীশু-প্রবর্তিত ধর্মের সম্পর্কে আরও জানিবার বাসনা শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়ে উদিত হয়।

রাণী রাসমণির কালীবাটীর ঠিক দক্ষিণেই ছিল ৺যদুনাথ মল্লিকের বাগান-বাড়ী। যদুনাথ এবং তাঁহার মাতাঠাকুরাণী উভয়েই শ্রীরামকৃষ্ণকে অতিশয় ভক্তি করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও কখনও যদুবাবুর বাগানে বেড়াইতে যাইতেন। কর্মচারীদের প্রতি যদুবাবুর আদেশ ছিল যে, মালিকপক্ষের কেহ

উপস্থিত না থাকিলেও যখনই শ্রীরামকৃষ্ণ বাগানে বেড়াইতে আসিবেন, তখনই তাঁহাকে অভ্যর্থনাপূর্বক বৈঠকখানায় নিয়া বসাইতে হইবে। বৈঠকখানার দেওয়ালে অনেক ভাল ভাল ছবি টাঙ্গানো ছিল; তন্মধ্যে একখানি ছিল 'মাতৃক্রোড়ে যীশু'। একদা শ্রীরামকৃষ্ণ তথায় গিয়া বসিয়াছেন, এমন সময়ে ছবিখানি তাঁহার চোখে পড়িতেই মনে এক অপূর্ব ভাবের সঞ্চার হইল। ছবির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন এবং যীশুকে যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন। যীশুখ্রীষ্টের ভাবে একেবারে বিভোর অবস্থায় সম্পূর্ণ তিনদিন কাটিয়াছিল। ঐ সময়ের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের মূলতত্ত্বসমূহ তিনি সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তৎপরে যীশুর মূর্তি নিজ দেহে লীন হইয়া যাইতে দেখেন ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসেন।

জন্মভূমি-সন্দর্শন ও তীর্থভ্রমণ

অদ্বৈতসাধনার অন্তে কঠিন আমাশয়ের আক্রমণে শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর খুব দুর্বল হইয়া পড়াতে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে মথুরবাবু তাঁহাকে কামারপুকুরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। মথুরবাবু ও তাঁহার পত্নী বিলক্ষণ জানিতেন যে, ওখানে রামেশ্বরের সংসার মোটেই সচ্ছল নহে। সুতরাং উপযুক্ত পরিমাণ টাকাকড়ি এবং জিনিসপত্র হৃদয়রামের নিকট দিয়া 'বাবা'র তত্ত্বাবধানের জন্য তাঁহাকেও যাইতে কহিলেন। ভৈরবী-ব্রাহ্মণী তখনও পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিতেছিলেন; তিনিও সঙ্গে চলিলেন। চন্দ্রাদেবী কিন্তু গেলেন না। গঙ্গাতীরে শেষ জীবন কাটাইবার মানসেই তিনি ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন; গৃহে ফিরিয়া যাইতে তাঁহার কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না।

১২৭৪ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে (১৮৬৭ খ্রীঃ) সুদীর্ঘ আট বৎসর পরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয় জন্মভূমি কামারপুকুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি আসিবেন শুনিয়া আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব ব্যগ্রভাবে তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, অত্যুগ্র তপস্যার ফলে শ্রীরামকৃষ্ণ উন্মাদের প্রায় হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার আচরণ সমস্তই অদ্ভুত ও খাপছাড়া। কেহ বলিত, তিনি ঈশ্বরলাভ করিয়াছেন; অপর কেহ বা বলিত, তিনি একেবারে বদ্ধ পাগল। কিন্তু যখন তিনি সশরীরে কামারপুকুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সকলেই দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইল যে তিনি তাহাদের চিরপরিচিত সেই গদাধরই আছেন; তাঁহার সেই তন্ময়তা, সরলতা, ভালবাসা ও সেই মধুমাখা হাসি, সব কিছু আগেকার মতই রহিয়াছে, কোন কিছুরই ব্যত্যয় ঘটে নাই। কিন্তু একটা জিনিস নূতন হইয়াছে—তাঁহার সান্নিধ্যে একটা আধ্যাত্মিক ভাব যেন সদা-সর্বদা বিরাজমান! যদিও লোকের সহিত কথাবার্তা আগেকার মতই তিনি বলেন, রঙ্গরস এবং ফষ্টিনষ্টিও করেন, তথাপি তাঁহার সন্নিকটে গেলে একটা পরম শ্রদ্ধার ভাব অতর্কিতে ছোট-বড় সকলকেই অভিভূত করিয়া ফেলে—খুব ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার সহিত মিশিতে পারা যায় না, কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকে। তাঁহার সান্নিধ্যে গেলেই মনে পবিত্রতা, শান্তি ও অনাবিল আনন্দের সঞ্চার হয়। সাংসারিক কুশল-প্রশ্নাদি

তিনি করেন বটে, এবং পুরাতন দিনের কথাবার্তাও হয় বটে, কিন্তু অতি অল্প-ক্ষণের জন্য ; কারণ, দু'চার কথার পরেই তিনি শ্রোতৃবর্গকে যেন ভগবৎপ্রসঙ্গে একেবারে টানিয়া লইয়া যান। তাঁহার মোহিনীশক্তিও অত্যাশ্চর্য। সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত রামেশ্বরের কুটীরে লোকের যাতায়াত লাগিয়াই থাকে, সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে একটুখানি বসিতে চায়, তাঁহার শ্রীমুখ হইতে দু'চারটি কথা শুনিতে চায়, ভাল জিনিসটি পাইলে তাঁহার ভোগের জন্য সাগ্রহে লইয়া আসে,—যত রকম ভাবে পারে, তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা বাড়াইবার চেষ্টা করে।

সে-যাত্রায় কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় ছয়-সাত মাসকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে দীর্ঘকালব্যাপী নানাবিধ কঠোর সাধনার পর সেই সময়টা তাঁহার পক্ষে হইয়াছিল যেন ছুটির দিন। সাধারণ লোকের সহিত নিতান্ত বালকভাবে মিশিয়া তিনি পূর্ণমাত্রায় বিশ্রামসুখ উপভোগ করিয়াছিলেন। অপর দিকে সমস্ত গ্রামবাসীকে তিনি তাঁহার কথাবার্তায়, সঙ্গীতে ও সঙ্গগুণে আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া একেবারে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই যেন সাময়িক-ভাবে এক অপার্থিব, অনির্বচনীয় আনন্দের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কামারপুকুরে আসেন, তখন তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীমতী সারদা-দেবী জয়রামবাটীতে পিতৃগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। পিতৃগৃহেই তিনি থাকিতেন ; ইতঃপূর্বে মাত্র দু'বার খুব অল্পদিনের জন্য তিনি কামারপুকুরে আসিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তখন অনুপস্থিত ; অতএব স্বামীর দর্শনলাভ তাঁহার ঘটে নাই। স্বামী কি বস্তু, তৎসম্পর্কে ধারণা করিবার মত বয়সও তাঁহার তখন হয় নাই। এখন বয়স চৌদ্দ বৎসর ; পরিবার ও সংসার সম্পর্কে অল্পস্বল্প জ্ঞান জন্মিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনের পর সারদাদেবীকেও বাটীতে আনয়ন করা হইল। আশ্চর্যের বিষয়, তাঁহাকে আনানো হইবে শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ কোনই আপত্তি তুলিলেন না—যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি সন্ন্যাস-ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে বিবাহিত জানিয়াও দীক্ষাদানকালে শ্রীমৎ তোতাপুরী অভয়দানপূর্বক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "এতে আসে যায় কি ? স্ত্রী কাছে থাকলেও যে ব্যক্তির ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং বিজ্ঞান অক্ষুণ্ণ থাকে, তিনিই বস্তুতঃ পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই যিনি সমভাবে আত্মারূপে

দেখেন এবং তদ্রূপ ব্যবহার করেন, তিনিই ঠিক ঠিক ব্রহ্মবিজ্ঞানী। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যাঁর ভেদজ্ঞান রয়েছে, তিনি উত্তম সাধক হলেও ব্রহ্মবিজ্ঞানের পর্যায় থেকে বহুদূরে।" সারদাদেবীকে নিজের কাছে আসিতে দিয়া এবং সহধর্মিণীর ন্যায্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত লোকসমক্ষে রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণচরিত্রের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, যখন যে-বিষয় ধরিতেন, তখন তাহাতেই ষোল আনা মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া একেবারে নিখুঁতভাবে উহা সম্পন্ন করিতেন। সারদাদেবীর সম্পর্কে এতকাল তিনি উদাসীন ছিলেন; কিন্তু পত্নী যখন দৈবক্রমে কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন মোটেই তাঁহাকে অবহেলা করিলেন না; বরঞ্চ পরম যত্ন ও ভালবাসার সহিত তাঁহাকে একদিকে অধ্যাত্মবিদ্যা এবং অপরদিকে সংসারধর্ম শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নিজে সংসারত্যাগী হইলেও জাগতিক সমস্ত ব্যাপারে তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং মানব-চরিত্রবিষয়ে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তিদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, পরিবার-পরিজনের সহিত কিভাবে চলিতে হয়; অতিথি-অভ্যাগতের পরিচর্যার নিয়ম, গৃহস্থালীর জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখিবার প্রণালী—ইত্যাদি নিত্য-প্রয়োজনীয় নানা খুঁটিনাটি বিষয় তিনি সারদাদেবীকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিখাইয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। শ্রীরাম-কৃষ্ণের এই সস্নেহ ব্যবহার সারদাদেবীকে এক কল্পনাতীত নূতন রাজ্যে লইয়া গেল। তিনি নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার স্বামী সাধারণ মনুষ্য নহেন, সাক্ষাৎ দেবতা। সুতরাং তাঁহাকে ইষ্টরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপদিষ্ট সাধন-পথে তিনি অবিচলিত শ্রদ্ধার সহিত দৃঢ়পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এদিকে ভৈরবী-ব্রাহ্মণী রামেশ্বরের পরিবারবর্গের সহিত বেশ সহজ ও ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে মাতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন এবং সারদাদেবীও তাঁহার প্রতি পুত্রবধূবৎ ব্যবহার করিতেন। কিন্তু তথাপি তিনি খুব সন্তুষ্ট ছিলেন না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ যখন অদ্বৈতসাধনায় প্রবৃত্ত হন, তখন ভৈরবীর নিকট উহা মোটেই ভাল লাগে নাই। তাঁহার মনে এই অহঙ্কার ছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণকে অধ্যাত্মরাজ্যে তিনিই প্রবেশ করাইয়াছেন। অপর গুরুর সাহায্যে তাঁহাকে ভিন্ন প্রকারের

সাধনায় ব্রতী হইতে দেখিয়া ব্রাহ্মণীর মনে অভিমানের সঞ্চার হইয়াছিল। আর এই আশঙ্কাও তিনি করিয়াছিলেন যে, বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গে বিচরণের ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তিভাব উন্মূলিত হইয়া জীবন শুষ্ক ও নীরস হইয়া যাইবে। অদ্বৈতসাধনার কয়েকমাস পরে শ্রীরামকৃষ্ণকে ভাবমুখের অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া সেই আশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছিল। কিন্তু এবারে তাঁহাকে আপন সহধর্মিণীর প্রতি কর্তব্যপালনে অগ্রসর দেখিয়া ভৈরবীর বড়ই বিরক্তি জন্মিল। তিনি তখনও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই যে, শ্রীরামকৃষ্ণ যে উচ্চভূমিতে আরূঢ়, সেখান হইতে পতন অসম্ভব। সারদাদেবীকে নিকটে রাখা সম্পর্কে সতর্ক করা সত্ত্বেও সেই সাবধানবাণীর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কর্ণপাত করিলেন না, তখন ভৈরবীর অহঙ্কারে দারুণ আঘাত লাগিল। দৈবের এমনি লিখন যে, আরও দু'একটি ছোটখাট ব্যাপারে তিনি নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া অভিমান ও বিরক্তির ভাব বাহিরে প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমতী ব্রাহ্মণীর পক্ষে নিজের ভুল বুঝিতে দেরী হইল না। ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তিনি মনে মনে খুবই লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হইলেন। তাঁহার তখন প্রতীতি জন্মিল যে, সন্ন্যাসিনীর পক্ষে একস্থানে অত্যধিককাল বাস করা হইয়াছে, আর থাকা উচিত নহে, ছোটখাট অপ্রীতিকর ঘটনার ভিতর দিয়া স্বয়ং বিধাতা তাঁহাকে স্থানত্যাগের নির্দেশ পাঠাইতেছেন। অনেক চেষ্টার ফলে মন স্থির করিয়া অবশেষে একদা তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট চিরবিদায় গ্রহণপূর্বক প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণী চলিয়া যাইবার অল্পকাল পরেই সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া হৃদয়রামের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসেন।

'বাবা'কে সুস্থ শরীরে ও প্রফুল্লমনে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া মথুরবাবুর ও তাঁহার পত্নীর যৎপরোনাস্তি আনন্দ হইল। তাঁহারা তখন পশ্চিমে তীর্থযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। বলিয়া-কহিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকেও তাঁহাদের সহিত যাইতে রাজী করাইলেন। ১২৭৪ বঙ্গাব্দের শীতকালে (১৮৬৮ খ্রীঃ) মথুরানাথ সপরিবারে ও সদলবলে তীর্থদর্শনে রওয়ানা হ'ন। সর্বপ্রথমে তাঁহারা যান ৺বৈদ্যনাথধামে; সেখান হইতে বারাণসী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে তাঁহারা গিয়াছিলেন। ৺বৈদ্যনাথধামে অবস্থানকালে শ্রীরামকৃষ্ণ একদা মথুরানাথের সঙ্গে নিকটবর্তী কোনও গ্রামে বেড়াইতে যাইয়া গ্রামবাসীদের

নিতান্ত দীনদরিদ্র অবস্থা দর্শনে বড়ই বিচলিত হইয়া পড়েন। মথুরানাথকে তিনি তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন যে, ঐ সমস্ত গরীব লোকদিগকে একবেলা পেট ভরিয়া খাওয়াইতে হইবে এবং প্রত্যেককে একখানি করিয়া কাপড় দিতে হইবে। তীর্থযাত্রার বিপুল ব্যয়ভারের ওজুহাতে মথুরবাবু প্রথমে একটু আপত্তি তুলিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ উহাতে একেবারে বাঁকিয়া বসিলেন। অভিমানের স্বরে তিনি কহিলেন যে, এই সমস্ত গরীব-দুঃখীর যৎকিঞ্চিৎ সেবার ব্যবস্থা না হইলে তাঁহার তীর্থযাত্রা ওখানেই শেষ, তিনি আর একপাও অগ্রসর হইবেন না। অগত্যা মথুরানাথকে শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থাই করিতে হইল। আত্মারাম পুরুষের পক্ষে দরিদ্রের দুঃখমোচনের জন্য এই ব্যাকুলতা প্রথম দৃষ্টিতে বড়ই অদ্ভুত ও রহস্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। উহা রহস্যময়ই থাকিয়া যাইত,—যদি না পরবর্তীকালে তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ অদ্বৈতজ্ঞান ও সেবাধর্মের পারস্পরিক যোগ-সম্পর্ক উত্তমরূপে বুঝাইয়া বলিতেন।

৺বৈদ্যনাথদর্শনের পর তীর্থযাত্রীর দল ৺কাশীধামে গিয়া পৌছিলেন। ভোলানাথের পুরী সত্যই আনন্দের হাট। সংসারের তাপে তাপিত, দুঃখকষ্টে জর্জরিত জীব এখানে আসিলে সকল দুঃখ, সকল কষ্ট অনায়াসে ভুলিয়া যায়। পূতসলিলা গঙ্গার তীরে বহুদূরবিস্তৃত সোপানশ্রেণী; তাহাতে সকাল-সন্ধ্যা অগণিত ভক্ত নরনারীর সমাবেশ। অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বরের জয়ধ্বনি, স্তবস্তুতি ও ভজনসঙ্গীতে চতুর্দিক মুখরিত। মুহুর্মুহুঃ 'হর হর বম্ বম্' ধ্বনি উত্থিত হইয়া মানুষের সকল শঙ্কা, সকল দুর্ভাবনা, সকল পাপতাপ দূরীভূত করিয়া দিতেছে। মানবসাধারণ স্বভাবতঃ মৃত্যুভয়ে ভীত; কিন্তু এই শিবপুরীতে মরণযাত্রীর ভীড়! সংসারের কাজকর্ম সমাপনান্তে জীবনের অপরাহ্নে লোক এখানে আসিয়া সাগ্রহে অপেক্ষা করে—পরপারে যাইবার জন্য;—আর মহাকাল তাঁহার ভয়ঙ্কর রূপ পরিহারপূর্বক অভয়দাতারূপে, মুক্তিদাতারূপে জীবকে এখানে নিরন্তর তাঁহার নিজের সকাশে আহ্বান করিতেছেন। স্মরণাতীত কাল হইতে কত মহাযোগী, মহা-ঋষি, মহাজ্ঞানী,—কত দানবীর, কর্মবীর ও ক্ষত্রবীরের কাহিনী;—কত যাগযজ্ঞ, কত অশ্বমেধ ও মহাসমারোহের স্মৃতি কাশীধামের সহিত বিজড়িত! বস্তুতঃ বারাণসী হিন্দুসভ্যতার রাজধানী।

৺কাশীধামে পৌছিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। শিব-

পুরীর আধ্যাত্মিক মহিমা তাঁহার নয়নসম্মুখে যেন মূর্ত ও সজীব হইয়া আত্মপ্রকাশ করিল। তিনি বালকের ন্যায় হর্ষোৎফুল্লভাবে সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ৺কাশীধামে তখন শিবাবতার ত্রৈলঙ্গ স্বামী বিদ্যমান, যদিও তিনি মৌনী। উভয়ের সাক্ষাৎকার হইবামাত্র একে অন্যের উচ্চাবস্থা উপলব্ধি করিয়া পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইলেন। শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গ স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণকে বহু সম্মান ও সমাদর দেখাইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও স্বামীজিকে আমন্ত্রণপূর্বক মথুরানাথের আবাসে লইয়া গিয়া পরম শ্রদ্ধা ও যত্ন সহকারে পায়সান্ন আহার করাইয়াছিলেন।

৺কাশীধামে কিছুদিন অবস্থানের পর শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরানাথের সহিত প্রয়াগে গমন করেন এবং ত্রিবেণীতে স্নান ও ত্রিরাত্রি যাপনপূর্বক তাঁহারা বারাণসীতে ফিরিয়া আসেন। পক্ষকাল পরে তাঁহারা ব্রজমণ্ডলে উপস্থিত হন। ৺বৃন্দাবন-ধামে নিধুবনের সন্নিকটে একটি প্রকাণ্ড বাড়ী ভাড়া লইয়া মথুরানাথ সেখানে সদলবলে খুব জাঁকজমকে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত বৃন্দাবনের বিবিধ ঘাট ও কুঞ্জবন এবং কিয়দ্দূরবর্তী শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরি গোবর্ধন প্রভৃতি স্থান দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে একেবারে বিভোর হইয়া পড়েন। ভাগবতে বর্ণিত শ্রীভগবানের নানাবিধ ব্রজলীলা তাঁহার চোখের সামনে যেন নিরন্তর ভাসিতে থাকে। নিধুবনে তখন গঙ্গামায়ী নাম্নী এক পরম ভক্তিমতী ও বর্ষীয়সী সাধিকা বাস করিতেন। তাঁহার সহিত দেখা হইবামাত্র উভয়ের মধ্যে অতিশয় ভাব জন্মিয়া গেল, যেন একে অন্যের কতকালের পরিচিত! তখন তাঁহাদের পায় কে? দু'জনে মিলিয়া পরামর্শ স্থির হইয়া গেল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ আর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবেন না, বৃন্দাবনেই থাকিয়া যাইবেন। গঙ্গা-মায়ীর কুটীরে তাঁহার থাকিবার জায়গা পর্যন্ত নির্দিষ্ট হইয়া গেল। হৃদয়রাম দেখিলেন মহা বিপদ; তখন মামার হাত ধরিয়া টানাটানি। ওদিকে গঙ্গামায়ীও ছাড়েন না। অবশেষে বৃদ্ধা জননীর কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়াতে শ্রীরামকৃষ্ণের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিল; তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে সম্মত হইলেন।

প্রত্যাবর্তনের পথে তীর্থযাত্রীর দল পুনরায় কয়েক দিন ৺কাশীধামে অবস্থান করিয়াছিলেন। তখন একদা গঙ্গার ধারে ভৈরবী-ব্রাহ্মণীর সহিত দৈবাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার ঘটে। ব্রাহ্মণী তখন অপর একজন বর্ষীয়সী

সঙ্গিনী সহ কোনও ঘাটের উপরে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বাস করিতেন। দৈবাদ্দর্শনে উভয়েই যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন। পরমাত্মীয় ব্যক্তিদের মধ্যে অপ্রত্যাশিত মিলন ঘটিলে যেরূপ হয়, এক্ষেত্রেও তাহাই হইল—পুরাতন স্নেহ-ভালবাসা পুনরুজ্জীবিত হইয়া উভয়ের অন্তর পূর্ণ করিয়া দিল। যে-কয়দিন শ্রীরামকৃষ্ণ বারাণসীতে ছিলেন, প্রায় প্রত্যহ ভৈরবীর নিকট গমন করিতেন। উহাই তাঁহাদের শেষ দেখা-সাক্ষাৎ। উক্ত মিলনের অল্পকাল পরেই ভৈরবী দেহরক্ষা করেন।

৺কাশীধাম হইতে তীর্থযাত্রীর দল সরাসরি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে থাকাতে তাঁহাদের তীর্থযাত্রার আনন্দ শতগুণ বর্ধিত হইয়াছিল। ফিরিবার পথে ৺গয়াধাম হইয়া আসিবার নিমিত্ত মথুরানাথের খুবই আগ্রহ ছিল, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ উহাতে কিছুতেই রাজী হইলেন না। নিজের জন্ম সম্পর্কে পিতৃদেবের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত তিনি অবগত ছিলেন। তাঁহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, ৺গয়াধামে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করিলে পর নিজের শরীর আর কিছুতেই টিকিবে না। তথায় না যাইবার উহাই কারণ।

ব্রজের ধূলি শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁটুলি বাঁধিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিয়া সেই ব্রজরেণু পঞ্চবটীতলে ছড়াইয়া দিয়া কহিলেন—"আজ থেকে এ-স্থান বৃন্দাবনে পরিণত হ'ল।" এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইয়াছে।

অল্পকাল পরেই শ্রীরামকৃষ্ণকে একটি অত্যন্ত শোকাবহ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হইতে হয়। মাতৃহীন অক্ষয়কে (রামকুমারের পুত্র) তাহার শৈশবে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে অনেক কোলে-পিঠে করিয়াছিলেন। বড় হইয়া অক্ষয় দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে কর্মগ্রহণপূর্বক খুল্লতাতের কাছেই থাকিতেন। হলধারী চলিয়া যাইবার পর বিষ্ণুমন্দিরে তিনিই পূজারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সাধনভজনে তাঁহার মতি এবং অধ্যবসায় ছিল; তজ্জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। ১২৭৬ বঙ্গাব্দে (১৮৬৯ খ্রীঃ) সান্নিপাতিক জ্বরে অক্ষয় অকালে কালগ্রাসে পতিত হ'ন। মৃত্যুর অল্পকাল মাত্র পূর্বে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। আত্মীয়বিয়োগ-ব্যথা ব্রহ্মজ্ঞানীর হৃদয়কেও কিরূপ বিচলিত করিতে পারে, তাহা বুঝাইতে গিয়া এই ঘটনার উল্লেখপূর্বক শ্রীরামকৃষ্ণ একদা বলিয়াছিলেন—"অক্ষয় মলো—তখন কিছু হল না। কেমন

করে মানুষ মরে বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। দেখলুম, যে খাপের ভিতর তলোয়ারখানা ছিল, সেটাকে খাপ থেকে বার করে নিলে; তলোয়ারের কিছু হলো না, যেমন তেমনি থাক্‌ল—খাপটা পড়ে রইল। দেখে খুব আনন্দ হ'লো—খুব হাসলুম, গান করলুম, নাচলুম। তার শরীরটাকে ত পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে এল; তার পরদিন (ঘরের পূর্বে, কালীবাড়ীর উঠানের সামনের বারান্দার দিকে দেখাইয়া) ঐখানে দাঁড়িয়ে আছি আর দেখছি—যেন প্রাণের ভিতরটায় গামছা যেমন নেংড়ায়—অক্ষয়ের জন্য প্রাণটা এমনি করছে। ভাবলুম মা,—এখানে (আমার) পোঁদের কাপড়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ নেই, তা ভাইপোর সঙ্গে ত কতই ছিল! এখানেই (আমার) যখন এরকম হচ্ছে, তখন গৃহীদের শোকে কি না হয়!"*

উপরিবর্ণিত শোচনীয় ঘটনার অব্যবহিত পরেই—মথুরানাথ আপন জমিদারিতে শ্রীরামকৃষ্ণকে একবার বেড়াইতে লইয়া যান। 'বাবা'র মন হইতে শোকচিহ্ন দূর করিবার মানসেই সম্ভবতঃ তিনি উহা করিয়াছিলেন। ভ্রমণকালে একটি গ্রামে গরীব প্রজাদের দুরবস্থা দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বড়ই বিচলিত হইয়া পড়েন,—ঠিক যেমন ৺বৈদ্যনাথধামের নিকটবর্তী কোনও গ্রাম দর্শনকালে তিনি হইয়াছিলেন। তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে মথুরবাবু তখন প্রত্যেক গ্রামবাসীকে একবেলা পর্যাপ্ত আহার ও একখানি করিয়া বস্ত্র উপহার দিতে বাধ্য হন। খুলনা জেলায় মথুরবাবুর কুলগুরুর গৃহে তাঁহারা কয়েক দিন যাপন করেন; কুলগুরু সেই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি নিরতিশয় শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখাইয়াছিলেন।

খুলনা অঞ্চল হইতে ফিরিবার অল্পদিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণ নৌকাযোগে ৺নবদ্বীপধামে রওয়ানা হন। মথুরবাবু তাঁহাকে লইয়া গিয়াছিলেন এবং হৃদয়রামও সঙ্গে ছিলেন।

তদানীন্তন খ্যাতনামা বৈষ্ণব সাধু ভগবানদাস বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে পথিমধ্যে তাঁহারা কালনায় দু'তিন দিন অবস্থান করেন। বাবাজী মহারাজ তখন কালনায় থাকিতেন এবং কোনও একটি ভ্রান্ত ধারণার ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তিনি বিরূপভাবাপন্ন ছিলেন। ধারণাটির এভাবে

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

উৎপত্তি হইয়াছিল। কলুটোলায় ৺কালীনাথ দত্তের ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণ একবার ভাগবত পাঠ ও কীর্তন শুনিতে যান। তথায় 'শ্রীচৈতন্যের আসন' স্থাপনপূর্বক তৎসম্মুখে পাঠ-কীর্তনাদি করা হইত। ভাবাবিষ্ট অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ সহসা যাইয়া উক্ত আসনটিতে উপবেশন করেন। উহাতে গোঁড়া বৈষ্ণবদের মধ্যে কতক ব্যক্তি বড়ই রাগান্বিত হন এবং বৈষ্ণব সমাজের নেতৃস্থানীয় ভগবানদাস বাবাজীর নিকট তাঁহারা বিষয়টি জ্ঞাপন করেন। উক্ত আচরণকে ধৃষ্টতা এবং অহমিকার চূড়ান্ত মনে করিয়া ভগবানদাস শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয়ের ফলে বাবাজীর বিরূপভাব সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়, এবং শ্রীরামকৃষ্ণের উচ্চাবস্থা বুঝিতে পারিয়া তিনি তৎপ্রতি প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করেন। অপর পক্ষে মথুরবাবুও বাবাজীর প্রতি সৌজন্য-প্রকাশের নিমিত্ত তাঁহার আশ্রমে বিরাট ভাণ্ডারা দিয়াছিলেন।

নবদ্বীপ দর্শনের প্রায় একবৎসর পরে, ১২৭৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে (১৮৭১ খ্রীঃ), মথুরানাথ সান্নিপাতিক জ্বরে আক্রান্ত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন প্রথম হইতেই মনে মনে জানিতে পারিয়াছিলেন যে এযাত্রা মথুরের রক্ষা নাই। তাই তিনি নিজে না গেলেও হৃদয়কে প্রত্যহ জানবাজারে পাঠাইয়া মথুরানাথের সংবাদ লইতেন। রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ মন্দের দিকেই যাইতে লাগিল। স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল যে তাঁহার দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। যে দিন তিনি মহাপ্রয়াণ করিবেন, সেদিন সংবাদ আনিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়কে আর জানবাজারে পাঠাইলেন না। অপরাহ্ণে বহুক্ষণ সমাধিস্থ অবস্থায় কাটাইয়া সন্ধ্যার সময়ে তিনি সাধারণভূমিতে নামিয়া আসিলেন ও কহিলেন যে মথুরের আত্মা দেবীলোকে চলিয়া গেল। অধিক রাত্রিতে দক্ষিণেশ্বরে খবর পৌঁছিল যে বিকাল পাঁচটায় মথুরানাথ নশ্বরদেহ পরিত্যাগপূর্বক অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং মথুরানাথের মধ্যে সম্পর্ক যে কত নিবিড় এবং ঘনিষ্ঠ ছিল তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত। যুবক গদাধরকে মথুরানাথই নানা উপায়ে আকর্ষণ-পূর্বক ভবতারিণীসকাশে প্রথম উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই ভাবুক এবং আপনভোলা যুবক দেখিতে দেখিতে তাঁহার চোখের সম্মুখেই বহুতর কঠোর তপশ্চর্যার ভিতর দিয়া পরমহংসত্বে উপনীত হইয়াছিলেন। তপস্যাকালে যুবকের নানাবিধ পাগলামি কাণ্ডকারখানা দেখিয়াও এক মুহূর্তের জন্য

মথুরানাথের বিশ্বাস কখনও টলে নাই। বরঞ্চ সেই বিশ্বাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া এমন পর্য্যায়ে পৌছিয়াছিল যে, পরিশেষে তাঁহাকে তিনি আপন ইষ্টদেবতারূপে সাগ্রহে বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের প্রথম চারি বৎসর গণনার মধ্যে না আনিলেও, তাহার পরবর্তী অন্যূন দ্বাদশ বৎসরকাল মথুরানাথ আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের ন্যায় এবং পিতৃভক্ত সন্তানের ন্যায় 'বাবা'র সেবা করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে মথুরের প্রতিও শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহের পরিসীমা ছিল না। এমন কি, গুহ্যাতিগুহ্য আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিষয়ও তিনি নিঃসঙ্কোচে মথুরের নিকট ব্যক্ত করিতেন। মৃত্যুর করাল হস্ত উভয়ের পার্থিব সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন করিয়া দিল।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, অদ্বৈত-সাধনার অন্তে স্বাস্থ্যোদ্ধারের নিমিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে গেলে পর শ্রীশ্রীসারদামণি দেবী পিত্রালয় হইতে আসিয়া তথায় কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিবার পর মাতাঠাকুরানী * পুনরায় জয়রামবাটীতে চলিয়া যান। সেখানে নীরবে চারি বৎসরকাল তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশানুযায়ী নিজের জীবন গঠনে নিরত থাকেন। বাহ্য আচরণ দেখিয়া তাঁহার কঠোর সাধনার কথা কেহই কিছু জানিতে কিংবা বুঝিতে পারিত না।. লোকে শুধু ইহাই দেখিত যে, তাঁহার স্বভাব দিন দিন অধিকতর শান্ত এবং সুমধুর হইতেছে। গৃহস্থালীর অতি সামান্য সামান্য কাজে তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রাখিতেন, কিন্তু তাঁহার মন সারাক্ষণ পড়িয়া থাকিত দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণের অপার প্রেম তাঁহার অন্তস্তলে ফল্গুধারার ন্যায় নিরন্তর প্রবাহিত থাকিয়া জীবনকে মধুময় করিয়া রাখিত। তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আবার তাঁহার ডাক পড়িবেই পড়িবে।

১২৭৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে (১৮৭২ খ্রীঃ) দোল-পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে জয়রামবাটীর কতিপয় ব্যক্তি কলিকাতায় গঙ্গাস্নানে যাইতে মনস্থ করেন। স্নানার্থীদের মধ্যে মাতাঠাকুরানীর কয়েক জন দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া ছিলেন। তিনিও তাঁহাদের দলে ভর্তি হইলেন; তাঁহার আসল উদ্দেশ্য দক্ষিণেশ্বরে গমন। কন্যার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্থির করিলেন, নিজেই তাঁহাকে পৌছাইয়া দিবেন। তখনও ঐ অঞ্চলে রেলপথ নির্মিত হয় নাই এবং পালকি ভাড়া করিয়া যাইবার মত সঙ্গতিও তাঁহাদের ছিল না। সুতরাং, অন্যান্য যাত্রীদের সহিত পায়ে হাঁটিয়াই তাঁহারা রওয়ানা হইলেন।

পথ চলার প্রথম দু'তিন দিন সকলে মিলিয়া আনন্দেই কাটিয়া গেল। কিন্তু তৎপরে মাতাঠাকুরানী সহসা প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হওয়াতে পিতাপুত্রী অন্যান্য

* শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত-মণ্ডলীতে এবং উহার বাহিরেও শ্রীশ্রীসারদামণি দেবী 'মাতাঠাকুরানী' নামে পরিচিতা। অতঃপর এই নামেই তাঁহাকে অভিহিত করা হইবে।

যাত্রীদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া এক পান্থশালায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। সৌভাগ্যবশতঃ জ্বর সহজেই ছাড়িয়া গেল এবং একখানি পাল্কির জোগাড় হইল। উহাতে চড়িয়া দুর্বল শরীরে কোন প্রকারে অবশিষ্ট পথ অতিক্রম-করত মাতাঠাকুরানী দক্ষিণেশ্বরে পৌছিলেন। তখন রাত্রি নয়টা। তাঁহার রোগক্লিষ্ট ও দুর্বল শরীর দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বড়ই ব্যথিত এবং কিঞ্চিৎ চিন্তান্বিতও হইলেন। আসিবার খবর পূর্বে না পাওয়াতে মাতাঠাকুরানীর থাকিবার কোন বন্দোবস্ত তিনি করিয়া রাখিতে পারেন নাই। সুতরাং নিজের ঘরেই তাড়াতাড়ি শয্যা প্রস্তুত করিয়া তিনি তাঁহাকে শোয়াইয়া দিলেন এবং কহিলেন—"তাই তো! তুমি এতদিন পরে এলে! আর কি আমার সেজোবাবু (মথুরানাথ) আছে যে, তোমার আদর-যত্ন হবে!" পীড়িতা সহধর্মিণীকে স্বয়ং সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা তিন-চারদিনেই রোগমুক্ত করিয়া তিনি নহবৎখানায় জননীর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। শ্বাশুড়ীর এবং স্বামীর পরিচর্যার সুযোগ পাইয়া মাতাঠাকুরানীর আনন্দের সীমা রহিল না। কন্যাকে সুখী দেখিয়া রামচন্দ্র হৃষ্টচিত্তে দেশে ফিরিয়া গেলেন।

পাঁচ বৎসর পূর্বে কামারপুকুরে অবস্থানকালে পত্নীকে শিক্ষাদানের যে কাজ শ্রীরামকৃষ্ণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, এখন তাহাতে আবার মনোযোগী হইলেন। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্বন্ধে সর্বপ্রকার শিক্ষা যাহাতে সারদাদেবীর জীবনে মূর্ত হইয়া উঠে, সেদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল প্রখর দৃষ্টি! মাতাঠাকুরানীকে তিনি ঐ সময়ে বিশেষভাবে একটি উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহা এই,—"চাঁদমামা যেমন সকলেরই মামা, ঈশ্বর তেমন সকলেরই আপনার জন। তাঁর নিকট প্রার্থনা করবার, তাঁর কাছে যাবার সকলেরই সমান অধিকার। যাঁরা তাঁকে ব্যাকুলভাবে ডাকে, তিনি নিজে কৃপা করে তাঁদের নিকট দর্শন দেন। তুমি যদি তাঁকে ব্যাকুলভাবে ডাক, নিশ্চয়ই তাঁর দেখা পাবে।"

মাসের পর মাস অতিবাহিত হইল, এই অদ্ভুত দেবদম্পতী এক মুহূর্তের জন্যও আধ্যাত্মিক রাজ্য ছাড়িয়া পার্থিব জগতে নামিয়া আসিলেন না। এ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—"বিবাহের পর মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম যেন পার্থিব ভোগবাসনা কখনো ওর মনে স্থান না পায়। কাছে রেখে বুঝতে পারলাম, মা সেই প্রার্থনা পূরণ করেছেন।"

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের পদসেবা করিতে করিতে মাতাঠাকুরানী জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা. আমাকে তোমার কি মনে হয় ?" তৎক্ষণাৎ উত্তর আসিল, "যে মা মন্দিরে রয়েছেন, তিনিই এই দেহকে জন্ম দিয়েছেন, এবং এখন নহবৎ-খানায় বাস করছেন। আবার তিনিই এই মুহূর্তে আমার পদসেবা করছেন। সত্যই আমি তোমাকে আনন্দময়ী মা'র প্রতিমূর্তি বলে জ্ঞান করি।"

জানিতে পারা যায়, ১২৮০ সনের ফলহারিণী কালিকাপূজার রাত্রিতে তিনি মাতাঠাকুরানীকে তন্ত্রমতে ষোড়শীপূজা করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশানুযায়ী তাঁহার নিজের প্রকোষ্ঠে পূজার সমস্ত আয়োজন এবং দেবীর জন্য আলপনা-খচিত একখানা কাঠের পিঁড়ি বৈকালে ঠিক করিয়া রাখা হয়। সন্ধ্যার পরেই পূজায় বসিয়া তিনি অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী কাছে বসিয়া পূজা দেখিতেছিলেন, তাঁহারও ভাবান্তর ঘটিল। রাত্রি যখন ঘনীভূত, তখন শ্রীরামকৃষ্ণের ইঙ্গিতে মন্ত্রচালিতের ন্যায় তিনি উঠিয়া পিঁড়ির উপরে বসিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে যথাবিধানে পূজা করিলেন। তৎপরে উভয়েই গভীর সমাধিতে মগ্ন! কে'ই বা পূজ্য, আর কে'ই বা পূজক! বহুক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া দেবীপাদপদ্মে আজন্মার্জিত সমস্ত সাধনফল, এবং জপমালা চিরতরে সমর্পণ করিলেন। এখানেই তাঁহার সাধক-জীবনের পরিসমাপ্তি, আর উভয়ের দাম্পত্য-জীবনেরও এক অত্যদ্ভুত পরিণতি।

দক্ষিণেশ্বরে একটানা প্রায় পৌনে দুই বৎসর কাটাইবার পর ১২৮০ বঙ্গাব্দের শীতকালে (১৮৭৩ খ্রীঃ) মাতাঠাকুরানী পুনরায় কামারপুকুরে চলিয়া যান। অক্ষয়ের মৃত্যুর পর রামেশ্বর তাহার স্থলে ৺শ্রীশ্রীরাধাকান্ত-বিগ্রহের পূজারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মাতাঠাকুরানী কামারপুকুরে যাইবার পর রামেশ্বরও বায়ুপরিবর্তনের জন্য দেশে গমন করেন এবং স্বল্পকালমধ্যেই সহসা তথায় তাঁহার দেহান্ত ঘটে। রামেশ্বরের অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার নশ্বর দেহ পথিপার্শ্বে ভস্মসাৎ করা হয়। রামেশ্বরের অভিপ্রায় এই ছিল যে, ৺পুরীধামের রাস্তার উপর দিয়া যে সকল সাধু-সন্ন্যাসী যাতায়াত করিবেন, তাঁহাদের চরণচিহ্ন তাঁহার চিতাভস্মের উপর অঙ্কিত হইবে। সাধু-সন্ন্যাসী, আউল-বাউল ও পীর-ফকিরদের উপর রামেশ্বরের শ্রদ্ধাভক্তি ছিল অপরিসীম; এবং তাঁহার যৎসামান্য বিত্ত তিনি উঁহাদের সেবার নিমিত্ত অকাতরে ব্যয় করিতেন।

অমায়িক ব্যবহারের গুণে তিনি উচ্চ-নীচ সকলেরই অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবই নহেন, সমস্ত গ্রামবাসীই শোকাভিভূত হইয়াছিল।

রামেশ্বরের মৃত্যু-সংবাদ দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া পৌছিলে শ্রীরামকৃষ্ণের মনে বড়ই ভয় হইল, চন্দ্রাদেবী উহা সহ্য করিতে পারিবেন কি না। শোকাবেগ হইতে জননীকে রক্ষার নিমিত্ত প্রথমেই কালীমন্দিরে যাইয়া ৺শ্রীশ্রীভবতারিণী-সকাশে তিনি প্রার্থনা জানাইলেন এবং তৎপরে স্বয়ং বৃদ্ধার নিকটে যাইয়া এই দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। আশ্চর্যের বিষয় চন্দ্রাদেবীকে বিশেষ বিচলিত দেখা গেল না, বরঞ্চ শান্ত-ধীরভাবে তিনি বলিলেন যে, সংসার অনিত্য, সকলকেই মরিতে হইবে,—অতএব শোক করা বৃথা। শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন যে, ৺শ্রীশ্রীভবতারিণী তাঁহার জননীর চিত্তকে মায়ামোহের উর্ধ্বে তুলিয়া দিয়াছেন; সুতরাং, আর কোন ভাবনার কারণ নাই। রামেশ্বরের পরলোকগমনের অনতিকাল পরে তাঁহার পুত্র রামলাল দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া পিতার স্থান অধিকার করেন। বহুকাল পর্যন্ত তিনি দক্ষিণেশ্বরে কাটাইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যবর্গ তাঁহাকে 'রামলাল দাদা' বলিয়া ডাকিতেন।

সম্ভবতঃ ১২৮১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (১৮৭৪ খ্রীঃ) মাতাঠাকুরানী দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন। আসিবার সময় পথিমধ্যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছিল। একদল তীর্থযাত্রী স্ত্রীলোকের সহিত তিনি কলিকাতাভিমুখে রওয়ানা হইয়াছিলেন। রাস্তায় একদা কোনও বিস্তীর্ণ প্রান্তর পার হইবার সময় তিনি বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়েন। সহযাত্রীদের সহিত সমান তালে চলিতে না পারিয়া তিনি ক্রমাগত পিছাইয়া পড়িতে লাগিলেন। নিরুপায় হইয়া তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, তাঁহারা যেন সম্মুখবর্তী আশ্রয়স্থল তারকেশ্বরে পৌছিয়া তথায় অপেক্ষা করেন,—তিনি ধীরে ধীরে চলিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবেন। সঙ্গীরা চলিয়া যাইবার পরে ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, কিন্তু লোকালয়ের চিহ্ন পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইল না। জনহীন প্রান্তরে কোথায় আশ্রয় পাইবেন—এই ভাবিয়া যখন তিনি নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়িয়াছেন, তখন দেখিতে পাইলেন যে, মাথায় ঝাঁকড়া-চুলওয়ালা ঘোর কৃষ্ণকায় এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষ তাঁহার দিকে আসিতেছে। ঐ অঞ্চলে তখন চোর-ডাকাতের বড়ই উপদ্রব ছিল।

যমদূতাকৃতি ঐ ব্যক্তিকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। সে নিকটে আসিলে পর তিনি কোন রকমে সাহসে ভর করিয়া নিজের অবস্থা তাহার নিকট ব্যক্ত করিলেন। লোকটার স্ত্রী পিছু পিছু আসিতেছিল, ততক্ষণে সেও আসিয়া মিলিত হইল। মাতাঠাকুরানী তাহাদিগকে ধর্মের মা-বাপ বলিয়া সম্বোধন করিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, দম্পতির মন উহাতে একেবারে গলিয়া গেল। অনিষ্ট করা ত দূরের কথা, উহারা তাঁহাকে নিকটবর্তী গ্রামে লইয়া গিয়া রাত্রিতে পরম যত্নে সেখানে রাখিল এবং পরদিন সকালে নিজেরা সঙ্গে যাইয়া তারকেশ্বরে অপর যাত্রীদের নিকট পৌঁছাইয়া দিল। দম্পতির সহৃদয়তায় মাতাঠাকুরানী একেবারে মুগ্ধ হইলেন এবং বারংবার অনুরোধ করিলেন, তাহারা যেন দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া তাহাদের ধর্মের কন্যাকে একবার দেখিয়া আসে। এই অনুরোধ তাহারা রক্ষা করিয়াছিল। ভালবাসার আকর্ষণে মাতাঠাকুরানীকে দেখিবার নিমিত্ত একাধিকবার তাহারা দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিল এবং শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটেও যথেষ্ট সমাদর পাইয়াছিল।

দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া মাতাঠাকুরানী একাগ্রচিত্তে স্বামী এবং শ্বাশুড়ীর সেবায় মনোনিবেশ করিলেন। প্রথমতঃ শ্বাশুড়ীর নিকটে নহবৎখানাতেই তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট করা হয়, কিন্তু তথায় দুইজনের থাকিবার মত জায়গা বস্তুতঃ ছিল না। মাতাঠাকুরানীর অসুবিধা ও কষ্ট দেখিয়া শম্ভুচরণ মল্লিক মহাশয় তাঁহার বাসের নিমিত্ত কালীবাড়ীর উত্তর দিকের ফটকের বাহিরে সামান্য দূরে একটি ছোট কুটীর নির্মাণ করাইয়া দেন। তজ্জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কাঠ যোগাইয়াছিলেন নেপাল সরকারের একজন বড় রাজকর্মচারী, কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়। তিনি ছিলেন উক্ত সরকারের কাঠের গোলার অধ্যক্ষ এবং কালীবাটীর সন্নিকটেই তিনি বাস করিতেন। উপাধ্যায়জী অতিশয় নিষ্ঠাবান্ এবং ভগবদ্বিশ্বাসী ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি পরম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণেরও তাঁহার প্রতি নিরতিশয় স্নেহভাব ছিল। কুটীর নির্মিত হইলে পর মাতাঠাকুরানী নহবৎখানা ছাড়িয়া তাহাতে বাস করিতে যান। গৃহকর্মে তাঁহাকে সাহায্যের নিমিত্ত, হয় কাপ্তেন বিশ্বনাথ, নতুবা শম্ভুনাথ মল্লিক নিজব্যয়ে একজন পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কুটীরে অবস্থানকালে মাতাঠাকুরানী শ্রীরামকৃষ্ণের আহার্য স্বহস্তে রন্ধনপূর্বক

তাঁহার ঘরে লইয়া গিয়া পরিবেশন করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণও দিনেরবেলায় মাতাঠাকুরানীর কুটীরে প্রায় প্রতিদিন একবার যাইয়া কথাবার্তায় কিয়ৎক্ষণ সেখানে কাটাইয়া আসিতেন।

১২৮২ বঙ্গাব্দের বর্ষাকালে (১৮৭৫ খ্রীঃ) মাতাঠাকুরানী কঠিন আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইবার পর জলবায়ু পরিবর্তনের নিমিত্ত শরৎকালে তিনি জয়রামবাটীতে গমন করেন। কিন্তু সেখানে ব্যাধির পুনরাক্রমণের ফলে তাঁহার অবস্থা এতই সঙ্কটজনক হইয়া দাঁড়ায় যে, ঐ সংবাদ শ্রীরামকৃষ্ণকে পর্যন্ত ভাবিত করিয়া তুলে। রোগ-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া মাতাঠাকুরানী অবশেষে একদা নিকটবর্তী ৺শ্রীশ্রীসিংহবাহিনীর মন্দিরে যাইয়া হত্যা দেন এবং দৈব ঔষধ লাভ করিয়া উহা সেবনে অত্যল্পকালের মধ্যেই রোগমুক্ত হন।

দক্ষিণেশ্বরে ১২৮২ সালের ফাল্গুন মাসে (১৮৭৬ খ্রীঃ) চন্দ্রাদেবী ৮৫ বৎসর বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। মাতাঠাকুরানী তখন জয়রামবাটীতে। জননীর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহাকে অন্তর্জলি করা হইয়াছিল এবং শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে শ্রাদ্ধাদি কর্ম নিষিদ্ধ বলিয়া রামলাল কর্তৃক পিতামহীর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। জননীর পারলৌকিক কোন কার্য করিলাম না ভাবিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ একদা তর্পণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু বারংবার চেষ্টা করিয়াও করপুটে জল ধারণ করিতে পারিলেন না। আঙ্গুল অসাড় হইয়া সমস্ত জল পড়িয়া গেল। বুঝিলেন, গলিতকর্ম পরমহংস অবস্থায় তাঁহার পক্ষে কোন আচার-অনুষ্ঠান পালন করা আর সম্ভবপর নহে। কথিত আছে, তিনি পঞ্চবটীর দিকে গঙ্গাতীরে নির্জনে জননীর জন্য একদিন অনেকক্ষণ কাঁদিয়া 'মাতৃঋণ' পরিশোধ করিয়াছিলেন।

চন্দ্রাদেবীর স্বর্গারোহণের অল্পকাল পরেই শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত এবং সহায়ক শম্ভুচরণ মল্লিক মহাশয়ও পরলোকগমন করেন। শম্ভুচরণ অতিশয় দাতা এবং পরোপকারী ছিলেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলে তাঁহার মনে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, পরোপকারই পরম ধর্ম এবং উহা করিলেই সব কিছু করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার সেই ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হইয়াছিল।

তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরলাভই মানব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। "শম্ভু বললে, 'এখন এই আশীর্বাদ করুন যে, যা টাকা আছে সেগুলি সদ্ব্যয়ে যায়—হাসপাতাল-ডিস্‌পেন্সারি করা, রাস্তা-ঘাট করা, কুয়ো করা এই সবে।' আমি বললাম, 'এসব কর্ম অনাসক্ত হয়ে করতে পারলে ভাল; কিন্তু তা' বড় কঠিন। আর যাই হোক, এটি যেন মনে থাকে যে, তোমার মানব-জন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ; হাসপাতাল-ডিস্‌পেন্সারি করা নয়! মনে কর ঈশ্বর তোমার সামনে এলেন; এসে বল্লেন, তুমি বর লও। তাহলে তুমি কি বলবে, আমায় কতকগুলো হাসপাতাল-ডিস্‌পেন্সারি করে দাও; না বলবে, হে ভগবান, তোমার পাদপদ্মে যেন শুদ্ধা ভক্তি হয়; আর যেন তোমাকে সর্বদা দেখতে পাই। হাসপাতাল-ডিস্‌পেন্সারি এসব অনিত্য বস্তু। ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। তাঁকে লাভ হলে আবার বোধ হয়, তিনিই কর্তা, আমরা অকর্তা। তবে কেন তাঁকে ছেড়ে নানা কাজ বাড়িয়ে মরি? তাঁকে লাভ হলে, তাঁর ইচ্ছায় অনেক হাসপাতাল-ডিস্‌পেন্সারি হতে পারে। তাই বল্‌ছি, কর্ম আদিকাণ্ড; কর্ম জীবনের উদ্দেশ্য নয়'।"*

শম্ভুচরণ যখন রোগশয্যায়, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে একদিন দেখিতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া হৃদয়কে কহিলেন—"শম্ভুর বাতির তেল ফুরিয়ে গেছে।" সেই কথাই সত্য হল। মৃত্যুর দুই-একদিন পূর্বে শম্ভুচরণ হৃদয়ের নিকট বলিয়াছিলেন—"পারের ভাবনা আমার কিছুই নেই। আমি তল্পিতল্পা বেঁধে একেবারে প্রস্তুত হয়েই রয়েছি।" শ্রীরামকৃষ্ণের উপর শম্ভুচরণের অগাধ বিশ্বাস এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার সহধর্মিণীও তুল্যরূপ ভক্তিপরায়ণা ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সময়ই শম্ভুচরণকে তাঁহার দুই নম্বর রসদ্দার বলিয়া উল্লেখ করিতেন। বস্তুতঃ মথুরানাথের পরলোকগমনের পর কয়েক বৎসর পর্যন্ত শম্ভুচরণই শ্রীরামকৃষ্ণের আবশ্যক দ্রব্যাদি যোগাইয়াছিলেন ও সর্বপ্রকারে তাঁহার সেবা-যত্ন করিয়াছিলেন।

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

ভক্ত ও বিদ্বৎসঙ্গে

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, হিন্দুধর্মের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকারের সাধনা শ্রীরামকৃষ্ণ স্বকীয় জীবনে অভ্যাসপূর্বক প্রত্যেকটিতেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। বেদ-তন্ত্র-পুরাণাদিতে লিখিত কোনরূপ সাধন-মার্গেই বিচরণ করিতে তিনি বাকী রাখেন নাই। দ্বৈতভাবে সাধনা আরম্ভ করিয়া—সমস্ত সোপানরাজি ক্রমান্বয়ে অতিক্রমপূর্বক অবশেষে পূর্ণাদ্বৈতভাবে তিনি প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি বলিতেন যে, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত,—ব্রহ্মানুভূতির তিনটি স্তর মাত্র ; অদ্বৈতজ্ঞানই উপলব্ধির শেষ সীমা। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মকে তিনি হিন্দুধর্মেরই প্রকারভেদ করিয়া বর্ণনা করিতেন। শিখ-ধর্মের প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধার ভাব ছিল। তিনি বলিতেন যে, শিখ গুরুগণ জনকরাজার পন্থী,—রাজকার্য ও আধ্যাত্মিক সাধনা উভয়ই তাঁহারা একসঙ্গে বজায় রাখিয়াছিলেন।

হিন্দুধর্মের বিভিন্ন মতবাদ ও সাধনপ্রণালী পরীক্ষা করিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ ক্ষান্ত ছিলেন না। খ্রীষ্টধর্মের এবং সুফীসাধন-প্রণালীর ভিতর দিয়া ইস্‌লামের মূলতত্ত্বও তিনি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। যখন যে তত্ত্ব সম্পর্কে মনে কৌতূহল জন্মিত, উহাই হাতে-কলমে পরীক্ষা না করিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না। স্বীকার করিতেই হইবে যে, ঈশ্বর-তত্ত্বের অনুশীলন সম্পর্কে তাঁহার মনোভাব এবং কার্যপ্রণালী ছিল খাঁটি বৈজ্ঞানিক। স্বয়ং পরীক্ষা না করিয়া কোন কিছুই তিনি মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন না।

এ পর্যন্ত যেটুকু আলোচনা হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিগত এবং সাধক-জীবনের কথা। ইতিহাসে যে ভূমিকা তিনি গ্রহণ করিবেন, সাধক-জীবনকে তাহার প্রস্তুতিকাল বলা যাইতে পারে। যুগপ্রবর্তক এবং সর্বজনমান্য লোকশিক্ষকরূপেই আমাদের জাতীয় জীবনে ও ইতিহাসে তাঁহার স্থান। এক গুরুত্বপূর্ণ যুগসন্ধিক্ষণে, ইতিহাসের এক অতি সঙ্কটময় মুহূর্তে জাতির চিন্তাধারার এবং দৃষ্টিভঙ্গীর তিনি পরিবর্তন সাধিত করিয়াছিলেন। ১২৮২ বঙ্গাব্দে (১৮৭৫ খ্রীঃ) ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যখন ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজে তাঁহার নাম প্রথম প্রচার করেন, বস্তুতঃ তখন হইতেই বাঙ্গালীর জাতীয়

জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রভাবের সূচনা। কিন্তু দেশীয় পণ্ডিত ও তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে তৎপূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাইয়াছিলেন। এ-বিষয়ে যৎসামান্য বর্ণনাপূর্বক তৎপরে নব্যবঙ্গের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

মথুরানাথের আমন্ত্রণে তৎকালপ্রসিদ্ধ দেশবরেণ্য পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ এবং গৌরীকান্তের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের বিষয় পূর্বে কথিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতারলক্ষণোপেত বলিয়া সিদ্ধান্ত এবং সেই মর্মে ঘোষণা করিবার পর উভয়েই তাঁহার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট এবং তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইবেন—ইহা নিতান্ত প্রত্যাশিত। বস্তুতঃ হইয়াছিল তাহাই। বৈষ্ণবচরণ পরে আরও কয়েকবার শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভের নিমিত্ত দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার ভক্তি-শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ অন্তরঙ্গ হইতে পারিয়াছিলেন।

গৌরীপণ্ডিত ছিলেন বড়ই দাম্ভিক, তার্কিক ও বিদ্যাভিমানী। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হয়। ১২৬৮ বঙ্গাব্দে (১৮৬১ খ্রীঃ) প্রথম সাক্ষাৎকারের নয় বৎসর পরে (১৮৭০ খ্রীঃ) তিনি দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আসেন। তখন তাঁহার মান-যশের আকাঙ্ক্ষা ও তার্কিকতার নেশা টুটিয়া গিয়াছে, ঈশ্বরলাভের জন্য তিনি নিরতিশয় ব্যাকুল। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসিয়া তিনি যেন পথের নির্দেশ পাইলেন এবং অন্তরে পরম শান্তিলাভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার কয়েকমাস কাটিয়া গেল। ওদিকে পরিবারবর্গ অস্থির হইয়া তাঁহাকে শীঘ্র বাড়ী ফিরিবার নিমিত্ত বারংবার তাগিদ পাঠাইতে লাগিলেন; কারণ, তাঁহারা শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, গৌরীপণ্ডিতের জীবনে এক মহা পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছে, —তিনি বৈরাগ্যের দিকে প্রবলভাবে ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন। গৌরীকান্তের হৃদয়ে স্বভাবতঃ আশঙ্কা জন্মিল যে, তাঁহাকে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে হয় ত বাড়ী হইতে সহসা কোনদিন লোক আসিয়া উপস্থিত হইবে। তিনি দেখিলেন, সঙ্কট আসন্ন এবং আর এখানে থাকা উচিত নহে। তাই নিজের কর্তব্য সম্পর্কে মনে মনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া একদা তিনি সজলনেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। বিস্মিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ স্নেহপূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা

করিলেন—"এ কি গৌরী! ব্যাপার কি? তুমি কোথায় যাবে?" বিনীতভাবে গৌরীপণ্ডিত বলিলেন—"আশীর্বাদ করুন যেন আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, ঈশ্বরলাভের পূর্বে আর যেন সংসারে না ফিরি।" সেই যে তিনি বিদায় লইলেন, উহাই চিরবিদায়; তাঁহার আর কোন সন্ধান আত্মীয়-বান্ধব কেহই জানিতে পারিল না।

গৌরীপণ্ডিতের ন্যায় আরও একজন কৃতবিদ্য এবং বৈরাগ্যবান্ পুরুষ ঐ সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন; উঁহার নাম —নারায়ণ শাস্ত্রী। রাজপুতানার এক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-পরিবারে তাঁহার জন্ম। সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল তিনি গুরুগৃহে যাপন ও বিবিধ দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শোনা যায়, জয়পুরের মহারাজা তাঁহাকে মোটা বৃত্তি দিয়া নিজের সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সম্মানজনক পদবী প্রত্যাখ্যানপূর্বক নব্যন্যায় পড়িবার উদ্দেশ্যে তিনি নবদ্বীপে চলিয়া আসেন। তথায় প্রবীণ অধ্যাপকদিগের নিকট নব্যন্যায়ের পাঠ সমাপনান্তে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন এবং নিয়তির চক্রে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন। নারায়ণ শাস্ত্রী আবাল্য শাস্ত্রপাঠে নিরত থাকিলেও শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না; ব্রহ্মবস্তুলাভের জন্য তাঁহার প্রাণ ছিল সর্বদাই ব্যাকুল। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্নিধানে আসিবামাত্র তিনি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন, এতদিনে সত্যকার ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সাক্ষাৎকার তিনি পাইয়াছেন। 'ব্রহ্মোপলব্ধি', 'সমাধি, প্রভৃতির কথা এতকাল শুধু বইয়ের পাতায় যাহা পড়িয়াছেন, এখানে তাহা প্রত্যক্ষ নয়নগোচর হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, এ সুযোগ কিছুতেই ছাড়া উচিত নহে, যেভাবে হউক, এই মহাপুরুষের অনুগ্রহলাভ করিতেই হইবে। কালীবাটীর অতিথি-শালায় অবস্থানপূর্বক তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপালাভের নিমিত্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যাকুলতা এবং বিনয়, বৈরাগ্য প্রভৃতি দর্শনে তৎপ্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়েও পরম স্নেহভাব জন্মিল। নারায়ণ শাস্ত্রীর আগ্রহাতিশয্যে অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে সন্ন্যাসদীক্ষা প্রদানে সম্মত হইলেন। এক শুভদিনে দীক্ষাদান-কার্য সম্পন্ন হইল। তৎপরে নারায়ণ শাস্ত্রী আর দক্ষিণেশ্বরে রহিলেন না; শ্রীগুরুর চরণবন্দনাপূর্বক তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। উহার পর তাঁহার সম্পর্কে আর কোন সঠিক সংবাদ জানা যায়

না। কেহ কেহ এরূপ বলিতেন যে, তিনি গৌহাটির নিকটবর্তী বশিষ্ঠাশ্রমে অবশিষ্ট জীবন সাধনভজনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং সেখানেই দেহরক্ষা করেন।

সেকালের প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী পণ্ডিতদিগের মধ্যে একজন ছিলেন বর্ধমানরাজের সভাপণ্ডিত—পদ্মলোচন। তখনকার দিনে বঙ্গদেশে শাস্ত্রচর্চায় ন্যায় এবং তন্ত্রেরই ছিল প্রাধান্য ; বেদান্তের আলোচনা বিশেষ হইত না। কিন্তু পণ্ডিত পদ্মলোচন ৺কাশীতে যাইয়া বেদান্তশাস্ত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, উপরন্তু তন্ত্রোক্ত সাধনাও তিনি করিতেন। যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার নাম শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা মনে মনে অনেক দিন যাবৎ পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে বর্ধমানে যাইবার জন্যই তিনি প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন যে, পণ্ডিত পদ্মলোচনের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হওয়াতে বায়ুপরিবর্তনের নিমিত্ত তাঁহাকে আরিয়াদহের নিকটে গঙ্গাতীরস্থ কোনও বাগানবাড়ীতে আনিয়া রাখা হইয়াছে এবং গঙ্গার নির্মল বায়ুসেবনে ইতিমধ্যেই তিনি অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণে শ্রীরামকৃষ্ণ অবিলম্বে তথায় তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলেন এবং প্রথম মিলনেই উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের মধুরকণ্ঠে মাতৃসঙ্গীত শুনিয়া পণ্ডিত পদ্মলোচনের নয়নযুগল হইতে প্রেমাশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, তিনি সহজেই উপলব্ধি করিলেন যে, এ ব্যক্তি সাধারণ মানব নহেন, লোকোত্তর পুরুষ। দুইতিনবার দেখা-সাক্ষাতের ফলেই উভয়ের পরিচয় গভীর আত্মীয়তায় পরিণত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে ১২৭০ বঙ্গাব্দে (১৮৬৩ খ্রীঃ) মথুরানাথকর্তৃক দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে এক বিরাট উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ উপলক্ষে বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণপূর্বক মথুরবাবু প্রচুর দানদক্ষিণা করিয়াছিলেন। পণ্ডিত পদ্মলোচন ছিলেন অত্যন্ত আচারনিষ্ঠ এবং অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী। অতএব তাঁহাকে সরাসরি নিমন্ত্রণ করিতে সাহস না পাইয়া 'বাবা'র দ্বারা অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ এ ঘটনার যেভাবে উল্লেখ করেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল: "মথুরের কথায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—'হ্যাগা, তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে না?' তাইতে বলেছিল—'তোমার সঙ্গে হাড়ির বাড়ীতে গিয়ে খেয়ে আসতে পারি ; কৈবর্তের বাড়ীতে

সভায় যাব, এ আর কি বড় কথা" ?" এই একটিমাত্র উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায় পণ্ডিত পদ্মলোচন শ্রীরামকৃষ্ণকে কতদূর শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। শেষ পর্যন্ত কিন্তু পদ্মলোচন সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সহসা পীড়া বৃদ্ধি পাওয়াতে মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়া তিনি ত্বরায় ৺কাশীধামে চলিয়া যান এবং অল্পদিনের মধ্যেই তথায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ একবার দেশভ্রমণে আসিয়া বরাহ-নগরে জনৈক ভদ্রলোকের বাড়ীতে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তখনও পর্যন্ত যদিও তিনি আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন নাই, তথাপি বেদশাস্ত্রের ব্যাখ্যানে অদ্বিতীয় এবং দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হিসাবে তাঁহার খ্যাতি দেশময় রটিয়াছে। তাঁহার নাম শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বরাহনগরে তাঁহাকে দেখিতে যান। উক্ত সাক্ষাৎকারের বিষয় তিনি শিষ্যদের নিকট এভাবে বলিয়াছিলেন, "সিঁথির বাগানে দেখতে গিয়েছিলাম ; দেখলাম, একটু শক্তি হয়েছে ; বুকটা সর্বদা লাল হয়ে রয়েছে ; বৈখরা অবস্থা—দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই কথা (শাস্ত্রকথা) কইছে, ব্যাকরণ লাগিয়ে অনেক কথার (শাস্ত্রবাক্যের) মানে সব উল্টো-পাল্টা করতে লাগলো ; নিজে একটা কিছু করবো, একটা মত চালাবো, এ অহঙ্কার ভেতরে রয়েছে।" অপর পক্ষে দয়ানন্দ সরস্বতী শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহার এবং ভাবসমাধি দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমরা বেদবেদান্ত শুধু পড়েছি ; আর ইনি তার তত্ত্বসমূহ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছেন। এঁকে দেখে বুঝতে পারলাম যে, পণ্ডিতেরা শাস্ত্র মন্থন করে ঘোলটা খান, আর মহাপুরুষেরা খান সমস্ত মাখনটা।"

জয়নারায়ণ নামক একাধারে জ্ঞানী ও ভক্ত জনৈক পণ্ডিতের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের খুব আলাপ-পরিচয় ও হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। উঁহার সম্পর্কে তিনি বলিতেন—"অতবড় পণ্ডিত, কিন্তু অহঙ্কার ছিল না ; নিজের মৃত্যুর কথা জানতে পেরে বলেছিল, কাশী যাবে ও সেখানে দেহ রাখবে ; তাই হয়েছিল।"

আরিয়াদহে কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্য নামক একজন পরম ভক্তিমান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ঐ সময়ে বাস করিতেন। উঁহার সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের বড়ই ভাব ছিল। বিষয়ী লোকদের আনাগোনায় ও তাহাদের কথাবার্তায় বিরক্তি বোধ করিলে শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে কৃষ্ণকিশোরের কাছে চলিয়া যাইতেন। তথায় ভাগবত, অধ্যাত্মরামায়ণ প্রভৃতি শুনিয়া তাঁহার মনের অস্বস্তি দূরীভূত হইত।

কৃষ্ণকিশোরের ভক্তি-বিশ্বাস অতি অসাধারণ ছিল। তজ্জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ দৃষ্টান্তস্বরূপ শিষ্যদের নিকট উহার উল্লেখ করিতেন। "কৃষ্ণকিশোরের কি বিশ্বাস! বৃন্দাবনে গিছিল, সেখানে একদিন জলতৃষ্ণা পেয়েছিল। কুয়ার কাছে গিয়ে দেখে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে, 'আমি নীচজাতি, আপনি ব্রাহ্মণ; কেমন করে আপনার জল তুলে দেব?' কৃষ্ণকিশোর বললে, 'তুই বল 'শিব'। 'শিব' 'শিব' বললেই তুই শুদ্ধ হয়ে যাবি'। সে 'শিব' 'শিব' বলে জল তুলে দিলে। অমন আচারী ব্রাহ্মণ সেই জল খেলে! কি বিশ্বাস!

"আরিয়াদহের ঘাটে একটি সাধু এসেছিল। আমরা একদিন দেখতে যাবো ভাবলুম। আমি কালীবাড়ীতে হলধারীকে বললাম, কৃষ্ণকিশোর আর আমি সাধু দেখতে যাবো। তুমি যাবে? হলধারী বললে, 'একটা মাটির খাঁচা দেখতে গিয়ে কি হবে?' হলধারী গীতা বেদান্ত পড়ে কি না! তাই সাধুকে বল্লে 'মাটির খাঁচা'। কৃষ্ণকিশোরকে গিয়ে আমি এই কথা বল্লাম। সে মহা রেগে গেল। আর বললে, 'কি! হলধারী এমন কথা বলেছে? যে ঈশ্বরচিন্তা করে, যে রাম চিন্তা করে, আর সেইজন্য সর্বত্যাগ করেছে, তার দেহ মাটির খাঁচা! সে জানে না যে, ভক্তের দেহ চিন্ময়!' এত রাগ—কালীবাড়ীতে ফুল তুলতে আসতো, হলধারীর সঙ্গে দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নিত। কথা কইবে না!"

প্রাপ্তবয়স্ক দু'টি পুত্রের অকাল-মৃত্যুতে কৃষ্ণকিশোরকে দারুণ শোক ভুগিতে হইয়াছিল। তথাপি তিনি সর্বদা ভগবদ্ভাবে বিভোর থাকিতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে প্রায়শঃ যাতায়াত করিতেন।

এ যাবৎ যেসকল দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয়ের বিষয় বলা হইল, তাহা সমস্তই বাঙ্গালা ১২৮২ সালের (১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের) আগেকার ব্যাপার, যদিও প্রত্যেক ঘটনার সন-তারিখ সঠিক জানা যায় না। উক্ত সালে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এক সম্পূর্ণ নূতন পর্বের সূচনা দেখিতে পাই। বাল্য ও কৈশোর জীবনের বৃত্তান্তে আমরা দেখিয়াছি সরল অনাড়ম্বর পল্লীবাসীদের সহিত,—অর্থাৎ দেশের শাশ্বতসাম্পদ চিরন্তন জীবনধারার সহিত তাঁহার ছিল কী সুনিবিড় মমত্বের বন্ধন! শেষ বয়স পর্যন্ত এই প্রাণের টান রহিয়াছিল অক্ষুণ্ন। দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পর সাধক-জীবনের বৃত্তান্তে আমরা দেখিতে

পাই কিরূপ অসীম যত্ন ও অধ্যবসায়ের সহিত তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন ভারতবর্ষের নিজস্ব এবং গুরুপরম্পরায় আগত বহুবিধ সাধনার প্রণালী। আবার তৎকর্তৃক পুরাণপাঠাদি শ্রবণে ও দেশীয় পণ্ডিত ব্যক্তিদের সহিত ভাবের আদান-প্রদানে আমরা লক্ষ্য করি ভারতের সনাতন শিক্ষা ও সংস্কৃতির বহুমুখী ধারার সহিত কিরূপে সংসাধিত হইয়াছিল তাঁহার সুগভীর ও বিস্তৃত পরিচয়। কিন্তু শুধু পুরাতন ও প্রচলিতকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেই তিনি যে ধরাধামে আসিয়াছিলেন, তাহা কখনই নহে,—নূতনকে এবং ভবিষ্যৎকে লইয়াই বিধিনির্দিষ্ট ছিল তাঁহার প্রধান কার্য ও লীলাখেলা। যে ঘটনা তাঁহাকে নব্যবঙ্গের ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে টানিয়া আনিবে, আমরা এখন উহার সমীপবর্তী হইয়াছি। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সহিত সাক্ষাৎকারই সেই ঘটনা; উহা বঙ্গদেশের, তথা ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

কেশবচন্দ্র ও ব্রাহ্মনেতৃবৃন্দ

১২৮২ বঙ্গাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৯৩ বঙ্গাব্দে তিরোধানের সময় পর্যন্ত (১৮৭৫-১৮৮৬ খ্রীঃ) সম্পূর্ণ বারো বৎসরকাল শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষভাবে ধর্মপ্রচারে রত ছিলেন। অথবা 'ধর্মপ্রচার' শব্দটি এক্ষেত্রে ব্যবহার না করাই বোধ হয় সঙ্গত; কারণ, ধর্মপ্রচার বলিতে সাধারণতঃ একটা কোন নির্দিষ্ট মতবাদের প্রচারই বুঝায়, আর যিনি ধর্মপ্রচারক তাঁহাকে সাধারণতঃ নানা স্থানে ভ্রমণপূর্বক প্রতিপক্ষদের সহিত তর্কবিতর্কের দ্বারা নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট দেখা যায়। এমন কি, ভয় দেখাইয়া, প্রলোভনের সাহায্যে, কিংবা বলপ্রয়োগে ধর্মপ্রচারের দৃষ্টান্তও বিরল নহে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কার্যাবলীর মধ্যে এসব কিছুই ছিল না। 'মতুয়ার বুদ্ধি' (dogmatism)-কে তিনি অত্যন্ত হেয় এবং দূষণীয় মনে করিতেন। কোন বিশেষ মতবাদ তিনি সৃষ্টি করেন নাই, কিংবা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ও গঠন করিয়া যান নাই। আর নিজেকে জাহির করিবার, খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিবার বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি তাঁহার মধ্যে ছিল—একথা আমরা কল্পনায়ও আনিতে পারি না। 'গুরু, কর্তা, বাবা'—এই তিন নামেতেই তিনি ভয় পাইতেন। তাঁহার কাজের যথার্থ বর্ণনা করিতে গেলে বলিতে হয় যে, তিনি শুধু এক জায়গায় বসিয়া থাকিয়া দেশময় আধ্যাত্মিক ভাবের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার দিব্য জীবন এবং ধর্মোপদেশের প্রভাবে দেশব্যাপী এক আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত হইয়াছিল; উহা এখনও পর্যন্ত কার্যকরী রহিয়াছে, এবং নিশ্চয়ই ভবিষ্যতেও বহুকাল পর্যন্ত থাকিবে,—সম্ভবতঃ আরও ব্যাপকতা লাভ করিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি সকল শ্রেণীর এবং সকল সম্প্রদায়ের লোকের সহিত অনায়াসে মিশিতে এবং আত্মীয়তা স্থাপন করিতে পারিতেন। যদিও ইংরেজী শিক্ষার তিনি কখনও ধার ধারেন নাই, তথাপি নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ ও যুবসমাজ কোন্ ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত, উহা জানিবার নিমিত্ত তাঁহার মনে প্রবল আগ্রহ ছিল। তাই ব্রাহ্মদের উপাসনা দেখিতে ও তাঁহাদের ভজন-সঙ্গীতাদি শুনিতে তিনি মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে যাইতেন। ১২৭১ বঙ্গাব্দে (১৮৬৩ খ্রীঃ) এইরূপে একবার আদিব্রাহ্মসমাজে

উপস্থিত হইয়া তিনি সর্বপ্রথম কেশবচন্দ্রকে দেখিতে পান; কিন্তু কোন আলাপ-পরিচয় তখন হয় নাই। বেদীর উপরে সমাসীন অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তদের সহিত কেশবচন্দ্র ধ্যান করিতেছিলেন। অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সাহায্যে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিতে পাইলেন যে, অন্যান্যেরা শুধু চোখ বুজিয়া ধ্যানের ভান করিতেছেন, একমাত্র কেশবচন্দ্রেরই মন ধ্যেয় বস্তুতে নিবদ্ধ রহিয়াছে। তখনই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কেশবের ভিতরে প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তি বিরাজমান। ঘটনাটি তিনি নিজমুখে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা এভাবে লিপিবদ্ধ আছে:—"বহুকাল পূর্বে আমি একদিন বুধবারে জোড়াসাঁকোর ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন দেখিলাম, নবযুবক কেশবচন্দ্র বেদীতে বসে উপাসনা করিতেছেন, দুইপার্শ্বে শত শত উপাসক বসে আছেন। ভাল করে তাকায়ে দেখলাম যে, কেশবচন্দ্রের মনটা ব্রহ্মেতে মজে গেছে, তাঁর ফাতনা ডুবেছে। সেই দিন হইতেই তাঁর প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হয়ে পড়িল। আর যেসকল লোক উপাসনা করিতে বসেছিল, দেখলাম, যেন তারা ঢাল তলোয়ার বর্শা লইয়া বসে আছে, তাদের মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল, সংসারাসক্তি রাগ অভিমান ও রিপুসকল যেন ভিতরে কিল্‌বিল্‌ করছে।" *

দশ বৎসর পরে কেশবচন্দ্র যখন ব্রাহ্মসমাজের এবং ইংরেজী-শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা—তখন এই নেতার উপরেই শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের আকর্ষণী-শক্তি প্রয়োগ করিলেন। ১২৮১ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন অথবা চৈত্র মাসে (১৮৭৫ খ্রীঃ, ১৫ই মার্চ) দক্ষিণেশ্বরের অদূরবর্তী বেলঘরিয়া নামক স্থানে জয়গোপাল সেনের 'তপোবন' নামক বাগান-বাড়ীতে কেশবচন্দ্র সদলবলে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় একদিন পূর্বাহ্ণে হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া একখানি ঠিকা গাড়ীতে চড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। বাগানবাড়ীর ফটকে গাড়ী পৌঁছিলে হৃদয়রা প্রথমে ভিতরে গিয়া খবর দিলেন যে, তাঁহার ঈশ্বরভক্ত মাতুল হরিকথা শুনিতে বড়ই ভালবাসেন, হরিনামে সমাধিস্থ হইয়া পড়েন; তিনি কেশবচন্দ্রের সহিত দেখা করিতে ও তাঁহার মুখে ভগবৎপ্রসঙ্গ শুনিতে আসিয়াছেন। কেশবচন্দ্র তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ লইয়া আসিতে কহিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবেশ করিলে পর তাঁহাকে দেখিয়া কেশবচন্দ্রের ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তদের একটা খুব উচ্চ ধারণা মোটেই

* ভাই গিরিশচন্দ্র সেন প্রণীত "শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবন"

জন্মিল না, আগন্তুককে একজন অতি সামান্য ব্যক্তি বলিয়াই তাঁহাদের মনে হইল। সাধুগিরি বেশভূষা শ্রীরামকৃষ্ণের কোনকালেই ছিল না। সেদিন তাঁহার পরনে ছিল একখানি অতি সাধারণ লালপেড়ে ধুতি; গায়ে জামা ছিল না, ধুতির খুঁটখানি শুধু কাঁধের উপর ঝুলানো ছিল। ব্রাহ্মভক্তমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই তিনি কহিলেন—'বাবু, তোমরা না কি ঈশ্বরদর্শন করে থাক, সে-দর্শন কিরূপ আমি জানতে চাই।' এইরূপে ভগবৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ হইবার অল্পক্ষণ পরেই তিনি—'কে জানে মন কালী কেমন, ষড়্‌দর্শনে মিলে না দরশন'—গানটি গাহিতে গাহিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তখনও পর্যন্ত কেশবচন্দ্র ও তাঁহার পার্ষদবৃন্দের মনে সন্দেহের ভাব; তাঁহারা ভাবিলেন, ঐ অবস্থা হয় স্নায়বিক বিকারের ফল, নতুবা একটা ভেলকিবাজি। মাতুলের সমাধি ভাঙ্গাইবার নিমিত্ত হৃদয়রাম গম্ভীরস্বরে ওঁ-কার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, এবং অপর সকলকেও তাহাই করিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ ধরিয়া সকলে মিলিয়া ওঁ-কার উচ্চারণের ফলে ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি ভঙ্গ হইল। তাঁহার মুখমণ্ডল তখন এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত—এক অপার্থিব আনন্দের রেখা তাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অর্ধবাহ্যদশায় নানাবিধ তত্ত্বকথা অতি সহজ সরল ভাষায় তিনি অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন। সেই সকল উচ্চাঙ্গের কথা শুনিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন একাই বক্তা। কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গেরা সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছেন। ছোটখাট নানা উদাহরণের সাহায্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবানের বহুরূপিত্ব বুঝাইতে লাগিলেন। ঈশ্বর শুধু সাকার কিংবা নিরাকার হইতে পারেন না। জগদীশ্বরের স্বরূপ ও মহিমা নির্ণয় করা মানুষের ক্ষুদ্রবুদ্ধির পক্ষে সাধ্যাতীত। তিনি স্বয়ং যদি কৃপা করিয়া জানান, তবেই শুধু মানুষ তাঁহাকে জানিতে পারে। ভগবানের প্রকাশের একটিমাত্র দিক্ দেখিয়া যে-ব্যক্তি মনে করে ভগবানকে পুরাপুরি জানিয়াছে, তাহার জ্ঞান অন্ধের হাতী দেখার মতই হইয়া থাকে। কয়েকজন অন্ধ ব্যক্তি একটা হাতীর গায়ে হাত বুলাইয়া জানিতে চেষ্টা করিতেছিল, হাতী কি ধরনের জীব। যে লোকটি হাতীর পায়ে হাত দিয়াছিল, সে কহিল হাতী একটা গোল থামের মত; যে ব্যক্তি শুঁড়ে হাত দিয়াছিল, সে কহিল যে গোল বটে, তবে থামের মত অত বড় নয়, এবং একটা দিক ক্রমশঃ সরু হইয়া

গিয়াছে। যে ব্যক্তি হাতীর কানে হাত বুলাইয়াছিল, সে বলিল—ওসব কিছুই নয়, হাতী জীবটা চ্যাপ্টা কুলোর মত ইত্যাদি, ইত্যাদি। ভগবানের সম্পর্কেও কোন-কিছু না জানিয়া মানুষের ক্ষুদ্রবুদ্ধি এরূপ নানাবিধ উদ্ভট ধারণা করিয়া বসে।

তৎপরে তিনি কহিলেন বহুরূপী জানোয়ারের গল্প। একজন শৌচে গিয়াছিল। সেখানে দেখিতে পাইল যে, গাছের উপর একটি জানোয়ার রহিয়াছে। সে আসিয়া আর একজনকে বলিল—'দেখ, অমুক গাছে একটি সুন্দর লাল রংয়ের জানোয়ার দেখে এলাম।' লোকটি উত্তর করিল, 'আমি যখন গিয়েছিলাম, তখন আমিও দেখেছি ; তা সে লাল রং হতে যাবে কেন? সে ত সবুজ রং।' আর একজন কহিল, 'না, না, আমি দেখেছি, হলদে।' এইরূপে কেহ বা কহিল জরদা, কেহ বেগুনী, কেহ নীল ইত্যাদি। শেষে কলহ। তখন সকলে মিলিয়া গাছতলায় গিয়া দেখে একজন লোক বসিয়া রহিয়াছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, 'আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটাকে বেশ ভালরূপেই জানি—তোমরা যা' যা' বলছ, সবই সত্য—সে কখনো লাল, কখনো সবুজ, কখনো হল্‌দে, কখনো নীল, আরও সব কত কি হয়! বহুরূপী। আবার কখনো দেখি কোন রঙই নাই। কখনও সগুণ, কখনও নিগুর্ণ।' গল্পটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, যে-ব্যক্তি সর্বদা ঈশ্বর চিন্তা করে, সেই জানিতে পারে ঈশ্বরের স্বরূপ কি। সে-ব্যক্তি জানে যে তিনি নানারূপে দেখা দেন, নানাভাবে দেখা দেন—তিনি সগুণ, আবার তিনি নিগুর্ণ। এই ধরনের আরও কত গল্প, কত উপদেশপূর্ণ কথাই তিনি বলিলেন। শ্রোতৃবর্গের সকলেরই মনে হইল অত সহজ ভাষায় এমন প্রাণস্পর্শী তত্ত্বকথা জীবনে পূর্বে কখনও শুনেন নাই। কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অনুচরবর্গের সহিত আলাপ-পরিচয় হওয়াতে শ্রীরামকৃষ্ণও নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন। উভয় পক্ষেরই মনে হইল তাঁহারা যেন পরস্পরের কত নিকট আত্মীয় এবং কত যুগের পরিচিত! শ্রীরামকৃষ্ণ রহস্যচ্ছলে বলিলেন—"গরুর পালে অন্য জন্তু এলে শিং দিয়ে গুঁতিয়ে তাড়িয়ে দেয়, কিন্তু অন্য গরু এলে পর স্বজাতি বলে কত খাতির,—তখন গা' চাটাচাটি করে।" খুব হাসির রোল পড়িয়া গেল। স্নানাহার ভুলিয়া ব্রাহ্মভক্তবৃন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পান করিতেছিলেন। সময়ের প্রতি কাহারও ভ্রূক্ষেপ

ছিল না। যখন হুঁশ হইল যে বেলা অত্যধিক হইয়াছে, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ গাত্রোত্থান করিলেন। উঠিবার সময় কেশবচন্দ্রের প্রতি প্রসন্নভাবে ও রহস্যচ্ছলে বলিলেন, 'তোমার লেজ খসেছে।' একথার অর্থ ঠিক ধরিতে না পারিলেও সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। তখন কেশবচন্দ্র বাধাদানপূর্বক কহিলেন, 'তোমরা হেসো না, এর কিছু মানে আছে; এঁকে জিজ্ঞাসা করি।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন "যতদিন ব্যাঙাচির লেজ না খসে, তার কেবল জলে থাকতে হয়—আড়ায় উঠে ডাঙ্গায় বেড়াতে পারে না; যেই লেজ খসে, অমনি লাফ দিয়ে ডাঙ্গায় পড়ে। তখন জলেও থাকে, আবার ডাঙায়ও থাকে। তেমনি মানুষের যতদিন অবিদ্যার লেজ না খসে, ততদিন সংসার-জলে পড়ে থাকে। অবিদ্যার লেজ খসলে, জ্ঞান হলে—তবে মুক্ত হয়ে বেড়াতে পারে—আবার ইচ্ছা হলে সংসারে থাকতেও পারে।" *

তিন-চার ঘণ্টা পর্যন্ত সকলকে এক অপার্থিব ও অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দরস বিতরণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ অবশেষে বিদায় লইলেন। কেশবচন্দ্রের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, এই অপণ্ডিত ও পাড়াগেঁয়ে ব্রাহ্মণ দেখিতে নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তি হইলেও বস্তুতঃ অতি অসাধারণ মানব এবং অতুল অধ্যাত্ম-সম্পদের অধিকারী। ইঁহার প্রতি এক প্রবল ভালবাসার আকর্ষণ তিনি বোধ করিতে লাগিলেন। কখনও একাকী, কখনও দলবলসমেত মধ্যে মধ্যে তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাইতে আরম্ভ করিলেন। কখনও বা স্টীমার ভাড়া করিয়া যাইতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে উহাতে তুলিয়া লইয়া সকলে মিলিয়া গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করিতেন। নানাবিধ আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ ও ভজনসঙ্গীতাদি চলিতে থাকিত। কথা বলিতে বলিতে কিংবা গান গাহিতে গাহিতে ভাবের উদ্দীপনায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এক একবার সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন; উপস্থিত সকলেরই হৃদয় তখন যেন এক ঊর্ধ্বলোকে উন্নীত ও স্বর্গীয় আনন্দে পরিপ্লুত হইত।

কেশবচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং অনেক বিষয় পাশ্চাত্ত্যভাবে অনুপ্রাণিত হইলেও ভারতীয় চিন্তা এবং সাধনার ধারার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার অভাব কখনও পরিলক্ষিত হয় নাই। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল খুবই উদার। যেমনি তাঁহার প্রত্যয় জন্মিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ একজন যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী, অমনি

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

বক্তৃতামঞ্চ হইতে এবং লেখনীর সাহায্যে তিনি এই অত্যাশ্চর্য মহাপুরুষের কথা উৎসাহভরে ও ব্যাপকভাবে প্রচার করিতে লাগিলেন। উক্ত প্রচারের ফলেই কলিকাতার বহু বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তি এবং ব্রাহ্মসমাজের অনেক উৎসাহী যুবক শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাইতে আরম্ভ করেন। বস্তুতঃ, কেশবচন্দ্রই শ্রীরামকৃষ্ণকে নব্যবঙ্গের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আনিয়াছিলেন।*

ব্রাহ্মসমাজের উৎসবাদিতে কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণপূর্বক সমাজ-মন্দিরে লইয়া যাইতেন এবং সকলে মিলিয়া আনন্দ করিতেন। কেশবচন্দ্রের প্রতিও শ্রীরামকৃষ্ণের এরূপ গভীর ভালবাসা জন্মিয়াছিল যে, কেশবকে কিছুদিন না দেখিলে তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন এবং নিজেই তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইতেন। তাঁহার পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়বর্গের সহিতও তিনি নিরতিশয় স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কেশবের জননীকে তিনি

* কেশবচন্দ্র-পরিচালিত 'ইণ্ডিয়ান মিরর', 'সুলভ সমাচার', ধর্মতত্ত্ব' ও 'নিউ ডিস্পেন-সেশন' পত্রিকাগুলিতে পরমহংসদেব সম্পর্কে সংবাদাদি মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইত। এসকল পত্রিকার পুরাতন সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে এখন আর পাওয়া যায় না। বিচ্ছিন্ন কিছু কিছু অংশ কিংবা উদ্ধৃতি মাত্র পাওয়া যায়। 'নববিধান পাবলিকেশন কমিটি' কর্তৃক প্রকাশিত 'শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসেব উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবন' নামক পুস্তিকার পবিশিষ্টে ঐসকল রচনার যৎসামান্য অংশ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস তাঁহাদের রচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (সমসাময়িক দৃষ্টিতে)' নামক গ্রন্থে আরও বহু বিস্মৃতপ্রায় জিনিস সংকলনপূর্বক পাঠকসমাজকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দেব ২৮শে মার্চ তারিখে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় কেশবচন্দ্রের যে মন্তব্যটি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার বাংলা অনুবাদ এখানে দেওয়া হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে উহাই সম্ভবতঃ তাঁহার সর্বপ্রথম প্রকাশ্য ঘোষণা। বেলঘরিয়ায় উভয়ের সাক্ষাৎকারের অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। "সম্প্রতি একজন সত্যিকার হিন্দু সাধকের (দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের) সহিত আমাদের আলাপ-পরিচয় ঘটিয়াছে। তাঁহার জ্ঞানের গভীরতায়, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিতে ও সরলতায় আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। অনর্গলভাবে যে সকল সহজ উপমা ও দৃষ্টান্তের দ্বারা তিনি তাঁহার বক্তব্য বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, সেগুলি যেমন উপযোগী, তেমনি হৃদয়গ্রাহী। তাঁহার মনের গঠন দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের ঠিক বিপরীত। দয়ানন্দ তর্ক ভালবাসেন, মল্লযোদ্ধার ন্যায় প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করিবার জন্য তিনি সতত আগ্রহান্বিত এবং তৎপর। পরমহংসদেবের মধ্যে এসব কিছুই নাই; তিনি অতি শান্ত ধীর, তাঁহার ভাব অন্তর্মুখীন, কথাবার্তা ও ব্যবহার অতি সুমধুর। যে হিন্দুধর্ম এরূপ মহাপুরুষগণকে প্রেরণা যোগাইতে পারে, তাহার ভিতরে নিশ্চয়ই—সত্য, শিব ও সুন্দরের নিরতিশয় গভীর উৎস বিদ্যমান।"

মাতৃসম্বোধন করিতেন। একবার কেশবের অসুখের সংবাদ পাইয়া আশু রোগমুক্তির জন্য তিনি শ্রীশ্রী৺ভবতারিণীর নিকট ডাব-চিনি মানত করিয়াছিলেন। জগন্মাতার নিকট যিনি কদাপি 'শুদ্ধা ভক্তি' ব্যতীত অপর কিছুই প্রার্থনা করেন নাই, তাঁহার পক্ষে এরূপ মানত করা নিশ্চিতই কেশবের প্রতি অসামান্য ভালবাসার পরিচায়ক।

কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে কিরূপ ভালবাসা ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিতেন, অল্প দু-একটি বিষয় উল্লেখ করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। একবার তিনি ভক্ত মনোমোহন ও ভক্ত রামচন্দ্রকে * বলিয়াছিলেন—"দেখ! পরমহংস মহাশয় লাটের মাল নহেন; তিনি অমূল্য বস্তু, গ্লাসকেসে রাখিবার উপযুক্ত।" একদা (১৮৮১ খ্রীঃ) মাঘোৎসবের সময় শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা জানাইবার জন্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। প্রথমে একটি ফুলের তোড়া তাঁহাকে উপহার দিলেন। পরস্পর আদর-আপ্যায়নের পর শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান্ সম্পর্কে বলিতে আরম্ভ করিলেন, আর কেশবচন্দ্র চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। কেহ কেহ কেশববাবুকেও কিছু বলিতে অনুরোধ করিলে কেশববাবু কহিলেন—"এঁর সুমুখে ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া মানে—কামারের দোকানে ছুঁচ বিক্রি করতে যাওয়া। এতদূর আস্পর্ধা আমার নেই। আমি এঁর কথা শুনতেই এসেছি। ইনি কি বলেন, তাই আপনারাও মন দিয়ে শুনুন। আমাকে বলতে অনুরোধ করবেন না।"

একবার কেশববাবু মনোমোহন মিত্র প্রভৃতি কয়েকজন ভক্তকে বলিয়াছিলেন—"পরমহংস মহাশয়কে সাধারণের সঙ্গে সংকীর্তন করাতে নেই। উৎকৃষ্ট ফুল যেমন সাধারণভাবে ব্যবহার করলে শীঘ্রই তার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি ওঁকেও ফুলের মত জানবে; দূর থেকে সকলে তাঁর সৌন্দর্য উপভোগ করবে, সকলে তাঁর উপদেশ শুনবে।" মনোমোহন লিখিয়া গিয়াছেন —"ঠাকুরের সামান্য কষ্ট হইতে পারে, এই চিন্তায় কেশববাবু কষ্ট বোধ করিতেন। আমরা ঠাকুরকে অতি আপনার জন বলিয়াই জানিতাম, তাঁহার সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহারই করিতাম; কিন্তু কেশববাবু তাঁহাকে অমূল্য সম্পদ বলিয়া বোধ করিতেন, সেইজন্য আমাদের বলিতেন—তিনি গ্লাসকেসে রাখিবার বস্তু। তাঁহার নিকট হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ঠাকুরের মত

* ইঁহাদের পরিচয় পরে দেওয়া হইয়াছে।

আপনার জনকে কিরূপে সেবা করিতে হয়।... তিনি ঠাকুরের মুখে বেদানার দানাগুলি যখন তুলিয়া দিতেছিলেন, তখন প্রত্যেক দানাটির খোসা ছাড়ান হইয়াছে কি না দেখিয়া দিতেছিলেন। বাড়ীর মেয়েরা দেখিয়া দিলেও কেশববাবু তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। এরূপ নিখুঁত সেবা খুব অল্প লোকেই করিতে পারে।... প্রাণ খুলিয়া বলিতে কি, কেশববাবুর ভিতর যে শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখিয়াছি, তাহার তুলনায় আমরা তাঁহার পায়ের কাছে দাঁড়াইতে পারি কি না সন্দেহ!" ইহা প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা। এই বর্ণনার মধ্যে আমরা সন্দেহাতীত ও সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাই, কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি কী অপরিসীম শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাব পোষণ করিতেন!*

* সমসাময়িক ব্রাহ্মপ্রচারক ভাই গিরিশচন্দ্রের পুস্তিকা হইতেও কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

"শুভক্ষণে বেলঘরিয়ায় দুইজনের গাঢ় সম্মিলন হয়। তখন তাঁহার সঙ্গে যোগ স্থাপিত হওয়া ব্রাহ্মসাধকদিগের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল। উহা বিধাতার কার্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পরমহংসদেবের সমুদয় ধর্মমতে যদিচ আমরা ঐক্য স্থাপন করিতে পারি না, কোন কোন মত ব্রাহ্মধর্মের অননুমোদিত বলিয়া জানি, তথাপি তাঁহার যোগভক্তি-প্রধান সমুন্নত জীবন যে নববিধানের উন্নতিসাধনে বিধাতাকর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র আমাদের সন্দেহ হইতে পারে না। পরম ধার্মিক, মহাপণ্ডিত জগদ্বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেই নিরক্ষর পরমহংসের নিকটে শিষ্যের ন্যায়, কনিষ্ঠের ন্যায় বিনীতভাবে একপার্শ্বে বসিতেন, আদর ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার কথাসকল শ্রবণ করিতেন, কোনদিন কোনরূপ তর্কবিতর্ক করিতেন না। পরমহংসের জীবনের মূল্যবান জিনিসসকল বেশ করিয়া আপন জীবনে আয়ত্ত ও আদর করিতেন। সাধুভক্তি কিরূপে করিতে হয়, সাধু হইতে সাধুতা কিভাবে গ্রহণ করিতে হয়, কেশবচন্দ্র দেখাইয়া গিয়াছেন। অনেক দিন পরমহংসের নিকটে যাওয়ার পূর্বে দেবালয়ে উপাসনার সময় সাধুভক্তি বিষয়ে তিনি প্রার্থনাদি করিয়া প্রস্তুত হইয়া গিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বরে গেলে পরমহংস কোনদিন আমাদিগকে কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দিতেন না। তিনিও আচার্যভবনে আসিয়া লুচি, তরকারি ইত্যাদি ভক্ষণ করিতেন; এমন কি, ক্ষুধা হইলে খাবার চাহিয়া খাইতেন।

* * * *

"পরমহংস দ্বারা আচার্যদেব, আচার্য দ্বারা পরমহংসদেব জীবনে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। পরমহংসের জীবন হইতেই ঈশ্বরের মাতৃভাব অনেক পরিমাণে ব্রাহ্মসমাজে উদ্দীপিত হয়। সরল শিশুর ন্যায় ঈশ্বরকে সুমধুর মা নামে সম্বোধন এবং তাঁহার নিকটে শিশুর মত প্রার্থনা ও আবদার করা, এ অবস্থাটি তাঁহা হইতে আচার্যদেব অধিকতররূপে প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মধর্ম ভক্তি সত্ত্বেও বিশ্বাস ও জ্ঞানপ্রধান ধর্ম ছিল, পরমহংসের জীবনের ছায়া পড়িয়া ব্রাহ্মধর্মকে অনেক সরস করিয়া তুলে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত পরিচয়ের প্রায় তিন বৎসর পরে কেশবচন্দ্রের জীবনে এক দারুণ বিপর্যয় উপস্থিত হয়। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মেরা যে আন্দোলন শুরু করেন, তাহাতে কেশবচন্দ্র ছিলেন একজন অগ্রণী। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৩নং আইন নামক সিভিল-বিবাহ-আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু উহার ছয় বৎসর পরে (১৮৭৮ খ্রীঃ) কেশবচন্দ্র নিজেদের প্রবর্তিত নিয়ম এবং ব্রাহ্মবন্ধুদের অনুনয়-উপরোধ উপেক্ষা করিয়া তাঁহার অল্পবয়স্কা কন্যাকে কোচবিহারের রাজার সহিত বিবাহ দেন। এই 'কোচ-বিহার বিবাহ' উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে অনিবার্যরূপেই তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। নিয়মভঙ্গের অপরাধে আচার্যকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া বহুসংখ্যক সভ্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের পদ হইতে অবসর-গ্রহণের জন্য প্রথমে তাঁহাকে অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু তিনি উহাতে সম্মত না হওয়াতে উক্ত সমাজের অধিকাংশ সভ্য তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্বক 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নামক একটি নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। * কেশবচন্দ্র দমিবার পাত্র ছিলেন না। 'নববিধান' নাম দিয়া তিনিও এক নূতন ধর্মমত সৃষ্টি করিলেন এবং উক্ত মতের অনুসরণকারীদের জন্য 'নববিধান' সমাজ নামক এক নূতন সমাজ গঠন করিলেন। এই অন্দোলন ও দলাদলির ফলে কেশবচন্দ্রের অনেক পুরাতন বন্ধু এবং সহকর্মীও যখন তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্বক চলিয়া যান, তখনও কিন্তু তাঁহার প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসার অণুমাত্র ব্যত্যয় ঘটে নাই।

গৃহস্থের জীবনে সাংসারিক ব্যাপারে ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটিয়াই থাকে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও সেগুলিকে বড় করিয়া দেখিতেন না। বালিকাদের বিবাহের একটা ন্যূনতম বয়স ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যবৃন্দ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। নিজের কন্যার বিবাহে কেশবচন্দ্র উক্ত নিয়ম লঙ্ঘন করাতেই ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে তীব্র বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল। ঐরূপ কড়াকড়ি নিয়মের কথা শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—এগুলো

---

* কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রধানতঃ দুইটি অভিযোগ আনীত হয়। প্রথম অভিযোগ এই যে, তিনি স্বল্পবয়স্কা কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় অভিযোগ—বিবাহের অনুষ্ঠানে পৌত্তলিক রীতি অনুসৃত হইয়াছিল। কেশবপক্ষীয় ব্যক্তিরা এই সকল অভিযোগ-খণ্ডনের নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও বিরুদ্ধবাদিগণের মনে প্রত্যয়-উৎপাদনে অসমর্থ হইয়াছিলেন।

ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন ব্যাপার। এগুলোকে অত কঠিন নিয়মে বদ্ধ করা চলে না ; কেশব কেন ওরূপ করতে গিছ্‌লো ?" কোচবিহার-বিবাহের প্রসঙ্গ তুলিয়া কেহ কেশবের নিন্দাবাদের চেষ্টা করিলে তিনি বাধা দিয়া বলিতেন—"কেশব ওতে এমন নিন্দার কাজ কি করেছে ? কেশব সংসারী লোক ; নিজের পুত্রকন্যার যাতে কল্যাণ হয়, তা কেন করবে না ? সংসারী ব্যক্তি ধর্মপথে থেকে ওরূপ করলে নিন্দার কি আছে ? কেশব ওতে অধর্ম কিছুই করেনি ; বরঞ্চ পিতার কর্তব্য পালন করেছে।"

মুষ্টিমেয় অনুচরের সাহায্যে 'নববিধান'কে গড়িয়া তুলিবার নিমিত্ত কেশবচন্দ্র যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন ও দুর্জয় সাহস দেখাইয়াছিলেন, তাহা বস্তুতঃ বিস্ময়কর। ঐ পরিশ্রমের ফলে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং অনতিকালমধ্যে তিনি কালগ্রাসে পতিত হন।

১২৯০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে (১৮৮৩ খ্রীঃ, ২৮শে নভেম্বর) মৃত্যুশয্যায় শয়ান কেশবকে দেখিবার নিমিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলেন। 'কথামৃত'কার সেই সাক্ষাৎকারের যে দৃশ্যটি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বড়ই করুণ ও মর্মস্পর্শী। সার্কুলার রোডের উপরে 'কমলকুটীর' নামক বাটীতে কেশবচন্দ্র তখন বাস করিতেন। অপরাহ্ণ প্রায় পাঁচটার সময়ে ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে আসিয়া পৌছিলেন—সঙ্গে দুইচারিজন ভক্ত। বাড়ীর লোকেরা পরম সমাদরে ঠাকুরকে দোতলায় লইয়া গিয়া বৈঠকখানা ঘরে বসাইলেন। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পরেও কেশব যখন আসিলেন না, তখন ঠাকুর অধৈর্য হইয়া পড়িলেন। তিনি নিজেই ভিতরে যাইয়া কেশবকে দেখিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেশবের শিষ্যেরা বিনীতভাবে ঠাকুরকে বুঝাইয়া বলিলেন,—"তিনি এই একটু বিশ্রাম করছেন, এইবার একটু পরেই আসছেন।" কেশবের পীড়া খুব সঙ্কটাপন্ন আকার ধারণ করাতে শিষ্যবর্গ এবং বাড়ীর লোকেরা সকলেই বিশেষ উৎকণ্ঠিত ও সতর্ক।

কিছুক্ষণ পরে কেশবচন্দ্র বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিলেন। অস্থিচর্মসার মূর্তি,—দেখিলেই কষ্ট হয়। দেওয়াল ধরিয়া ধরিয়া অতি কষ্টে তিনি ঠাকুরের নিকট আসিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু ঠাকুর তখন অর্ধবাহ্য-দশায় ; কেশব যে আসিয়াছেন, সেদিকে কোনই হুঁশ নাই। উচ্চৈঃস্বরে

'আমি এসেছি, আমি এসেছি' বলিয়া কেশব শ্রীরামকৃষ্ণের বামহস্ত ধারণ করিলেন এবং সেই হাতে হাত বুলাইতে লাগিলেন। কিন্তু ঠাকুরের তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ নাই; তিনি নানাবিধ তত্ত্বকথা অনর্গল কহিয়া যাইতেছেন। এইভাবে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর ঠাকুর যেন কতকটা নিম্নভূমিতে নামিয়া আসিলেন এবং কেশবের সহিত অত্যন্ত স্নেহপূর্ণভাবে বাক্যালাপ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কেশবের শারীরিক কুশলবার্তা কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না, কেবলই ঈশ্বরীয় কথাবার্তা হইতে লাগিল। কেশবের শারীরিক দুঃখভোগ যে তাঁহার আত্মার কল্যাণের উদ্দেশ্যেই ভগবান কর্তৃক বিহিত হইয়াছে, একথা বুঝাইবার জন্য অবশেষে কহিলেন—"শিশির পাবে বলে মালী বসরাই গোলাপের গাছ শিকড় শুদ্ধ তুলে দেয়। শিশির পেলে গাছ ভাল করে গজাবে। তাই বুঝি তোমার শিকড় শুদ্ধ তুলে দিচ্ছে (ঠাকুরের ও কেশবের হাস্য)। ফিরে ফিরতি বুঝি বড় কাণ্ড হবে। তোমার অসুখ হলেই আমার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়। আগের বারে তোমার যখন অসুখ হয়, রাত্রি শেষ-প্রহরে আমি কাঁদতুম। বলতুম, মা! কেশবের যদি কিছু হয়, তবে কার সঙ্গে কথা কবো!" * কথাবার্তার মধ্যে কেশবের প্রতি ঠাকুরের গভীর ভালবাসার পরিচয় পাইয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সকলেই বিস্ময়ে একেবারে মুগ্ধ।

---

* এই বিবরণ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' হইতে গৃহীত। নববিধান-সমাজের ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল (চিরঞ্জীব শর্মা) মহাশয়ও ঐ সময়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন। 'কেশবচরিত' গ্রন্থে ঐ সাক্ষাৎকারেব যে বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত হইল। পাঠক দেখিতে পাইবেন, দুই মহাপুরুষের সেদিনকার ভাবসমাধি ও কথাবার্তা সকলের মনকে কিরূপ অভিভূত কবিয়াছিল।

"পরমহংস রামকৃষ্ণ একদিন দেখিতে আসেন। তৎকালে কেশবচন্দ্র নিদ্রিতাবস্থায় ছিলেন। অনেক বিলম্ব দেখিয়া পরমহংস মহাশয় ব্যাকুল হইলেন। সাক্ষাৎ হইবে, এমন সময়ে তাঁহার চিত্ত সমাধিতে ডুবিয়া গেল। তদবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—'ওগো বাবু, আমি অনেক দূর হইতে তোমাকে দেখিব বলিয়া আসিয়াছি, একবার দেখা দেও, আমি আর থাকিতে পারি না।' এমন সময় কেশবচন্দ্র নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। প্রায় আধঘণ্টাকাল নানা কথার প্রসঙ্গ হইল। পরমহংস বলিলেন, 'ভাল ফুল হইবে বলিয়া মালী যেমন গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেয়, তোমাকেও মা তাই করিতেছেন—এ তোমার পীড়া নয়। তুমি মায়ের বছরাই গোলাপ গাছ। মা'কে পাকা রকমে পাইতে গেলে শরীরে এক একবার বিপদ হয়; তিনি এক একবার শরীরকে নাড়াচাড়া দেন।

কেশবের বৃদ্ধা জননীও ঠাকুরের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। দ্বারদেশে পৌঁছিয়া একটু দূর হইতে ঠাকুরকে প্রণামপূর্বক আশীর্বাদ ভিক্ষা করিলেন, কেশবের পীড়ার যেন শীঘ্র উপশম হয়। কিন্তু ঠাকুর সরাসরি ঐ সম্পর্কে কিছুই বলিলেন না, শুধু কহিলেন—"মা স্থবচনী আনন্দময়ীকে ডাকো, তিনি দুঃখ দূর করবেন।" কেশবচন্দ্রের আবার দারুণ কাশি উপস্থিত হইল। তিনি আর বসিতে পারিতেছেন না; ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও কিঞ্চিৎ জলযোগের পর দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিলেন। কেশবচন্দ্রের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের ইহাই শেষ দেখা। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী প্রাতঃকালে কেশবচন্দ্র নশ্বর দেহ ছাড়িয়া মহাপ্রয়াণ করেন। কেশবের মৃত্যুসংবাদ-শ্রবণে শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছিলেন। এ সম্পর্কে শিষ্যদের নিকট তিনি বলিয়াছিলেন—"খবর শুনে তিনদিন শয্যা গ্রহণ করতে পারিনি; মনে হয়েছিল যেন আমার একটা অঙ্গ খসে গিয়েছে!"

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ব্যতীত ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য অনেক ভক্তদের সহিতও শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে ব্রাহ্মসমাজ—'আদি', 'সাধারণ' ও 'নববিধান' এই তিনটি শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের সর্বপ্রধান নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎকারের তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা হওয়াতে মথুরানাথ একবার তাঁহাকে জোড়াসাঁকোয় ঠাকুর পরিবারদের বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলেন। মথুরানাথ ও দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন হিন্দুকলেজের সহপাঠী এবং সেই সূত্রে পরস্পরের বন্ধু। দেবেন্দ্রনাথকে দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, উহার যোগ-ভোগ দুই-ই আছে; নানাবিধ সাংসারিক

সেবারে তোমার যখন অত্যন্ত রোগ হইয়াছিল, তাহাতে আমার বড় ভাবনা হয়। সিদ্ধেশ্বরীকে ডাব-চিনি মানিয়াছিলাম। এবার তত ভাবনা হয় নাই। কেবল কাল রাত্রিতে প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল। মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—মা, যদি কেশব না থাকে, তবে আমি কাহার সঙ্গে কথা কহিব?' অনন্তর পরমহংস চলিয়া গেলে, আচার্য কেশবচন্দ্র শ্রান্ত হইয়া বিছানায় পড়িলেন। সেদিন তাঁহার অদ্ভুত সমাধি, তাহার সঙ্গে হাসি এবং গূঢ় যোগানন্দ যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা অমর রাজ্যের এক আশ্চর্য অবস্থা অবলোকন করিয়াছেন,—সন্দেহ নাই। তাঁহার হাস্যোদ্দাম-দর্শনে আত্মীয়গণের মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল।"

ব্যাপৃতি সত্ত্বেও ঈশ্বরে গভীর অনুরাগ রহিয়াছে। তাঁহাকে কহিলেন—"তুমি কলির জনক। জনক এদিক্ ওদিক্, দু'দিক্ রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি।" শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরোধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বেদবেদান্ত হইতে কিছু কিছু ঈশ্বরীয় কথা ব্যাখ্যান করিয়া শুনাইলেন। "অনেক কথাবার্তার পর দেবেন্দ্র খুশী হয়ে বল্লে, আপনাকে উৎসবে (ব্রহ্মোৎসবে) আসতে হবে। আমি বল্লাম, 'সে ঈশ্বরের ইচ্ছা ; আমার তো এই অবস্থা দেখছো !—কখন কিভাবে তিনি রাখেন।' দেবেন্দ্র বল্লে—'না, আসতে হবে, তবে ধুতি আর উড়ানি পরে এসো—তোমাকে এলোমেলো দেখে কেউ কিছু বললে আমার কষ্ট হবে।' আমি বললাম, 'তা পারবো না,—আমি বাবু হতে পারবো না।' দেবেন্দ্র, সেজোবাবু সব হাসতে লাগলো। তার পরদিনই সেজোবাবুর কাছে দেবেন্দ্রের চিঠি এল—আমাকে উৎসব দেখতে যেতে বারণ করেছে। বলে—অসভ্যতা হবে—গায়ে উড়ানি থাকবে না ! (সকলের হাস্য)।"*

'নববিধান' সমাজে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ সম্মান ও সমাদর ছিল। কেশবচন্দ্র ব্যতীত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল প্রমুখ প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত ছিলেন।

'সাধারণ' ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা ছিলেন প্রখর যুক্তিবাদী ও গণতন্ত্রী। তাঁহাদের প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকের ধারণা হইয়াছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে গিয়াই কোন কোন ব্রাহ্মনেতার সাকারোপাসনায় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তাই তাঁহারা পরমহংসদেবের প্রভাব হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্য সতর্ক থাকিতেন। কিন্তু তাহা হইলেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রধান নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে শ্রীরামকৃষ্ণ যথেষ্ট স্নেহ করিতেন এবং শিবনাথও তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। সাধারণ সমাজের অন্যতম নেতা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও তাঁহার নিরতিশয় স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যেও স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ অনেকেই প্রথম জীবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শুধু যে সভ্য ছিলেন তাহাই নহে, উৎসাহী কর্মী বলিয়া গণ্য হইতেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া অনেক ব্রাহ্মভক্তের গোঁড়ামি দূরীভূত হইয়াছিল এবং পাশ্চাত্ত্যের প্রভাব

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহারা সনাতন ধর্মের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে সময়ে ব্রাহ্মভক্তদের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসেন, ব্রাহ্মসমাজের গৌরবসূর্য তখন মধ্যাহ্নগগনে দেদীপ্যমান—দেশের বহু গণ্যমান্য, শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তি তখন ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত। ব্রাহ্মদের মধ্যে ধর্মোৎসাহের তখন প্রবল বন্যা। পারিবারিক ও সামাজিক বহুবিধ নির্যাতন সহ্য করিয়া এবং দারিদ্র্য, দুঃখকষ্ট প্রভৃতি স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া অনেকে 'ব্রাহ্ম' হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অকৃত্রিম ধর্মভাব লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাদের সরলতা, অমায়িকতা, তেজস্বিতা ও উৎসাহ দেখিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ অতিশয় আনন্দিত হইতেন—তাঁহাদের সহিত বন্ধুভাবে মিলিত হইয়া ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতেন। কিন্তু সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাদের মতবাদ এবং আচার-অনুষ্ঠানের ত্রুটি দেখাইতেও তিনি বিরত থাকিতেন না।

ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-পদ্ধতিতে ভগবানের ঐশ্বর্যবর্ণনার খুব রেওয়াজ ছিল। 'ব্রহ্মাণ্ড কি আশ্চর্য কাণ্ড' প্রভৃতি বাক্যদ্বারা তাঁহারা ভগবানের সৃষ্টি-কৌশলের ব্যাখ্যান আরম্ভ করিতেন। ভগবান গ্রহতারা সৃষ্টি করিয়াছেন,—কত রকমের গাছপালা, জীবজন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন—ইত্যাদি ইত্যাদি। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উহা খুব ভাল লাগিত না। ভগবানের ঐশ্বর্যের বিষয় সর্বদা চিন্তা করিলে সম্ভ্রমের ভাবই মনে বেশী জাগে, ঘনিষ্ঠতা তত হয় না। তাই তিনি ব্রাহ্মভক্তদের বলিতেন—"ঈশ্বরের মাধুর্যরসে ডুবে যাও। তাঁর অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত ঐশ্বর্য—অত খবরে আমাদের কাজ কি? ···যদি আমার এক ঘটি জলে তৃষ্ণা যায়,—পুকুরে কত জল আছে, এ মাপবার আমার কি দরকার? আমি আধ বোতল মদে মাতাল হয়ে যাই—শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, এ হিসাবে আমার কি দরকার? অনন্তকে জানার দরকারই বা কি? বাগানে কত গাছ, গাছে কত ডাল—এসব হিসাবে তোমার কাজ কি? তুমি বাগানে আম খেতে এসেছ; আম খেয়ে যাও। তাঁতে ভক্তিপ্রেম হবার জন্যই মানুষজন্ম। তুমি আম খেয়ে চলে যাও।" *

ব্রাহ্মরা সাধারণতঃ গর্বের সহিত ভাবিতেন এবং প্রকাশ্যে প্রচার করিতেন যে, তাঁহারা বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্মের অনুসরণকারী, জ্ঞানপথের পথিক,—

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের উপাসক। সাকারের উপাসনা তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মাত্র দুই-চারিটি কথায় তাঁহাদের ভুল দেখাইয়া দিয়াছিলেন। "ভক্তের পক্ষে সগুণ ব্রহ্ম; অর্থাৎ তিনি সগুণ—একজন ব্যক্তি হয়ে, রূপ হয়ে, দেখা দেন। তিনি প্রার্থনা শুনেন। তোমরা যে প্রার্থনা করো, তাঁকেই করো। তোমরা বেদান্তবাদী নও, জ্ঞানী নও, তোমরা ভক্ত। সাকার রূপ মানো আর না মানো, এসে যায় না। ঈশ্বর একজন ব্যক্তি বলে বোধ থাকলেই হলো, যে ব্যক্তি প্রার্থনা শুনেন, সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় করেন, যে ব্যক্তি অনন্ত শক্তিশালী।"*

খ্রীষ্টানধর্মে পাপবাদের খুব ছড়াছড়ি। মানুষমাত্রেই পাপী। পাপক্ষালনের জন্য যীশুখ্রীষ্টের শরণাপন্ন হইতে হইবে। বৈষ্ণবধর্মেও ঐরূপ ধরণের কথা যথেষ্ট আছে। আমি ঘোর পাপী, আমি নরাধম,—পাপোঽহং, পাপকর্মাহং, হে গোবিন্দ! আমাকে ত্রাণ কর ইত্যাদি। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁহার সমাজের উপাসনাতে এই রকমের চিন্তাধারা ও প্রার্থনাবাক্য বহুল আমদানি করিয়াছিলেন। তাঁহার 'জীবনবেদ' নামক গ্রন্থে উহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। এই চিন্তাধারার ত্রুটি দেখাইতে গিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একবার কেশবকে বলিয়াছিলেন—"খ্রীষ্টানদের একখানা বই একজন এনে দিলে। আমি পড়ে শুনাতে বললুম। তাতে কেবল 'পাপ' আর 'পাপ'। (কেশবের প্রতি) তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেও কেবল 'পাপী'। যে ব্যক্তি 'আমি বদ্ধ' 'আমি বদ্ধ' বারবার বলে, সে শালা বদ্ধই হয়ে যায়। যে রাত-দিন 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' এই করে, সে তাই হয়ে যায়। ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই—কি, আমি তাঁর নাম করেছি, আমার এখনও পাপ থাকবে! আমার আবার পাপ কি? আমার আবার বন্ধন কি? ··· ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়।" †

ব্রাহ্মসমাজে যখন গৃহবিবাদ উপস্থিত হইয়া বিষম দলাদলি চলিতেছিল, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ রহস্যচ্ছলে বলিতেন, 'গেঁড়ে ডোবায় দল হয়।' কিন্তু পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ যতই থাকুক, তাঁহার নিকট সকলেই ছিলেন সমান প্রিয়পাত্র; অপরপক্ষে সকলেই তাঁহাকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন ও

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

† শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

আন্তরিকভাবে ভালবাসিতেন। ঠাকুরের সান্নিধ্যে তাঁহাদের পারস্পরিক মনোমালিন্য যেন গঙ্গাজলে ধুইয়া মুছিয়া যাইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে একটিমাত্র ঘটনার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ভক্তগণসঙ্গে ঠাকুরকে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করাইবার নিমিত্ত কেশবচন্দ্র একদা (২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২) অপরাহ্নে জাহাজ লইয়া দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে উপস্থিত। কেশবচন্দ্রের কয়েকজন শিষ্য কেশব-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ঠাকুরকে জাহাজের উপরে লইয়া যাইতে আসিলেন। ঠাকুরের নিকটে তখন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উপবিষ্ট; কিয়ৎক্ষণ আগে আসিয়া তিনি ঠাকুরের সহিত কথাবার্তা বলিতেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ-সম্পর্কিত বিবাদের ফলে তখন কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ; এমন কি, মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত নাই। ঠাকুরের নিকট ইহা অগোচর না থাকিলেও তিনি বিজয়কে সঙ্গে লইলেন। বিজয়ের পক্ষে ঠাকুরের আহ্বান উপেক্ষা করিবার উপায় ছিল না। বিজয়কে দেখিয়া কেশবচন্দ্র কিন্তু অপ্রস্তুত। বিজয় কথাবার্তা না বলিয়া এক কোণে বসিয়া রহিলেন। ওদিকে জাহাজে উঠিয়াই ঠাকুর সমাধিস্থ! মাঝে মাঝে অর্ধবাহ্যদশায় অনেক ঐশ্বরিক প্রসঙ্গ করিলেন। শ্রোতৃবর্গ সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ! এইভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইবার পর যখন ভক্তেরা খুব আনন্দের সহিত জলযোগ করিতেছিলেন তখন ঠাকুর—কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণের পারস্পরিক সঙ্কোচভাব লক্ষ্য করিয়া—যেন দুই অবোধ ছেলের মধ্যে ভাব করিয়া দিবেন—এমনই ভাবে বলিতে লাগিলেন, (কেশবের প্রতি) ওগো! এই বিজয় এসেছেন! তোমাদের ঝগড়া-বিবাদ যেন শিব-রামের যুদ্ধ। (হাস্য) রামের গুরু শিব। যুদ্ধও হলো, দুজনে ভাবও হলো। কিন্তু শিবের ভূত-প্রেতগুলো আর রামের বানরগুলো—ওদের ঝগড়া-কিচিমিচি আর মেটে না! (উচ্চ হাস্য) আপনার লোক। তা' এরূপ হয়ে থাকে। আবার জানো, মায়ে-ঝিয়ে আলাদা মঙ্গলবার করে! মার মঙ্গল আর মেয়ের মঙ্গল যেন দু'টো আলাদা! কিন্তু এর মঙ্গলে ওর মঙ্গল হয়, ওর মঙ্গলে এর মঙ্গল হয়। তেমনি তোমাদের এর একটি সমাজ আছে, আবার ওর একটি দরকার। (সকলের হাস্য) তবে এ সব চাই। যদি বলো, ভগবান নিজে লীলা করছেন, সেখানে জটিলে-কুটিলের কি দরকার? জটিলে-কুটিলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না। (সকলের হাস্য) জটিলে-কুটিলে না থাকলে রগড় হয় না। (উচ্চ হাস্য)।

"রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তাঁর গুরু ছিলেন অদ্বৈতবাদী। শেষে দুজনে অমিল। গুরু-শিষ্য পরস্পর মত খণ্ডন করতে লাগল। এরূপ হয়েই থাকে। যাই হউক, তবু আপনার লোক।" * শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমের বন্যায় দুপক্ষের মান-অভিমান সমস্তই ভাসিয়া যাইত, নিজেদের ক্ষুদ্রতার জন্য সকলেই মনে মনে লজ্জিত হইতেন।

বলা বাহুল্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন দোষত্রুটি সম্পর্কে মন্তব্য করিলেও নিতান্ত বন্ধুভাবেই করিতেন—নিন্দাচ্ছলে নহে। সুতরাং, ব্রাহ্মভক্তদের তাহাতে রুষ্ট কিংবা বিরক্ত হইবার কারণ থাকিত না। তাঁহারা সেগুলি হিতৈষীর সমালোচনা কিংবা পরামর্শরূপেই গ্রহণ করিতেন। বস্তুতঃ তাঁহারা প্রায় সকলেই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিয়া গিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মনেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। একটি প্রবন্ধে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—"তাঁহার ধর্ম কি? তিনি অবশ্যই নিষ্ঠাবান হিন্দু, কিন্তু তাঁহার হিঁদুয়ানি এক অদ্ভুত ধরনের। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস কোন বিশেষ দেবতার উপাসক নহেন। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, বৈদান্তিক—ইহার কোনটিই তিনি নহেন, আবার সব কিছুই বটেন। তিনি শিবের পূজা করেন, কালীর পূজা করেন, রামের পূজা করেন, কৃষ্ণের পূজা করেন; আবার সেই সঙ্গে তিনি অদ্বৈতবাদের একজন প্রধান সমর্থক। একদিকে তিনি মূর্তিপূজক —অপর দিকে অনন্ত, অপার, অখণ্ড সচ্চিদানন্দের একনিষ্ঠ উপাসক। নিরাকার সচ্চিদানন্দকে জীবাত্মা বিভিন্নভাবে উপলব্ধি করে; তাহা হইতেই বিভিন্ন দেবতার সৃষ্টি। নামরূপবিহীন অখণ্ড সচ্চিদানন্দের শক্তির বিকাশই আমাদের নিকট ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। …যত দিন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস আমাদের মধ্যে থাকিবেন, ততদিন আমরা সানন্দে তাঁহার পদপ্রান্তে বসিব এবং ত্যাগ, বৈরাগ্য, আধ্যাত্মিকতা ও ঈশ্বরপ্রেমের উচ্চতম শিক্ষা তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিব।"

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

ভক্ত-সমাগম

রামচন্দ্র ঃ মনোমোহন ঃ সুরেন্দ্রনাথ

কেশবচন্দ্র কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শিক্ষিত সমাজে প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বহু দর্শনার্থী দক্ষিণেশ্বরে আসিতে শুরু করেন। উঁহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই থাকিতেন প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসু; অপর ব্যক্তিরা আসিতেন হুজুক কিংবা কৌতূহলের বশে, কেহ কেহ বা আসিতেন পরমহংসের কৃপায় বৈষয়িক উন্নতি, রোগমুক্তি প্রভৃতির আশায়। ঐ সমস্ত বিষয়ী লোকের সংসর্গে শ্রীরামকৃষ্ণের বড়ই অস্বস্তি বোধ হইত। ব্রাহ্মভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ ঐকান্তিকভাবে ধর্মলাভের জন্য আসিলেও, সাকারোপাসনার প্রতি বিরূপ মনোভাবের দরুন শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ভাব পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করা তাঁহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। যাঁহারা আজন্ম-শুদ্ধ, ঐশ্বরিক ভাবে সদা অনুপ্রাণিত এবং উচ্চতম আধ্যাত্মিক শিক্ষাগ্রহণে সম্পূর্ণ সক্ষম, এমন সুযোগ্য ভক্তদিগকে নিকটে পাইবার জন্য তিনি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। জগদম্বা তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, উক্ত শ্রেণীর শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তেরা শীঘ্রই তাঁহার সকাশে উপনীত হইবেন এবং উঁহাদের দ্বারাই নূতন ভাবধারা লোকসমাজে প্রচারিত ও সমাদৃত হইবে।

১২৮৬ বঙ্গাব্দ (১৮৭৯ খ্রীঃ) হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণের চিহ্নিত ভক্তদের দক্ষিণেশ্বরে আগমন আরম্ভ হয়। সর্বপ্রথমে আসেন রামচন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন মিত্র। রামচন্দ্র দত্ত ডাক্তারি করিতেন এবং কলিকাতা মেডিকেল কলেজে তাঁহার একটি চাকুরিও ছিল। সেই সময়কার সাধারণ ইংরেজীশিক্ষিত এবং যৎসামান্য বিজ্ঞান-পড়া ব্যক্তিদের ন্যায় তিনিও নাস্তিকভাবাপন্ন ছিলেন। কিন্তু জড়বাদী হইয়া তাঁহার প্রাণে শান্তি ছিল না। জগতে নানাবিধ দুঃখ-দুর্দশা ও অসামঞ্জস্যের সমাধান তিনি জড়বাদের সাহায্যে খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। অথচ এই জগৎ-রহস্য জানিবার ও বুঝিবার নিমিত্ত—উহার দুঃখ-দুর্দশা প্রভৃতির পারে যাইবার নিমিত্ত—তাঁহার প্রাণে ছিল দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে না পারিয়া তিনি অন্তরে দারুণ অশান্তি ভোগ করিতেছিলেন।

মনোমোহন মিত্র ছিলেন সম্পর্কে রামচন্দ্র দত্তের মাসতুতো ভাই। তিনি বাংলা সরকারের দপ্তরে সামান্য বেতনে কেরানিগিরি করিতেন। তাঁহার স্বভাব ছিল নিরতিশয় ভক্তিপ্রবণ; তথাপি ব্রাহ্মসমাজের খাতায় তিনি নাম লিখাইয়াছিলেন। প্রচলিত হিন্দুধর্মের উপর সম্পূর্ণ আস্থা হারাইয়া তিনি যে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন, তাহা নহে। যোগদানের কারণ সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন—"তখন কিছুই বুঝিতাম না, বুঝিবার চেষ্টাও করিতাম না। তবে যাইতাম কেন? ইহার উত্তরে আমি বলিতে বাধ্য যে, হুজুগে পড়িয়া যাইতাম—অরগ্যানের বাদ্য শুনিতে, আর পাঁচজনে আমাকে সৎসাহসী বলিবে বলিয়া যাইতাম।"

শৈশবাবধি মনোমোহনের ধর্মের প্রতি অনুরাগ ছিল এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুরাগ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। রামচন্দ্র এবং মনোমোহন সর্বদাই ধর্মবিষয়ে আলোচনা করিতেন। 'ইণ্ডিয়ান মিরার' এবং 'সুলভ-সমাচার' পত্রিকায় প্রকাশিত দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবের বিবরণ তাঁহারা পড়িয়াছিলেন এবং প্রাণকৃষ্ণ-নামক জনৈক নববিধানী বন্ধুর মুখে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা অনেক শুনিয়াছিলেন। উহার ফলে পরমহংসদেবকে স্বচক্ষে দেখিবার নিমিত্ত উভয়েরই হৃদয়ে প্রবল বাসনার উদয় হইয়াছিল; কিন্তু যাই যাই করিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত যাওয়া আর হইয়া উঠিতেছিল না। অবশেষে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর (বাংলা ১২৮৬ সনের কার্তিক মাসের শেষভাগে, কালীপূজার কয়েক দিন পরে) তাঁহাদের সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হয়। গোপালচন্দ্র মিত্র নামক অপর একজন বন্ধুকে তাঁহারা সঙ্গে লইয়াছিলেন।

তিনজনের মধ্যে কেহই পরমহংসদেবকে তৎপূর্বে দেখেন নাই এবং দক্ষিণেশ্বরেও যান নাই। নৌকাযোগে তথায় পৌঁছিবার পর লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরখানি খুঁজিয়া বাহির করিলেন, কিন্তু দেখিলেন দরজা বন্ধ। ঘর চিনিতে নিজেদের ভুল হইয়া থাকিবে, এই ধারণার বশে ঘাটের চাঁদনিতে ফিরিয়া গিয়া লোকের নিকট পুনরায় জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা বলিয়া দিলেন যে—ভুল হয় নাই, শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ ঘরেই থাকেন, দরজায় আঘাত করিলেই উহা খুলিয়া যাইবে। উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী পুনরায় যাইয়া মৃদু আঘাত করিতেই দরজা খুলিয়া গেল। কোঁচার-খুঁট-কাঁধে-ঝুলানো মধ্যবয়সী এক ব্যক্তি ঘরের ভিতর হইতে দরজার সম্মুখে আসিয়া সাদর

সম্ভাষণ-পূর্বক তাঁহাদিগকে ভিতরে ডাকিয়া লইলেন এবং অতি বিনীতভাবে ভূমিষ্ঠ-ভাবে প্রণাম করিয়া শয্যার উপরে বসিতে বলিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আগন্তুকত্রয়ের চিত্তে প্রথমে একটু নৈরাশ্য জন্মিল। 'পরমহংসে'র যে গুরুগম্ভীর মূর্তি তাঁহারা কল্পনা করিয়া আসিয়াছিলেন, দেখিলেন তাহার সহিত এ ব্যক্তির চেহারা-ছবি ও বেশভূষার কোনই মিল নাই,—না দীর্ঘায়ত শরীর, না মস্তকে জটাভার, না পরিধানে গৈরিক! পরমহংসের ভূমিষ্ঠ প্রণামের বদলে তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের প্রথামত শুধু ঘাড় নাড়িয়া প্রত্যভিবাদন জানাইলেন। ঘরের মধ্যে একটি বিছানায় হৃদয় শোওয়া অবস্থায় ছিলেন; তাঁহার সামান্য জ্বর হইয়াছিল। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর কহিলেন, "দ্যাখ্ হৃদু! এঁদের কেমন শান্ত প্রকৃতি; এঁরা কখনই ব্রাহ্মসমাজের লোক নন।" হৃদয় উত্তর করিলেন, "মামা, তুমি যখন বলছ, তখন নিশ্চয়ই নন।" মনোমোহন বাধা দিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আপনার ধারণা ভুল। আমি ছেলেবেলা থেকেই ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া-আসা করছি, ব্রাহ্মধর্মকে আমি একমাত্র সত্যধর্ম বলে মনে করি, আর পৌত্তলিকতাকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি।" প্রত্যুত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, "আমি শুধু বলছিলাম কি যে, তুমি কোন দলের লোক নও।" প্রশংসাচ্ছলে শ্রীরামকৃষ্ণ যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহাকে ভুল বুঝার দরুণ মনোমোহন কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন।

সাকারোপাসনাকে পৌত্তলিকতা নাম দিয়া মনোমোহন নিন্দা করিয়াছিলেন। ঠিক যেন তাহা লক্ষ্য করিয়া উক্ত ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণের নিমিত্তই শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "যেমন সোলার আতা দেখলে সত্যিকার আতার উদ্দীপনা হয়, তেমনি দেবদেবীর প্রতিমূর্তি দেখলে, তাঁদের প্রকৃত লীলারূপের উদ্দীপনা হয়। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান,—তাঁর পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। তিনি সাকার হতে পারবেন না কেন?"

মনোমোহন লিখিয়াছেন যে, তিনটি প্রশ্ন পরমহংসদেবকে তাঁহারা সেদিন করিয়াছিলেন। প্রথম প্রশ্ন—ঈশ্বর আছেন কি না। দ্বিতীয়—যদি থাকেন, তবে তাঁহাকে পাওয়া যায় কি না। তৃতীয়—যদি পাওয়া যায়, তবে এ জন্মেই তাহা সম্ভব কি না। পরমহংসদেব কহিলেন, "দিনের বেলায় সূর্যের আলোকে আকাশে তারা দেখা যায় না; কিন্তু তা' বলে কি তারা তখন থাকে না? দুধের ভিতর মাখন রয়েছে; কিন্তু দুধ দেখে তা' কি বুঝা যায়?

মাখন আছে একথা জানতে হলে দই পাততে হয়, তার পরে সূর্যোদয়ের আগে দই থেকে মাখন তুলতে হয়। কোন পুকুরে মাছ ধরতে ইচ্ছা হলে আগে যারা মাছ ধরেছে তাঁদের কাছে জেনে নিতে হয় সেই পুকুরে কেমন মাছ আছে, কিসের টোপ খায়, কিরূপ চারের প্রয়োজন ইত্যাদি। ঈশ্বর সম্বন্ধেও সেইরূপ জানবে। যেমন ছিপ ফেলবামাত্র মাছ ধরা যায় না, স্থিরভাবে চুপ করে বসে থাকতে হয়,—কিছুক্ষণ পরে মাছের ঘাই ও ফুট দেখতে পাওয়া যায়। তখন ঠিক ঠিক বিশ্বাস হয় যে, পুকুরে মাছ আছে। আরও কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকলে পর মাছ গেঁথে তুলতে পারা যায়। ঈশ্বর সম্বন্ধেও সেইপ্রকার জানবে। সাধুর কথায় বিশ্বাস করে মন-ছিপে, প্রাণ-কাঁটায়, নাম-টোপে, ভক্তি-চার ফেলে অপেক্ষা করতে হয়; তবেই ঈশ্বরের ভাবরূপ ঘাই ও ফুট দেখতে পাওয়া যাবে। পরে একদিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হবে।"

মনোমোহন লিখিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজে মিশিয়া তাঁহারা একথাই সর্বদা শুনিয়া আসিতেছিলেন যে, ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ, তিনি কখনও আকারে সীমাবদ্ধ হইতে পারেন না, সুতরাং নয়নগোচরও নহেন। পরমহংসদেব তাঁহাদের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন—"ঈশ্বর প্রত্যক্ষ বিষয়। যাঁর সৃষ্ট মায়া এত সুন্দর, তিনি কি অপ্রত্যক্ষ হতে পারেন?" আগন্তুকেরা বলিলেন, "আপনার কথাই মেনে নিলাম। কিন্তু এ জন্মেই কি তাঁর দেখা পাব?" প্রশ্নের উত্তর কথায় না দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ গান ধরিলেন—

ভাবিলে ভাবের উদয় হয়,
যেমন ভাব, তেমন লাভ, মূল সে প্রত্যয়।
কালীপদ সুধারসে, (যদি) চিত্ত ডুবে রয়
(তবে) জপ যজ্ঞ পূজা বলি, কিছুই কিছু নয়॥

এরূপ উৎসাহজনক অভয়বাণী শুনিয়াও প্রশ্নকর্তাদের হৃদয়ে সম্পূর্ণ প্রত্যয় জন্মিল না। রামচন্দ্র কহিলেন, "ঈশ্বর আছেন, এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পেলে আমার অবিশ্বাসী মন কিছুতেই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে না।" তখন তাঁহাকে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন—"সান্নিপাতিক রোগী, এক-পুকুর জল খেতে চায়, এক-হাঁড়ি ভাত খেতে চায়। কিন্তু কবরেজ কি সে কথায় কান দেন? ডাক্তার কি রোগীর কথায় ওষুধ ব্যবস্থা করেন? ঠিক সময়ে তিনি আপনিই কুইনিন দেন, তাঁকে বলতে হয় না।"

সন্ধ্যার প্রাক্কাল পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বরে কাটাইয়া তিন বন্ধুতে বিদায় লইলেন। প্রথম দর্শনেই শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যে ভালবাসা, শান্তি ও আনন্দ তাঁহারা পাইলেন, তৎপূর্বে আর কোথাও সেরূপ পান নাই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে এমনিভাবে গ্রহণ করিলেন যেন তাঁহারা কতকালের পরিচিত ও আত্মীয়! বিদায়কালে তিনি তাঁহাদিগকে যখনি সুবিধা হয়, আসিবার জন্য বারংবার বলিয়া দিলেন। এই সম্পর্কে মনোমোহন লিখিয়াছেন—"এই দুঃখপূর্ণ সংসারে সাধুসঙ্গে যে এমন শান্তি পাওয়া যায়, তাহা আমরা ইতিপূর্বে জানিতাম না, বিশ্বাস করিতাম না।"

প্রথম সাক্ষাতের পর হইতে প্রতি রবিবার রামচন্দ্র ও মনোমোহন দক্ষিণেশ্বরে যাইতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গ এবং কথাবার্তা তাঁহাদের নিকট এমনি আনন্দদায়ক ছিল যে, কবে সপ্তাহ শেষ হইয়া রবিবার আসিবে—তজ্জন্য তাঁহারা ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের তত্ত্বোপদেশ যেন তাঁহাদের চোখের সম্মুখ হইতে পর্দার পর পর্দা সরাইয়া দৃষ্টি খুলিয়া দিতে লাগিল।

'ঈশ্বরের স্বরূপ কি?'—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন—"আমি আর তোমাদের কি বলব? ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব কি মানুষে বলতে পারে? জলবিন্দুর কাছে যদি সিন্ধুর বৃত্তান্ত জানতে চাও, তা' হলে সে কি তা' দিতে পারে? তাঁর কত ঐশ্বর্য্য অন্যে তার কী বর্ণনা করবে? ব্রহ্মাণ্ডপতি যেন চিনির পাহাড়, ঋষিরা পিঁপড়ে, আপন সামর্থ্য অনুযায়ী এক এক দানা চিনি খেয়েছেন! শুকদেব বড় জোর একটা ডেঁয়ো পিঁপড়ে, একটা বড় দানা তিনি হয়তো খেয়েছেন;—তাতেই হেউঢেউ। অন্যের কথায় আর প্রয়োজন কি? ···ঈশ্বর এক; তাঁর ভাব অনন্ত। মানুষেরা এই ভাবরূপের উপাসনা করে থাকে; সুতরাং উপাসনার প্রণালীও অনন্ত, তাঁর রূপও অনন্ত। তাঁকে ভালবেসে যে যা' বলে তিনি তাই; পিতা, মাতা, সখা প্রভৃতি যে নামে যে ডাকে সেই রূপেই তিনি দেখা দেন। ··

"ঈশ্বরতত্ত্বের স্বরূপটি জানবার জন্যে আমি ব্রহ্মময়ীর কাছে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করেছি। তিনি কৃপা করে আমায় যে রূপ দেখিয়েছেন, তাই দেখেছি, যা শিখিয়েছেন, তাই শিখেছি। আমি বাস্তবিক দেখেছি, এই চোখ দুটো দিয়েই দেখেছি—এ সমুদয় তাঁরই খেলা, একজনেরই খেলা। তিনি কখনও

সাকার, কখনও নিরাকার, কখনও দুয়েরই পারে অবস্থিতি করেন। ···যদি তাঁর তত্ত্ব জানতে চাও, তবে তাঁর দিকে মন ফেলে চুপ করে বসে থাক।"

ইহা শুনিয়া রামচন্দ্র ও মনোমোহন কহিলেন যে, ঈশ্বর সত্যই আছেন বলিয়া যদি নিজেদের অন্তরে কোন আভাস পাওয়া যায়, তবেই শুধু চুপ করিয়া বসিয়া থাকা সম্ভব। নতুবা ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে শুধু যুক্তিতর্ক শুনিয়া বসিয়া থাকা, আর নাস্তিকভাবে বসিয়া থাকা—একই কথা। এতদুত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন—"বিশ্বাস দুরকমের; এক আনুমানিক, আর এক প্রত্যক্ষ। প্রথমে আনুমানিক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে চলতে হয়; তার পর প্রত্যক্ষে পৌঁছানো যায়। তোমরা আগে আনুমানিকে দৃঢ় হও; তার পর প্রত্যক্ষ সব দেখবে।" এই আশ্বাস-বাক্য শুনিয়া দুজনের উৎসাহ খুবই বর্ধিত হইল।

অপর একদিন কথাবার্তাচ্ছলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন—"দেখ, এই সংসার ধোঁকার টাটি।" এ-কথার মর্ম ঠিক হৃদয়ঙ্গম না হইলেও কথাটি তাঁহাদের মনের মধ্যে গাঁথিয়া রহিল। কয়েক দিন চিন্তার পরে উহার প্রকৃত অর্থ তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন। "ইতিপূর্বে আমরা এই সংসারকে মজার কুঠি বলিয়া গণ্য করিতাম; খাই-দাই আর মজা লুটি—এই ছিল আমাদের ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমাদের জানাইলেন, সংসারে মজা আছে বটে, কিন্তু উপভোগ করিতে জানা চাই। কিসের উপভোগ এবং কাহার উপভোগ? এ তত্ত্ব যত দিন না মানুষ বুঝিতে পারে, ততদিন তাহারা মজা লুটিতে গেলেই দুঃখভোগ করিবে। সংসারী জীব অজ্ঞানতাবশতঃ নিত্যবস্তু ও মায়িক বস্তু একাকার করিয়া ফেলে। নিত্য বস্তুই সৎবস্তু, সৎবস্তুর ক্ষয়-বৃদ্ধি নাই। যাহার ক্ষয়-বৃদ্ধি নাই তাহা লইয়া যদি মজা লুটিতে পার, তাহা হইলে তোমাদের আনন্দেরও ক্ষয়-বৃদ্ধি থাকিবে না। কিন্তু অসার অসৎ বস্তু লইয়া মত্ত থাকিলে তোমাদের ধোঁকার টাটিতে পড়িয়া যাইতে হইবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ঐশ্বরিক তত্ত্বের ব্যাখ্যান শুনিয়া—হিন্দুধর্ম পৌত্তলিক, সাকারোপাসনা দোষাবহ ইত্যাদি ধারণা রামচন্দ্রের ও মনোমোহনের হৃদয় হইতে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দুর সামাজিক প্রথা প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহাদের সংশয় ছিল। পরমহংসদেবকে একদিন মনোমোহন প্রশ্ন করিলেন—জাতিভেদ, বর্ণাশ্রম প্রভৃতি প্রথার সার্থকতা কতটুকু? শ্রীরামকৃষ্ণ

তদুত্তরে বলিলেন, "জাতিভেদ আছেও বটে, আবার নাইও বটে। যতক্ষণ সমাজ নিয়ে কথা, ততক্ষণ জাতিভেদ মানতে হবে। যখন মানুষ সামাজিক ধর্ম ছাড়িয়ে সত্যধর্মে পৌঁছবে, তখন আর সামাজিক জাতিবিচারের আবশ্যক থাকবে না। ··· অধিকারি-ভেদ হতেই জাতিভেদের সৃষ্টি। অধিকারি-ভেদ বিচারের দ্বারা খণ্ডন করা যায় না—উহা স্বভাবগত। ··· কেবল আহারে-বিহারে জাতের বিচার তুলে দিলে কি হবে,—সত্যিকার জাত তো আর আহারে-বিহারে নয়? শুয়োর, গরু খেয়েও যদি কেউ ভগবানে মন রাখতে পারে, সে ব্যক্তি ধন্য। আবার হবিষ্যান্ন খেয়েও যদি কামিনীকাঞ্চনে মন ধায়, তবে তাকে ধিক্। যে পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানের উদয় না হয়, সে পর্যন্ত ইচ্ছাপূর্বক জাতির মর্যাদা লোপ করা কোনমতে উচিত নয়। জাতির বাঁধন মস্ত বাঁধন, ভাঙ্গব বল্লেই ভাঙ্গা যায় না। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণের বাঁধন যে ভাঙ্গতে পারে, তারই মাত্র জাতির বাঁধন ভাঙ্গবার অধিকার আছে। ··· ভগবানকে দেখবার পর আর জাতির অভিমান থাকে না, তখন শিশুর মত অবস্থা হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ঘন ঘন যাতায়াতের ফলে তাঁহাদের উভয়ের চরিত্রে এক মহৎ পরিবর্তন সংঘটিত হইতে লাগিল। আত্মীয়-বান্ধব ও পরিজনবর্গ দেখিতে পাইলেন যে, সংসারের প্রতি দিন দিন তাঁহাদের আসক্তি কমিয়া যাইতেছে এবং ঈশ্বরলাভের জন্য তাঁহারা ক্রমশঃ অধিকতর ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছেন। একদা মনোমোহন দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে-ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার পিসীমা মনোমোহনের জননীকে কহিলেন—"দেখ, এমনভাবে তোমার ছেলেকে রোজ রোজ দক্ষিণেশ্বরে যেতে দিও না। ক্রমে ঘর-সংসার ছেড়ে দিলে পর তখন কি করবে?" কিন্তু মনোমোহনের মাতৃদেবী (শ্যামাসুন্দরী) অতীব ধর্মপ্রাণা ছিলেন; পুত্রকে সাধুসঙ্গে মিশিতে দেখিলে তাঁহার হৃদয়ে ভয় না জন্মিয়া আনন্দের সঞ্চার হইত। সুতরাং ননদের কথায় তিনি কিছুমাত্র কান দিলেন না। সেদিন মনোমোহন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইবামাত্র ঠাকুর ক্ষুণ্ণকণ্ঠে তাঁহাকে কহিলেন, "দেখ! একজন এখানে আসে দেখে তার পিসী এমনি এমনি করে নানা কথা বলেছে। কি হবে বল দেখি, সে কি আর এখানে আসবে না?" প্রশ্ন শুনিয়া মনোমোহনের বিস্ময়ের সীমা রহিল না; তিনি নিঃসন্দেহে বুঝিলেন যে, ঠাকুর অন্তর্যামী ও তাঁহার পরম হিতৈষী।

উপরিবর্ণিত ঘটনার কিছুকাল পরে আর একদিন মনোমোহন দক্ষিণেশ্বরে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার স্ত্রী বাধা দিয়া কহিলেন যে, মেয়েটির বড়ই অসুখ, এমতাবস্থায় তথায় না যাইয়া বাড়ীতে থাকিলেই ভাল হয়। কিন্তু মনোমোহন স্ত্রীর অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেলেন। সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলেন ঠাকুর বিষণ্ণমুখে বসিয়া আছেন। প্রণাম করিতেই তিনি কহিলেন—"দেখ বাপু! একটি ভক্ত এখানে সদাসর্বদা আসতে চায়, কিন্তু তার স্ত্রী তাতে অসন্তুষ্ট হয়। আমার বড়ই ভয় হয়, স্ত্রীর পরামর্শে সে এখানে আর না আসে!" একথা শুনিয়া মনোমোহন একবারে অভিভূত হইয়া ঠাকুরের পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন।

মনোমোহন অতীব শান্ত, সরল ও বিনয়ী প্রকৃতির লোক হইলেও তাঁহার মনে অভিমান ছিল—'আমি বড় ভক্ত। আমি কখনো কুপথে যাই না। আমার ন্যায় ঈশ্বরের সেবা আর কে করিতে পারে?' ইত্যাদি। ভক্তদের আচরণ শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদাই নিপুণভাবে লক্ষ্য করিতেন এবং যাহার যে দোষ-ত্রুটি চোখে পড়িত, তাহা সংশোধনের নিমিত্ত যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন। মনোমোহনের ভক্তির অভিমান দূরীকরণের নিমিত্ত তিনি যে উপায় অবলম্বন করিলেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। একদা রবিবারে যখন অন্যান্য ভক্তদের ন্যায় মনোমোহনও দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন সকলের সাক্ষাতে শ্রীরামকৃষ্ণ সুরেশের* ভক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া কহিলেন—"এই সুরেশকে দেখ না কেন? এর ভক্তির কোন তুলনা হয় না।" এ-কথায় মনোমোহনের অভিমানে বড়ই আঘাত লাগিল। পরবর্তী রবিবারে তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাইতে বিরত রহিলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন আর সহজে যাইবেন না। এমন কি, পাছে বন্ধুদের নিকট জবাবদিহি করিতে হয়, সেই ভয়ে কলিকাতার বাসায় না থাকিয়া কোন্নগরে আপন বসতবাটী হইতে প্রত্যহ আফিসে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতি শ্রীরামকৃষ্ণকে কিছু উদ্বিগ্ন করিল। অসুখ-বিসুখ হইয়া থাকিতে পারে ভাবিয়া রামচন্দ্র দত্ত ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দকে মনোমোহনের সন্ধান লইতে তিনি আদেশ করিলেন। তদনুযায়ী তাঁহারা একদিন কোন্নগরে যাইয়া দেখিতে পাইলেন যে, মনোমোহন সুস্থ শরীরে নিরাপদেই রহিয়াছেন, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে আসিতে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক।

* আসল নাম—সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। ইঁহার বিষয় পরে উল্লেখ করা হইয়াছে।

অনেক পীড়াপীড়ি করাতে উত্তর পাওয়া গেল—'আগে ভক্তি হোক্, তার পর যাব'খন।' এই উত্তর শ্রীরামকৃষ্ণকে জানানো হইলে পর তিনি সমগ্র ব্যাপারটি বুঝিতে পারিয়া মনে মনে হাসিলেন।

কয়েক সপ্তাহ চলিয়া গিয়াছে, মনোমোহন দূরে সরিয়াই আছেন ; কিন্তু মনে শান্তি নাই। যতই সঙ্কল্প করেন দক্ষিণেশ্বরের কথা একেবারে ভুলিয়া যাইবেন, ততই শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি মনে পুনঃ পুনঃ উদিত হইয়া মনকে পীড়া দিতে থাকে। মানসিক অস্বস্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া যখন চরমসীমায় যাইয়া পৌঁছিয়াছে, তখন মনোমোহন একদা গঙ্গাস্নানে যাইয়া দেখিতে পাইলেন যে, একখানি নৌকা গঙ্গার ঘাটে ঠিক তাঁহারই অভিমুখে আসিতেছে। লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, নৌকাতে যুবক নিরঞ্জন* ও তাঁহার পার্শ্বে শ্রীরামকৃষ্ণ উপবিষ্ট এবং গ্রীষ্মের উত্তাপ নিবারণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের হাতে পাখার বাতাস করিতেছেন। নৌকা নিকটবর্তী হইলে পর নিরঞ্জন মনোমোহনকে হাত ধরিয়া টানিয়া নৌকায় তুলিয়া লইলেন। তাঁহার জন্য প্রভু স্বয়ং এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন দেখিয়া মনোমোহনের অভিমান মুহূর্তে চূর্ণীকৃত হইল, তিনি প্রভুর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন। ঠাকুর স্নেহগদগদকণ্ঠে তাঁহাকে কহিলেন, "মনোমোহন, তোমার জন্য মন কেমন করছিল, তাই দেখতে এলাম।" সলজ্জভাবে ও তিরস্কৃতের ন্যায় মনোমোহন বলিলেন—"মহাশয়, বুঝতে কি আর বাকি আছে? আমার অহঙ্কারই সকল অনর্থের মূল।" মুখে আর কোন কথা সরিল না ; মনোমোহন বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। নৌকা আরোহীদিগকে লইয়া দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে ফেরত রওয়ানা হইল। মনোমোহনের দর্প ও অভিমান দুই-ই দূরে গেল। তিনি চিরকালের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন।

রামচন্দ্র দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শনলাভের দিন হইতেই গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন হইতে নাস্তিক্যভাব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইতে যথেষ্ট সময় লাগিয়াছিল। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোটানায় পড়িয়া অনেক দিন পর্যন্ত তিনি দারুণ অস্বস্তি ও অশান্তি ভোগ করিয়াছিলেন! এক-একবার তাঁহার মনে হইত—'হায়, কি কুক্ষণেই দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলাম। আমি না পারি ছাড়িতে, না পারি ধরিতে। আমার না হল ঈশ্বরলাভ, না

* শ্রীরামকৃষ্ণের জনৈক ভক্ত ; পরে ইনি সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন।

হল সংসারের ভোগসুখ। আমার একূল-ওকূল দুকূল গেল।' কিন্তু নানা ঘটনা ও অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক মহিমার পরিচয় পাইয়া অবশেষে তিনি দৃঢ়ভাবে তাঁহাকে অবলম্বন করিলেন।

একদা তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে সন্ন্যাস-দীক্ষার নিমিত্ত ধরিয়া বসিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। কহিলেন—"ঝোঁকের বশে কিছুই করা উচিত নয়। কা'কে দিয়ে কি কাজ করাবেন, কা'কে কোন্ পথে নিয়ে যাবেন, তা' একমাত্র ভগবানই জানেন। তুমি সংসার ছেড়ে চলে গেলে তোমার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার কি গতি হবে? ভগবান্ তোমাকে যে পথে নিয়ে যাচ্ছেন, তা ছেড়ে অন্য পথে যাবার চেষ্টা করো না। ধৈর্য অবলম্বন কর। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।" এ-কথায় রামচন্দ্রের তখনকার মত প্রত্যয় জন্মিলেও উহা স্থায়ী হইল না। কয়েক দিন যাইতে না যাইতেই সন্ন্যাসের অভিপ্রায় তিনি আবার ব্যক্ত করিলেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝাইলেন—"সন্ন্যাস নিয়ে তোমার লাভ কি হবে? পরিবারের ভিতরে তুমি কেল্লার মধ্যে রয়েছ। কেল্লার ভিতরে থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যত সহজ, বাইরে থেকে তা' কিছুতেই নয়। যখন অন্ততঃ বারো আনা মন ভগবানে সমর্পণ করতে পারবে, তখন সন্ন্যাসের কথা মুখে আনতে পার, তার আগে নয়।" রামচন্দ্র আর কোন জবাব দিতে পারিলেন না।

কিছুদিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ রাম! তোমাকে বলছি, তুমি ভক্তদের খাওয়াও, তাদের সেবা কর—তোমাকে আর কিছুই করতে হবে না।" রামচন্দ্রের স্বভাব ছিল একটু কৃপণ। সুতরাং এই উপদেশ তাঁহার খুব মনঃপূত হইল না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি পুনঃ পুনঃ উহা মনে করাইয়া দিতে লাগিলেন; এমন কি, স্বয়ং তাঁহার বাড়ীতে যাইবেন বলিয়া একেবারে দিন সাব্যস্ত করিয়া দিলেন। মনে কিঞ্চিৎ বিরক্তি জন্মিলেও এবারে আর এড়াইবার উপায় রহিল না। আশ্চর্যের বিষয়, পরদিন সহসা যেন রামচন্দ্রের হৃদয়ের কপাট খুলিয়া গেল! মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়া তিনি পরমহংসদেবের অভ্যর্থনার সমস্ত আয়োজন করিলেন। পাড়াপ্রতিবেশী এবং সকল ভক্তকে নিমন্ত্রণ করা হইল। ঠাকুরের আগমনে সকলে মিলিয়া যেন আনন্দে একেবারে মত্ত হইলেন। রামচন্দ্র নিজেকে কৃতার্থ ও ধন্য জ্ঞান করিলেন।

পরদিন বৈকালে রামচন্দ্র একাকী দক্ষিণেশ্বরে গেলে পর শ্রীরামকৃষ্ণ স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার কোন প্রার্থনা আছে কি না। এই অযাচিত কৃপায় হতবুদ্ধিপ্রায় রামচন্দ্র কি চাহিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। তখন ঠাকুরই আবার অগ্রণী হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—"তোমাকে আমি যে ইষ্টমন্ত্র দিয়েছিলাম, তা' আমাকে ফিরিয়ে দাও, আর আমার দিকে তাকাও।" রামচন্দ্র তাহাই করিলেন। বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে তিনি দেখিতে পাইলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেই তাঁহার ইষ্টমূর্তি বিরাজমান! তাঁহার সকল বাসনা চরিতার্থ এবং জীবন সার্থক হইল।

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন রামচন্দ্র ও মনোমোহনের বিশিষ্ট বন্ধু। তিনি কোনও ইংরেজ সওদাগরী আফিসে বড়বাবুর কাজে নিযুক্ত থাকিয়া যথেষ্ট রোজগার করিতেন। ঈশ্বর, পরকাল প্রভৃতি লইয়া তিনি কদাচ মাথা ঘামাইতেন না। ইহজন্মে যত পার খাও-দাও মজা লুঠো—ইহাই ছিল তাঁহার নীতি। কিন্তু ধর্মকর্মের ধার না ধারিলেও সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়টি ছিল খুব দয়ার্দ্র। পরের দুঃখ দেখিলে সহজেই তিনি কাতর হইতেন। শাস্ত্র বলেন, দয়াগুণ সাত্ত্বিকতার একটি প্রধান লক্ষণ। তাই সাংসারিক সুখভোগে নিমগ্ন থাকিয়াও সুরেন্দ্রনাথের প্রাণে শান্তি ছিল না। একটা তীব্র অভাব ও বেদনাবোধ তাঁহার অন্তরে সর্বদা লাগিয়াই থাকিত, আর উহাই ধর্ম-জিজ্ঞাসার মূলকথা।

সুরেন্দ্রনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে লইয়া যাইবার নিমিত্ত রামচন্দ্র এবং মনোমোহন খুবই আগ্রহান্বিত ছিলেন; কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত তাঁহাদের এবিষয়ক চেষ্টা সফলতা লাভ করে নাই। পীড়াপীড়ির ফলে সুরেন্দ্রনাথ অবশেষে একদা কহিলেন—"তোমরা তাঁকে শ্রদ্ধা কর ভালই, কিন্তু আমাকে কেন ওখানে নিয়ে যাবে? বুজরুকি অনেক দেখেছি। তোমাদের পরমহংস দেখতে গিয়ে যদি ভণ্ড দেখতে পাই, তবে আমি কিন্তু কান মলে দেবো!" এই রূঢ়বাক্য ও ভয়প্রদর্শন গ্রাহ্য না করিয়া রামচন্দ্র এবং মনোমোহন সুরেন্দ্রনাথকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া গেলেন। তাঁহারা যখন তথায় পৌঁছিলেন, তখন ঠাকুরের চারিপাশে ঘরভর্তি লোক, তিনি তাহাদিগকে তত্ত্বকথা শুনাইতেছেন। ঠাকুরকে প্রণিপাত কিংবা অভিবাদন না করিয়াই সুরেন্দ্র আসন-গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর সেই সময়ে উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দকে উপদেশ-

দানচ্ছলে বলিতেছিলেন—"আচ্ছা, লোকে বেরালছানা না হয়ে বাঁদরছানা হতে চায় কেন? বাঁদরছানা মাকে জড়িয়ে ধরে,—মা যখন লাফাতে লাফাতে চলে, তখন মাকে আঁকড়ে থাকে। কিন্তু বেরালছানার স্বভাব সম্পূর্ণ অন্যরূপ। তার নিজের কোন চেষ্টা নেই, সে শুধু মিউ মিউ করতে থাকে। তখন মা এসে তাকে মুখে করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। বাঁদরছানার হাত অনেক সময় ফস্‌কে যায়, মায়ের কোল থেকে পড়ে গিয়ে তখন সে আঘাত পায়। কিন্তু বেরালছানার সে ভয় নেই, যেহেতু মা নিজেই তাকে সাবধানে ধরে নিয়ে চলে। নিজের চেষ্টা এবং ভগবানের উপর নির্ভর, দুয়ের মধ্যে এখানেই প্রভেদ।" কথাগুলি সুরেন্দ্রের অন্তরে যেন তীরের ন্যায় বিদ্ধ হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন— "তাইতো, আমার আচরণ ঠিক বাঁদরছানার মত। আমি নিজের ইচ্ছায় ও নিজের চেষ্টায় সব কিছু করতে চাই এবং তার ফলেই বারংবার এত আঘাত পাই। আমিও কেন ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে শিখি না? তিনি যখন যেভাবে রাখেন তাতেই যদি তুষ্ট থাকি, তবে তো সকল উৎপাত মিটে যায়।"

আরও দু-একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরনির্ভরতার উপদেশটি শ্রোতৃবর্গের মনে খুব দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিলেন। সুরেন্দ্রের সকল সন্দেহ, সকল অবিশ্বাস যেন নিমেষে দূরীভূত হইল। বিদায় লইবার কালে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে পর ঠাকুর সস্নেহে কহিলেন, "আবার এসো; দেখো, যেন ভুল না হয়!" ভুলিবার আর উপায় ছিল না; সুরেন্দ্র জালে ধরা পড়িয়াছিলেন। এই সুরেন্দ্রকে ঠাকুর 'সুরেশ মিত্তির' বলিয়া ডাকিতেন ও অতিশয় স্নেহ করিতেন। সুরেন্দ্রের বাড়ীতে তিনি বহুবার গিয়াছিলেন এবং সুরেন্দ্রকে নিজের 'রসদ্দার'দিগের অন্যতম বলিয়া বর্ণনা করিতেন।

রামচন্দ্র ও মনোমোহন সুযোগ পাইলেই নিজেদের বন্ধুবান্ধব ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট লইয়া গিয়া হাজির করিতেন। বক্তৃতা, আলোচনা, নগরসংকীর্তন প্রভৃতি উপায়ের দ্বারাও উভয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী লোক-সমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। অধিকন্তু, ঐ সমস্ত অমূল্য উপদেশ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া 'তত্ত্বসার' ও 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' নামক দুখানি

পুস্তক রামচন্দ্র-কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল।* শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের অল্পকাল পূর্বে 'তত্ত্বমঞ্জরী' নামক একটি মাসিক পত্রিকাও তিনি ঐ একই উদ্দেশ্যে বাহির করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র ও মনোমোহন কীর্তন খুব ভালবাসিতেন এবং কীর্তনানন্দে আত্মহারা হইয়া নৃত্যগীত করিতেন। একসময়ে কীর্তনের নেশায় সাঙ্গোপাঙ্গ-সহ তাঁহারা এমনি মজিয়া গিয়াছিলেন যে, অপরের সুবিধা-অসুবিধা বিচার না করিয়া দিন নাই রাত্রি নাই, যখন-তখন উচ্চরোলে কীর্তন জুড়িয়া দিতেন। পাড়াপড়শী অতিষ্ঠ হইয়া অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণকে অনুরোধ করিতে বাধ্য হন তাঁহার উৎসাহী ভক্তবৃন্দের এই দৌরাত্ম্য থামাইবার জন্য। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে কীর্তনের জন্য এমন একটি স্থান জোগাড় করিয়া লইতে পরামর্শ দেন, যেখানে একশত খুন হইয়া গেলেও লোকে জানিতে পাইবে না। এই পরামর্শানুযায়ী ভক্তেরা কাঁকুড়গাছিতে একটি বাগানবাটী ক্রয়পূর্বক আশ্রম স্থাপন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণে ঐ স্থান ধন্য হইয়াছিল। উহাই এখন কাঁকুড়গাছির 'যোগোদ্যান' নামে পরিচিত।

---

* কথিত আছে যে—রামচন্দ্র দত্ত তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত ও উপদেশাবলী ছাপাইয়া প্রচার করিতেছেন, একথা জানিতে পারিয়া—এই কার্য হইতে বিরত থাকিবার নিমিত্ত পরমহংসদেব রামচন্দ্রকে উপদেশ দেন। এই প্রসঙ্গে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন প্রণীত পরমহংস-দেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। "পরমহংসদেবের বিনয় অতি চমৎকার ছিল। কাহারো সহিত সাক্ষাৎ হইলে পূর্বেই তিনি নমস্কার করিতেন। তাঁহার উক্তিসকল মুদ্রিত হইয়া প্রচার হয়, সংবাদপত্রাদিতে তাঁহার বিষয় কিছু লেখা হয়, তাঁহার ফটোগ্রাফ তোলা হয়—তিনি এরূপ ইচ্ছা করিতেন না। সমাধির অবস্থায় বাহ্য-জ্ঞানশূন্য না হইলে তাঁহার ফটোগ্রাফ তোলা যাইতে পারে নাই। সমাধিকালে তিনি অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পড়িতেন না, লম্ফঝম্ফপ্রদানে পার্শ্বস্থ লোকদের প্রতি কোনরূপ উৎপাত করিতেন না। উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান হইয়া স্থিরভাবে থাকিতেন। ঈদৃশ সাধুপুরুষ ঈশ্বরের কৃপার জ্বলন্ত নিদর্শন, ঘোর তিমিরাবৃত দুস্তর ভবার্ণবে নিমগ্নপ্রায় জীবনতরী পথিকের পক্ষে আশাজনক ও আলোকস্তম্ভস্বরূপ। আমরা চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগের জীবন-বৃত্তান্ত পুস্তকেই পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এই জীবন আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।"

সন্ন্যাসী ভক্তবৃন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে রামচন্দ্র, মনোমোহন ও সুরেন্দ্রনাথের আগমন তাঁহাদের নিজ নিজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সন্দেহ নাই; কিন্তু ইতিহাসের দৃষ্টিতে উহার গুরুত্ব আরও অনেক বেশী, যেহেতু উহা ছিল এক সুমহৎ ভবিতব্যের সূচনা। যে সকল আজন্মশুদ্ধ শক্তিমান্ যুবক ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যত্বগ্রহণপূর্বক সর্বত্যাগী হইয়া উত্তরকালে দেশবিদেশে তাঁহার উপদেশের প্রচারকার্যে এবং মানব-সেবায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিবেন— তাঁহাদের কয়েকজনকে উঁহারাই সর্বপ্রথমে শ্রীগুরুর সন্নিধানে আনিয়া উপস্থিত করেন। রাখাল এবং নরেন্দ্রনাথ উঁহাদের দ্বারাই আনীত হইয়াছিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তদিগকে কাছে পাইবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণ তখন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া পরবর্তীকালে একদা তিনি শিষ্যদের নিকট বলিয়াছিলেন— "তোদের সব দেখবার জন্যে প্রাণের ভিতরটা তখন এমন করে উঠত, এমনভাবে মোচড় দিত যে, যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়তুম। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হত। লোকের সামনে কি মনে করবে ভেবে কাঁদতে পারতুম না। কোনও রকমে সামলে সুমলে থাকতুম। আর যখন দিন গিয়ে রাত আসত,—মার ঘরে, বিষ্ণুঘরে আরতির বাজনা বেজে উঠত—তখন আরও একটা দিন গেল —তোরা এখনও এলিনি ভেবে আর সামলাতে পারতুম না; কুঠির উপর ছাদে উঠে—'তোরা সব কে কোথায় আছিস্ আয় রে'—বলে চেঁচিয়ে ডাকতুম ও ডাক ছেড়ে কাঁদতুম। মনে হত পাগল হয়ে যাব! তার পর কিছুদিন বাদে তোরা সব আসতে আরম্ভ করলি—তখন ঠাণ্ডা হই।"

যে সমস্ত শুদ্ধসত্ত্ব যুবক তাঁহার পক্ষপুটের আশ্রয়ে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি হোমাপাখীর শাবকের সহিত তুলনা করিতেন। বলিতেন, "এসব ছোকরা নিত্যসিদ্ধের থাক্। ঈশ্বরের জ্ঞান নিয়ে জন্মেছে! একটু বয়স হলেই বুঝতে পারে, সংসারের ছোঁয়া গায়ে লাগলে আর রক্ষা নেই। বেদে আছে হোমাপাখীর কথা। সে পাখী আকাশেই থাকে, মাটির উপর কখনও আসে না। আকাশেই ডিম পাড়ে। ডিম পড়তে থাকে; কিন্তু এত উঁচুতে পাখী থাকে যে, পড়তে পড়তে ডিম ফুটে যায়। তখন পাখীর ছানা বেরিয়ে

পড়ে, সেও পড়তে থাকে। তখনও এত উঁচু যে, পড়তে পড়তে ওর পাখা ওঠে ও চোখ ফোটে। তখন সে দেখতে পায় যে, আমি মাটির উপর পড়ে যাব! মাটিতে পড়লেই মৃত্যু! মাটি দেখাও যা', অমনি মার দিকে চোঁচা দৌড়! একেবারে উড়তে আরম্ভ করে দিলে, যা'তে মা'র কাছে পৌছতে পারে। এক লক্ষ্য, মার কাছে যাওয়া। এ সব ছেলেরা ঠিক সেই রকম। ছেলেবেলাই সংসার দেখে ভয়। এক চিন্তা কিসে মা'র কাছে যাব, কিসে ঈশ্বরলাভ হয়।"*

এই যুবকবৃন্দের প্রায় সকলেই পরে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। ইঁহাদের সকলের কথা সামান্যভাবে বলিতে গেলেও গ্রন্থের কলেবর অনেক বাড়িয়া যাইবে। অতএব মাত্র কয়েকজনের পরিচয় এবং ঠাকুরের নিকট তাঁহাদের আগমনের বৃত্তান্ত এই অধ্যায়ে অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। শুধু নরেন্দ্রনাথের সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে পৃথক্‌ভাবে বলা যাইবে। বর্ণনায় সময়ের পৌর্বাপর্য সর্বত্র রক্ষা করা সম্ভবপর হয় নাই।

লাটু মহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দ)—সর্বপ্রথমে আমরা বলিব লাটু মহারাজের কথা। তাঁহার আসল নাম 'রাখতুরাম'। ছাপরা জেলার কোনও নগণ্য পল্লীগ্রামে এক দরিদ্র মেষপালক পরিবারে তিনি জন্মিয়াছিলেন। অতি শৈশবে বসন্তরোগের আক্রমণে জীবনসংশয় ঘটিলে শ্রীরামচন্দ্রের দয়ার উপর সন্তানকে সঁপিয়া দিয়া পিতামাতা প্রার্থনা করিয়াছিলেন—'রাখ-তুঁ-রাম'। রামের দয়ায় শিশুর জীবন রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু বয়স পাঁচ বৎসর পূর্ণ না হইতেই পরপারে পিতামাতার ডাক পড়িল। তৎপরে পিতৃব্যের গৃহে অনাথ রাখতুরাম প্রতিপালিত হন। পিতৃব্যও অতিশয় গরীব ছিলেন। অভাবের তাড়নায় ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে লইয়া রোজগারের উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসিতে বাধ্য হন এবং স্বগ্রামবাসী জনৈক ব্যক্তির সাহায্যে রাখতুকে বালক-ভৃত্যরূপে রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গৃহে নিযুক্ত করাইয়া দেন। বিধাতা যেন একটি শুচিশুভ্র সুরভি বনকুসুমকে ঝড়ের বাতাসে উড়াইয়া আনিয়া পূজার ফুলের সাজিতে ফেলিয়া দিলেন!

রামচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করিবার পর বাড়ীতে প্রায় সব সময়ই শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় আলাপ-আলোচনা করিতেন। ঐ সমস্ত কথাবার্তা শুনিয়া

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবার নিমিত্ত বালক লাটুর মনে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মে, এবং প্রবল ইচ্ছার প্রেরণায় বালক একদিন কাহাকেও না বলিয়া একাকী দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে রওয়ানা হইয়া যায়। পথঘাট কিছুই তাহার জানা ছিল না। লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া কোনপ্রকারে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। সে মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল যে, তাহার মনিব যে মহাত্মার পায়ে মাথা বিকাইয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই একজন বড়রকমের মোহান্ত হইবেন এবং তাঁহার চেহারা ও বেশভূষাও হইবে খুব জমকালো। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া লাটু দেখিল, সাধারণ ধুতিপরা সৌম্যদর্শন একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন। উঁহাকে দেখিবামাত্র লাটুর মনে কেমন যেন ভক্তি-ভাবের উদয় হইল এবং সে তাঁহার পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিল। শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসাপূর্বক যখন জানিলেন যে, সে ভক্ত রামচন্দ্রের বাড়ী হইতে আসিয়াছে, তখন তাহাকে সস্নেহে ঘরের ভিতর ডাকিয়া লইয়া বসাইলেন এবং কিছুক্ষণ নানা কথাবার্তা বলিয়া প্রসাদ খাইতে দিলেন। বালক লাটুর মনে স্ফূর্তির সীমা রহিল না। কিজন্য সে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছে, তখন তাহার আর বিন্দুমাত্র খেয়াল নাই। আপনা হইতেই তাহার চাওয়া-পাওয়া সমস্তই যেন মিটিয়া গিয়াছে! বালকের কেবলি মনে হইতেছিল যে, এমন আপনার লোক এবং এমন ভালবাসা সে জীবনে আর কখনও পায় নাই।

লাটু বাড়ী ফিরিবার উপক্রম করিলে শ্রীরামকৃষ্ণ সস্নেহে কহিলেন, "এতখানি পথ পায়ে হেঁটে যেতে পারবে না। এখান থেকে পয়সা নিয়ে ঘোড়ার গাড়ীতে কিংবা নৌকোয় চলে যাও।" লাটু উত্তর করিল, "যে আজ্ঞা, মহাশয়। কিন্তু পয়সা আপনাকে দিতে হবে না, গাড়ীভাড়ার পয়সা আমার কাছে রয়েছে।" বালকের কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ মৃদু হাসিয়া একটু যেন অবিশ্বাসের সুরে বলিলেন, "ঠিক আছে তো? ভাল করে দেখে নাও। না থাকে তো চাইতে লজ্জা করো না। আমার কাছে আবার লজ্জা কি?" লাটু তখন জামার পকেট নাড়িয়া ঝন্‌ঝন্ শব্দ করিয়া কহিল, "এই শুনুন, আওয়াজ।" শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আবার এস কিন্তু!" "হাঁ, নিশ্চয় আসব" বলিয়া লাটু বিদায় লইল।

লাটু দক্ষিণেশ্বরের পথঘাট চিনিয়া লওয়াতে গৃহস্বামীর পক্ষে খুব ভালই হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য উপহার-দ্রব্যাদি সহ রামচন্দ্র মাঝে মাঝে লাটুকে

রাখালচন্দ্র

তথায় পাঠাইতে লাগিলেন। এইভাবে লাটুর ক্রমশঃ অধিকতর মাত্রায় শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গলাভের সুযোগ ঘটিল। কখনও কখনও সে দক্ষিণেশ্বরে দুই-চারিদিন একসঙ্গে কাটাইয়া দিত। শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাতেই ছিল তাহার পরম তৃপ্তি ও আনন্দ। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি হৃদয়রাম চলিয়া যাওয়াতে সেবকের অভাবে ঠাকুরের কিছু অসুবিধা হইতেছিল। তাই একদিন তিনি রামচন্দ্রকে বলিলেন যে, লাটু যদি বরাবরের জন্য দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া যায়, তবে বড়ই ভাল হয়। বলা বাহুল্য, রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ উহাতে সম্মতি দিলেন। এইরূপে লাটু সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া চিরতরে প্রভুর সকাশে আসিয়া উপনীত হইলেন।

লাটুকে বাংলা লেখাপড়া শিখাইবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুদিন চেষ্টা করিয়াছিলেন, পরে অকৃতকার্য হইয়া ছাড়িয়া দেন। লাটুর বিহারী ঢংয়ের উচ্চারণ লইয়া ঠাকুর অনেক ফষ্টিনাষ্টি করিতেন; কিন্তু এ সমস্তই বাহ্য। গুরুকৃপায় লাটু ঈশ্বরলাভের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পুঁথিগত বিদ্যায় বস্তুতঃ তাঁহার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কীর্তন তিনি খুব ভালবাসিতেন এবং কীর্তনানন্দে আত্মহারা হইয়া নাচগান করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের রোগদশায় লাটু অসীম ধৈর্য, নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীগুরুর সেবা দ্বারা নিজের জীবন ধন্য এবং গুরুভাইদের মনে অসীম বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক তিনি 'স্বামী অদ্ভুতানন্দ' নামে পরিচিত হন। তাঁহার সপ্রেম ব্যবহারে ও মধুর বাক্যালাপে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। গুরু বই তিনি কিছুই জানিতেন না, এবং তাঁহার হৃদয়ে অহঙ্কারের লেশমাত্র স্থান পাইত না। তাঁহার সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন—"তোমরা যদি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাইতে চাও, তবে লাটুর দিকে তাকাও; এমন কাণ্ড আমি কখনও দেখি নাই।"

রাখালচন্দ্র (স্বামী ব্রহ্মানন্দ)—১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে রাখালচন্দ্র ঘোষ শ্রীরামকৃষ্ণসকাশে প্রথম আগমন করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাটে এক জমিদার পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেকালের প্রথানুযায়ী, বিশেষতঃ ধনীর গৃহের দুলাল হওয়ার দরুন—অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই রাখালের বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়। মনোমোহনের এক সহোদরা ভগিনীর সহিত তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ধনীর গৃহে জন্মিলেও

রাখালের চরিত্রে ধনগর্ব, বিলাসিতা, ভোগলিপ্সা প্রভৃতির চিহ্নমাত্র ছিল না। পরন্তু তাঁহার নিস্পৃহতা, ভক্তিবিশ্বাস ও ধ্যানপরায়ণতা সকলকে বিস্মিত করিত। বিবাহের অল্পকাল পরে মনোমোহন ও রামচন্দ্রের সহিত তিনি একবার দক্ষিণেশ্বরে গেলে পর, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র নিজের চিহ্নিত ভক্ত বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন। রাখালকে তিনি পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং ভক্তমণ্ডলীতে রাখাল বস্তুতঃ তাঁহার মানসপুত্ররূপেই পরিচিত হইয়াছিলেন।

রাখালের সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ একবার এরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন, "বাপ জমিদার, অগাধ পয়সা ;—কিন্তু বড়ই কৃপণ ছিল। প্রথম প্রথম নানাভাবে চেষ্টা করেছিল যাতে ছেলে এখানে আর না আসে ; পরে যখন দেখলে যে ধনী, গুণী, বিদ্বান লোক সব আসে, তখন আর ছেলের আসায় আপত্তি করত না। ছেলের টানে কখনো কখনো নিজেও এথায় এসে হাজির হ'ত। তখন রাখালের জন্যে তাঁকে খুব খাতির-যত্ন দ্বারা তুষ্ট করে দিতাম। শ্বশুরবাড়ীর তরফ থেকে কিন্তু রাখালের এখানে আসা নিয়ে কখনো কোন আপত্তি ওঠেনি। কারণ, মনোমোহনের মা, স্ত্রী, ভগ্নী—সকলেরই এখানে খুব যাওয়া-আসা ছিল। রাখাল আসবার অল্পকাল পরে মনোমোহনের মা একদিন রাখালের বৌকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত। তখন মনে প্রশ্ন জাগল—বৌয়ের সংসর্গে আমার রাখালের ঈশ্বরভক্তির হানি ঘটবে না তো ? এই ভেবে তাকে কাছে আনিয়ে পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত শারীরিক গঠনভঙ্গী খুব তন্ন তন্ন করে দেখলাম। দেখে বুঝতে পারলুম ভয়ের কোন কারণ নেই—বিদ্যাশক্তি, স্বামীর ধর্মপথের অন্তরায় কখনো হবে না। তখন তুষ্ট হয়ে নহবতে (শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে) বলে পাঠালুম,—টাকা দিয়ে যেন পুত্রবধূর মুখ দেখে।" এই বর্ণনা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায়, ঠাকুর রাখালকে কিরূপ অপার স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামে ইনি লোকসমাজে পরিচিত। সকল গুরুভাই ইঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন যখন স্থাপিত হয়, তখন স্বামী বিবেকানন্দপ্রমুখ গুরুভাইয়েরা ইঁহাকেই একবাক্যে প্রথম সর্বাধ্যক্ষরূপে বরণ করিয়াছিলেন।

বুড়ো গোপাল (স্বামী অদ্বৈতানন্দ)—রাখালের আগমনের অল্পদিন পরেই আসেন গোপালচন্দ্র সুর (ঘোষ ?)। তাঁহার বাস ছিল সিঁথিতে

এবং তিনি কাজ করিতেন চিনাবাজারে বেণীমাধব পালের দোকানে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থে বেণী পালের উল্লেখ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বেলঘরিয়ার উদ্যানে কেশব সেনকে দেখিতে যান, তখন গোপালচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন; উহাই সর্বপ্রথম দেখা। বেণী পাল ব্রাহ্ম হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অতিশয় ভক্তিমান ছিলেন এবং মাঝে মাঝে ঠাকুরকে আমন্ত্রণ করিয়া নিজ বাটীতে অথবা সিঁথিতে আপন বাগানবাটীতে লইয়া যাইতেন। তথায় গোপালচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে নিশ্চয়ই আরও দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু উহা ছিল চোখের দেখা মাত্র এবং দূর হইতে দেখা। যে দেখা তাঁহাকে ঠাকুরের অনুগ্রহলাভে সমর্থ করে, তাহা ঘটিয়াছিল আরও পরে; ঠিক কবে তাহা জানা যায় না। গোপালচন্দ্র ঘোরতর সংসারী ছিলেন। আকস্মিক পত্নী-বিয়োগের ফলে দারুণ শোকগ্রস্ত হইয়া জনৈক বন্ধুর পরামর্শে সান্ত্বনালাভের আশায় তিনি দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট গমন করেন। প্রথম সাক্ষাৎকারে তাঁহাকে অনেকটা নিরাশভাবে ফিরিয়া আসিতে হয়। তখন বন্ধুটি তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, প্রথম দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের নিকট ধরা দেন না, পুনরায় গেলে হয়ত দয়া করিবেন। ফলতঃ তাহাই হইল। গোপাল দ্বিতীয়বার গেলে পর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া তাঁহার হৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষণ করিলেন। তৎকর্তৃক প্রদত্ত ত্যাগবৈরাগ্যের উপদেশ গোপালের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইল। পরিশেষে ঘরসংসার ছাড়িয়া তিনি ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তবৃন্দের দলে যোগদান করেন। সন্ন্যাসাশ্রমে তাঁহার নাম হইয়াছিল—স্বামী অদ্বৈতানন্দ। অন্যান্য ভক্তদের চেয়ে এমন কি, ঠাকুরের চেয়েও বয়সে বড় ছিলেন বলিয়া ঠাকুর তাঁহাকে ডাকিতেন 'বুড়ো গোপাল' অথবা 'মুরব্বী'। ঠাকুরের রোগশয্যায় সেবাশুশ্রূষার কাজে তিনি অপরিসীম নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। গোপাল শৃঙ্খলা ভালবাসিতেন এবং সমস্ত জিনিসপত্র খুব নিখুঁত ও সুন্দরভাবে সাজাইয়া রাখিতেন। ঠাকুরের উহা খুব পছন্দসই ছিল।

তারকনাথ (স্বামী শিবানন্দ)—বারাসতের এক সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারে তারকনাথের জন্ম (১৮৫৫ খ্রীঃ, নবেম্বর)। তাঁহার পিতা রামকানাই ঘোষাল মোক্তারি দ্বারা যথেষ্ট রোজগার করিতেন, কিন্তু ভোগবিলাসে তাঁহার কিছুমাত্র মন ছিল না। ধর্মকর্মে, সাধুসেবায় এবং বিশেষতঃ দরিদ্র ছাত্রদিগের

ভরণপোষণে তাঁহার আয়ের প্রায় সমুদয় অর্থ ব্যয়িত হইত। অধিকন্তু, তিনি ছিলেন তন্ত্রমতে কালীর উপাসক। রানী রাসমণির জমিদারি সেরেস্তায় আইনসংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি পরামর্শ দিতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ যে সময় সাধনায় নিরত, সেই সময়ে মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। ঐ সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় ঘটিয়াছিল। সাধনকালে সর্বাঙ্গে জ্বালা উপস্থিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ যখন একবার অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, তখন রামকানাই তাঁহাকে ইষ্টকবচ ধারণের পরামর্শ দেন। উক্ত পরামর্শানুযায়ী কবচ ধারণ করিয়া ফল পাওয়াতে রামকানাইয়ের সহিত তাঁহার হৃদ্যতা জন্মে।

তারকনাথ শিশুকাল হইতেই স্থিরস্বভাব ও ধ্যানপরায়ণ ছিলেন। চতুর্দিকের দৃশ্যজগৎ বালকের নিকট অদ্ভুত রহস্যাবৃত বলিয়া মনে হইত এবং সেই রহস্যজাল ছিন্ন করিবার প্রবল বাসনা যেন তাঁহাকে নেশার মত পাইয়া বসিত। মেধাবী হইলেও পড়াশুনার প্রতি তাঁহার তেমন ঝোঁক ছিল না। বালক তারকনাথ অনেক সময়ে স্থিরভাবে বসিয়া ধ্যানস্থ হইয়া পড়িতেন।

একটু বড় হইয়া কলিকাতায় আসিবার পর তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত আরম্ভ করেন। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হইতেন, কিন্তু উহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা বস্তুতঃ মিটিত না। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা তিনি প্রথমে নববিধান সমাজেই জানিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে দেখিবার সৌভাগ্য তখনও হইয়া উঠে নাই, যেহেতু, পিতার আয় কমিয়া যাওয়াতে তাঁহাকে কাজকর্মের চেষ্টায় শীঘ্রই দিল্লী চলিয়া যাইতে হয়। তথায় অবস্থানকালে জনৈক বন্ধুর সহিত যৌগিক সাধনপদ্ধতির বিষয় খুব আলোচনা করিতেন। বন্ধুটি একদিন তাঁহাকে কহিলেন যে, এই সকল ব্যাপারে পুঁথিপড়া বিদ্যার কোনই মূল্য নাই; প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ব্যতিরেকে কিছুই জানা হয় না, আর যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী সমাধিমান্ পুরুষ বলিতে তিনি একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকেই জানেন। পরমহংসদেবকে দেখিবার ইচ্ছা তারকনাথের মনে পূর্বাবধিই ছিল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর যত শীঘ্র সম্ভব তাঁহার সন্নিধানে যাইবেন। কিছুকাল পরে কলিকাতায় ফিরিয়া তারকনাথ ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী কোম্পানিতে একটি চাকরি পাইলেন। ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত তখনও করিতেন। তথায় রামচন্দ্র দত্তের জনৈক

আত্মীয়ের মুখে শুনিতে পাইলেন যে, দুই-চারিদিনের মধ্যে পরমহংসদেব রামচন্দ্রের গৃহে পদার্পণ করিবেন। তারকনাথ ভাবিলেন, এই সুযোগ পরিত্যাগ করা উচিত নহে। নির্ধারিত দিনে ও সময়ে (১৮৮০ অথবা ১৮৮১ খ্রীঃ) তিনি রামচন্দ্রের বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, ঘরভর্তি লোকের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট অবস্থায় উপদেশ দিতেছেন। কিছুকাল যাবৎ তারকনাথের মনে সমাধির বিষয়ে নানা প্রশ্নের উদয় হইতেছিল; তিনি বিস্ময়বিমুগ্ধভাবে শুনিতে লাগিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিক যেন সেই সকল প্রশ্নেরই উত্তর দিতেছেন। আর এমনই সহজ, সরল, স্পষ্ট ভাষায় সেই উত্তর যে, প্রশ্নকর্তার সকল সংশয় তাহাতে নিঃশেষে ঘুচিয়া যায়। পরবর্তী শনিবারেই দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

দক্ষিণেশ্বরের সম্পর্কে তারকনাথের বিশেষ কিছুই জানা ছিল না। একজন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া যখন তিনি সেখানে পৌছিলেন, তখন সন্ধ্যারতির সময় হইয়াছে। ঠাকুর তাঁহার ঘরের পশ্চিম দিকের গোল-বারান্দায়, গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তারকনাথ সম্মুখে যাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে পর ঠাকুর সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আগে কোথাও আমায় দেখেছিলে কি?" তারক কয়েকদিন পূর্বে রামবাবুর বাড়ীতে তাঁহার দর্শনলাভের কথা বলিলেন। শুনিয়া ঠাকুর খুশী হইলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নিজের ঘরে গিয়া ছোট খাটটিতে বসিলেন। তারক প্রাণের আবেগে তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া তাঁহাকে পুনরায় প্রণাম করিলেন। ঠাকুরও তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। তারকের মনে হইল ঠিক যেন স্নেহময়ী মা! কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ তারককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, তোমার কিসে বিশ্বাস? সাকারে না নিরাকারে?" তারক কহিলেন, "নিরাকারই আমার ভাল লাগে।" ঠাকুর শুধু বলিলেন—"শক্তি মানতে হয়।" এবং ইহা বলিয়াই তারকনাথকে সঙ্গে লইয়া কালীমন্দিরের দিকে চলিলেন। মন্দিরে তখন মায়ের আরতি হইতেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ কালীমূর্তির সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। ঐরূপ করিতে তারকনাথের বাধ-বাধ ঠেকিল; কারণ তিনি ব্রাহ্মসমাজের যুবক, মূর্তিকে পাথর ছাড়া আর কিছুই মনে করেন না। কিন্তু সহসা যেন এক নূতন ভাব তাঁহার হৃদয়ে বিদ্যুতের ন্যায় খেলিয়া গেল। তাঁহার মনে হইল, "আমার ধারণা এত সঙ্কীর্ণ কেন? শুনতে পাই ঈশ্বর

সর্বব্যাপী—জড় এবং চেতন সব কিছুতেই তিনি বিরাজমান। যদি তাই হয়, তবে এই পাষাণমূর্তিতেও কেন না তিনি থাকতে পারবেন?" এই চিন্তাধারার বশবর্তী হইয়া কালীমূর্তির সম্মুখে তিনি ভূমিষ্ঠভাবে প্রণাম করিলেন।

তারকনাথকে দেখিবামাত্র ঠাকুর তাঁহার গুণ ও স্বভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কালীমন্দির হইতে নিজের ঘরে ফিরিয়া তাঁহাকে কহিলেন—"আজ রাত্রিতে এখানে থাক। দু'দণ্ডের জন্যে এসে কি হয়? এখানকার ভাব নিতে হলে ঘন ঘন আসা চাই; মাঝে মাঝে দু'চার দিন একটানাভাবে থাকা চাই।" কিন্তু তারকনাথের সেদিন থাকিবার উপায় ছিল না, কারণ সঙ্গী বন্ধুটির বাড়ীতে যাইবেন বলিয়া পূর্বেই তিনি কথা দিয়া আসিয়াছিলেন। পরদিন বিকালেই তিনি আবার আসিলেন এবং রাত্রিতে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে থাকিয়া সাধনার উপদেশ পাইতে আরম্ভ করিলেন।

তারকনাথ কয়েকবার যাতায়াত করিবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন তাঁহাকে বলিলেন, 'আচ্ছা, তোমার বাবার নাম কি? এখানে যারা আসে আমি তাদের শুধু ভিতরটাই দেখি, বাইরের পরিচয় বড় একটা জিজ্ঞেস করি না। কিন্তু তোমার পারিবারিক পরিচয় জানবার ইচ্ছে হয়েছে।' উত্তরে যখন জানিতে পারিলেন যে, যুবকটি রামকানাই ঘোষালের পুত্র, তখন তাঁহার প্রতি স্নেহভালবাসা আরও যেন বহুগুণ বাড়িয়া গেল। তিনি তাঁহাকে সাধনার পথে অতি দ্রুত অগ্রসর করিয়া দিতে লাগিলেন।

বিবাহে নিতান্ত অনিচ্ছা থাকিলেও নিয়তির নির্বন্ধে তারকনাথকে দারপরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সংসারের স্পর্শ হইতে তিনি সর্বতোভাবে মুক্ত ছিলেন। বিবাহের তিন-চার বৎসর পরেই পত্নী অকালে পরলোকগমন করাতে, যেটুকু নামমাত্র বন্ধন ঘটিয়াছিল, তাহাও আপনা হইতেই খসিয়া পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের অব্যবহিত পূর্বে তারকনাথ পিতার নিকট হইতে সন্ন্যাসের অনুমতি লইয়াছিলেন। সেই ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। পুত্রকর্তৃক সঙ্কল্প ব্যক্ত হইবার পর পিতার বদনমণ্ডল অশ্রুজলে প্লাবিত হইল; কিন্তু সেই অশ্রু শুধু দুঃখজনিত ছিল না, উহা ছিল যুগপৎ বেদনাশ্রু, প্রেমাশ্রু ও আনন্দাশ্রু। পিতার আদেশে তারকনাথ প্রথমে গৃহদেবতাকে প্রণামপূর্বক আশীর্বাদ ভিক্ষা করিলেন। তৎপরে পিতা পুত্রের

মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন—'ভগবান করুন, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। আমি নিজে ঈশ্বরলাভের নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করেছি, এমন কি, সংসারত্যাগের জন্যেও দু'একবার মনে মনে সঙ্কল্প করেছি; কিন্তু পরিণামে কিছুই হয়ে ওঠেনি। অতএব আজ সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করি,—আমি যেখানে অকৃতকার্য হয়েছি, তুমি সেখানে কৃতকার্য হও—সাক্ষাৎভাবে তুমি পরমেশ্বরের দর্শনলাভ কর।' পিতার নিকট হইতে এরূপ আশীর্বাদ ও উৎসাহলাভ অত্যল্প সাধকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। উহাতে বলীয়ান হইয়া তারকনাথ একান্তভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন।

বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ)—তারকনাথের আগমনের অল্পকাল মধ্যেই আসেন বাবুরাম ঘোষ। তাঁহার আসিবার পথ যেন পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। পরম ধার্মিক পিতামাতার গৃহে তিনি জন্মিয়াছিলেন (১৮৬১ ডিসেম্বর) এবং শৈশবাবধি তাঁহার চরিত্রে সাত্ত্বিকতার বিকাশ দেখা গিয়াছিল। তিন ভ্রাতার মধ্যে তিনি ছিলেন মধ্যম। তাঁহাদের একমাত্র ভগিনী কৃষ্ণভামিনীর বিবাহ হইয়াছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহীভক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের সহিত। বাবুরাম একটু বড় হইয়া কলিকাতায় পড়িতে আসেন এবং শ্যামপুকুরে অবস্থিত মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশনে ভর্তি হন। তখন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-প্রণেতা ৺মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। রাখালও ঐ স্কুলে পড়িতেন এবং বাবুরাম ছিলেন তাঁহার সহপাঠী। অতএব বাবুরামের চারিদিকেই মণিকাঞ্চন-যোগ ঘটিয়াছিল।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট বাবুরাম সর্বপ্রথমে শুনিয়াছিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরে এক মহাপুরুষ আছেন যিনি ঈশ্বরের নামেতেই ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়েন। শুনিয়া অবধি তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত বাবুরামের মনে আগ্রহের সীমা ছিল না। কলিকাতার কোনও এক হরিসভায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শনলাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তথায় ভাগবত শুনিতে আসিয়াছিলেন এবং ভাগবতের কথা শুনিতে শুনিতে পুনঃপুনঃ সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেছিলেন। ঐ দৃশ্য দেখিয়া বালক বাবুরামের চিত্ত অতিশয় মুগ্ধ হইল; কিন্তু সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে যাইবার কিংবা তাঁহার কথাবার্তা শুনিবার সুযোগ ঘটিল না। পরদিন রাখালের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়ে আরও অনেক কথা তিনি জানিতে পারিলেন; জানিয়া তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত আর যেন বিলম্ব সহ্য হইল

-না। পরবর্তী শনিবারে স্কুলের ছুটির পর রাখাল এবং রামদয়াল নামক অপর এক বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া বাবুরাম দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় রাত্রিযাপনের মনস্থ করিয়াই তাঁহারা গিয়াছিলেন। যখন পৌঁছিলেন, তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে এবং মন্দিরে কাঁসরঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে। চতুর্দিকের শোভা দেখিয়া বাবুরামের মনে হইল, তিনি যেন এক স্বপ্নরাজ্যে উপনীত হইয়াছেন। এক স্বর্গীয়ভাবে তাঁহার হৃদয়-মন আপ্লুত হইল।

তিন বন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকোষ্ঠে পৌঁছিয়া দেখিলেন তিনি ঘরে নাই। রাখাল কহিলেন, "তিনি কালীমন্দিরে গিয়ে থাকবেন। তোরা একটু বস্, আমি তাঁকে ডেকে আন্‌ছি।" এই কথা বলিয়া রাখাল মন্দিরের দিকে চলিয়া গেলেন। খানিক পরেই রাখালকে দেখা গেল শ্রীরামকৃষ্ণকে হাত ধরিয়া লইয়া আসিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে বিভোর, মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে পা' ফেলিতেছেন—মুখমণ্ডল দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত!

ঘরে পৌঁছিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তক্তপোশটির উপর কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন ও নবাগত বালকটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বাবুরামের বয়স তখন কুড়ি বৎসর, কিন্তু চেহারা খুব কচি ছিল বলিয়া বয়স আরও অনেক কম দেখাইত। রামদয়াল তাঁহার পরিচয় দিলে পর শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন—"ওঃ, তুমি বলরামের আত্মীয়, তা' হলে তো এখানকারও আত্মীয়।" কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর শ্রীরামকৃষ্ণ বাবুরামকে নিকটে আনিয়া প্রদীপের আলোকে তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিলেন এবং পরিশেষে তাঁহার হাতের তেলো নিজের হাতে লইয়া যেন ওজন পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "বেশ, বেশ, লক্ষণ খুব ভাল।"

রামদয়াল শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য প্রচুর মিষ্টান্ন এবং ফলমূল আনিয়াছিলেন; তিনি উহা হইতে যৎসামান্য গ্রহণপূর্বক অবশিষ্টাংশ ভক্তদের খাইতে দিলেন এবং নিদ্রার সময় হইলে পর জিজ্ঞাসা করিলেন, কে কোথায় শুইবেন। রাখাল ঘরের ভিতরে এবং রামদয়াল ও বাবুরাম বারান্দায় মেঝেতে শুইলেন।

তখন চৈত্র মাস; প্রচণ্ড গ্রীষ্ম। রামদয়াল ও বাবুরামের চোখে ঘুম লাগিতে না লাগিতেই প্রহরীদের চিৎকারে নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগিয়া দেখেন, ঠাকুর দিগম্বর অবস্থায় পরনের ধুতিখানি বগলে লইয়া সিংহের ন্যায় পদচারণ করিতেছেন—বাহ্যজগতের সম্পর্কে কোনই হুঁশ নাই। তাঁহাদের দুইজনের

নিকটে আসিয়া কহিলেন, 'ওগো! তোমরা কি ঘুমুচ্ছ?' রামদয়ালের উত্তরে যখন বুঝিলেন যে তাঁহারা নিদ্রিত নহেন, তখন তিনি বলিলেন, "তা' হলে নরেন্দরকে অবশ্যি আসতে বলো। নরেনের জন্যে মনটাকে যেন গামছা নিংড়াচ্ছে—ঠিক এ'রকম।" বলিয়া নিজের বস্ত্রাঞ্চল নিংড়াইয়া দেখাইলেন। আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা অন্তর বারংবার তাঁহাদের নিকটে আসিয়া ঐরূপ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগকে ঘুমাইতে দিলেন না। সারারাত্রি ঐভাবে কাটিল। বাবুরাম মনে মনে ভাবিলেন যে, নরেনের প্রতি ঠাকুরের কি অদ্ভুত ভালবাসা! আর নরেন নিশ্চয়ই খুব নিষ্ঠুর, তাহা না হইলে কি করিয়া এমন ভালবাসা অগ্রাহ্য করিয়া দূরে সরিয়া থাকিতে পারেন?

পরদিন সকালে হাতমুখ ধুইবার পর বাবুরাম যখন বিদায় লইতে গেলেন, তখন দেখিতে পাইলেন যে, ঠাকুরের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। রাত্রিতে ভাবের যে আবেশ তাঁহাতে দেখিয়াছিলেন, উহার চিহ্নমাত্র এখন নাই। বিদায়গ্রহণকালে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন ঘন ঘন আসিবার জন্য।

ক্রমে নরেন্দ্রাদি ভক্তগণের সহিত বাবুরামের পরিচয় হইল এবং সাধনপথে অতি দ্রুত তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। স্কুলের লেখাপড়ায় তাঁহার আর মন বসিল না। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে অথবা তৎপরবর্তী বৎসরে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু পাস করিতে পারেন নাই। ঠাকুর উহা শুনিতে পাইয়া কহিলেন, 'ভালই হয়েছে, পাস না করাতে সংসারের পাশ কেটে গেল।' বাবুরামের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিবার নিমিত্ত একদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি গো! তোমার পুঁথিপত্র কোথায়? পড়াশুনা কি আর করবে না?' মাষ্টার মহাশয়ও (৺মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) তখন উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "এ দুদিক্ রাখতে চায়; তা' কি সহজ? একটুখানি জ্ঞানে কি হবে? ভেবে দেখ, অমন যে জ্ঞানী বশিষ্ঠ, তিনি পর্যন্ত পুত্রশোকে কাতর হয়ে পড়লেন। লক্ষ্মণ তো দেখে অবাক! তিনি রামকে বললেন, দাদা! একি হল? রাম তখন জবাব দিলেন—আশ্চর্য হবার কিছু নেই। জ্ঞান থাকলেই অজ্ঞানও থাকবে। দুয়েরই পারে যেতে হবে।" বাবুরাম তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, 'আমি তো ঠিক তাই চাই।' তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন—"কিন্তু দুটোই আঁকড়ে থাকলে তা কি করে হতে পারে? জ্ঞান-অজ্ঞানের

পারে যেতে হলে কোনটারই প্রতি মমতা থাকলে চলবে না, দুটোই ছাড়তে হবে। যদি সেই ইচ্ছেই থাকে, তবে সব ছেড়ে-ছুঁড়ে এখানে চলে এস।" বাবুরাম মৃদু হাসিয়া কহিলেন, 'আমাকে টেনে নিয়ে আসুন।' ঠাকুরের তো মনে মনে সম্পূর্ণ ইচ্ছা বাবুরাম সংসার ছাড়িয়া চলিয়া আসেন, কিন্তু বাহিরে এই প্রসঙ্গ চাপা দিবার নিমিত্ত কহিলেন, "তোমার সাহসের অভাব। এই দেখ না ছোট নরেন কেমন জোর করে বলে—আমি এখানেই থাকব, কিছুতেই যাব না।"

উপরিবর্ণিত কথাবার্তার অল্প কয়েকদিন পরে বাবুরামের মাতাঠাকুরানী শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিলে পর তিনি তাঁহাকে বলিলেন, 'তোমার ছেলেটিকে আমায় দিয়ে দাও। ও এখানেই থাকুক।' বাবুরামের জননী সাধারণ রমণী ছিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়া কহিলেন যে, তাঁহার শুধু একটি প্রার্থনা আছে। তাহা এই যে, আমরণ তাঁহার যেন ভগবানে মতি থাকে এবং সন্তান হারাইয়া তাঁহাকে যেন শোক ভোগ করিতে না হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় তাঁহার এই উভয় বাসনা চরিতার্থ হইয়াছিল। জননীর অনুমতি পাইয়া বাবুরাম অবিলম্বে সংসারত্যাগপূর্বক চিরতরে প্রভুর সকাশে চলিয়া আসিলেন। বাবুরামের আধ্যাত্মিক ভাব এমনি উচ্চস্তরের ছিল যে, ঠাকুর তাঁহাকে আপন 'দরদী' অর্থাৎ 'হৃদয়ের বন্ধু' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

বাবুরামের 'প্রেমানন্দ' নামকরণ সার্থক হইয়াছিল ; কারণ তাঁহার হৃদয় ছিল প্রেমের অফুরন্ত নির্ঝর। যে-কেহ তাঁহার সংস্রবে আসিত, সেই তাঁহার অযাচিত ও অপরিসীম ভালবাসায় মুগ্ধ হইত। কিন্তু এহেন প্রেমানন্দ স্বামী বলিয়াছিলেন—'আমরা কি আর ভালবাসতে জানি ? কতটুকুই বা আমাদের ভালবাসা ? ঠাকুরের নিকট আমরা যে ভালবাসা পেয়েছি, তার তুলনায় এ অতি অকিঞ্চিৎকর।' এই উক্তি হইতে একটুখানি আমরা আভাস পাই—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন প্রেমের কি অনন্ত পারাবার !

নিরঞ্জন (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ)—নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ নামক জনৈক যুবক কলিকাতায় মাতুলের বাটীতে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতেন। একদল প্রেত-তত্ত্বালোচনাকারীদের পাল্লায় পড়িয়া তিনি তাহাদের 'মিডিয়ম' সাজিয়াছিলেন। উহারা তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন করিয়া তাঁহার দেহে ভূত ডাকিয়া আনিত। পরলোকগত আত্মার বিষয়ক জ্ঞানলাভের নিমিত্ত নিরঞ্জনের মনে খুবই আগ্রহ

ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনিয়া এবং তাঁহার নিকটে কিছু নূতন আলোকের সন্ধান পাইবেন মনে করিয়া তিনি একদা দক্ষিণেশ্বরে গিয়া হাজির হইলেন। তখন অপরাহ্ণকাল; একঘর লোক নিবিষ্টভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনিতেছেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিলে আগন্তুকেরা একে একে বিদায় লইবার পর নিরঞ্জনকে কাছে ডাকিয়া তিনি তাঁহার সবিশেষ পরিচয়-গ্রহণপূর্বক যেন তাঁহার মানসিক অবস্থা যোগবলে উপলব্ধি করিয়াই বলিলেন—"যদি কেউ সারাক্ষণ ভূতের ভাবনা করে, তবে সে ভূতই হয়ে যায়, আর যদি ঈশ্বরের ভাবনা করে তবে ঈশ্বরত্ব পায়। আচ্ছা—এ' দু'য়ের মধ্যে কোন্‌টি তোমার পছন্দ হয়?" নিরঞ্জন ইতস্ততঃ না করিয়া উত্তর দিলেন, 'ঈশ্বরলাভই নিঃসন্দেহে শ্রেয়। আমি উহাই চাই।' এই উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ খুব প্রীত হইয়া কহিলেন—"তা' হলে ভূতুড়েদের সঙ্গ এক্ষণি ছাড়, আর আজ রাত্রিতে এখানেই থাক।" যেহেতু বাড়ীতে জানাইয়া আসেন নাই, অতএব নিরঞ্জনের পক্ষে এই শেষোক্ত আদেশ পালন করা সম্ভবপর হইল না।

দু'তিন দিন পরে নিরঞ্জন দ্বিতীয়বার আসিবামাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে সস্নেহে জড়াইয়া ধরিয়া করুণামাখা স্বরে বৈরাগ্যের উপদেশ দিতে লাগিলেন। মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী, সময় দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে; অতএব ঈশ্বরলাভ করিতে হইলে এই ক্ষণেই উঠিয়া-পড়িয়া লাগিতে হইবে; আলস্য করিলে সিদ্ধিলাভ হয় না। নিরঞ্জনের সেইদিন আর বাটীতে ফিরিয়া যাওয়া হইল না। একাদিক্রমে তিন দিন দক্ষিণেশ্বরে কাটাইয়া তিনি বাটী ফিরিলে পর তাঁহার মাতুল অত্যন্ত ক্রোধ ও বিরক্তি প্রকাশপূর্বক তথায় যাওয়া নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু নিরঞ্জনের উহাতে নিরতিশয় মনঃকষ্ট হইতেছে বুঝিতে পারিয়া তাঁহার চিত্ত অবশেষে দ্রবীভূত হইল এবং নিরঞ্জন আবার ঠাকুরের নিকট যাইবার অনুমতি পাইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জনের মন বৈরাগ্যের রঙে ছোপাইয়া দিয়াছিলেন। অভিভাবক এবং আত্মীয়স্বজন শত চেষ্টায়ও আর তাঁহাকে সংসারী সাজাইতে পারিলেন না।

একবার অনেকদিন নিরঞ্জন দক্ষিণেশ্বরে আসেন নাই। তাঁহার কোন খোঁজ-খবর না পাওয়াতে শ্রীরামকৃষ্ণের মনে দারুণ উৎকণ্ঠা জন্মিল। অবশেষে একজন কেহ তাঁহাকে জানাইল যে, নিরঞ্জন চাকরি লইয়াছেন। একথা শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ চমকাইয়া উঠিয়া কহিলেন—"বল কি? সে মরে গিয়েছে

শুনলেও আমার প্রাণে এত কষ্ট হ'ত না।" ইহার কিছুদিন পরে নিরঞ্জন আসিলে পর তাঁহার মুখে যখন শুনিলেন যে, তিনি মায়ের সেবার জন্য চাকরি লইয়াছেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "ও, তাই বল্। তা'হলে কোন অন্যায় করিস্‌নি। মায়ের জন্য চাকরি করতে দোষ নেই। কিন্তু যদি নিজের জন্য করতিস্, তবে তোর মুখ দেখতে পারতুম না। বস্তুতঃ তুই কি ওরূপ কাজ কখনো করতে পারিস্? আমি জানি, আমার নিরঞ্জনে এতটুকু অঞ্জন নেই।" শ্রীরামকৃষ্ণকে ঐরূপ বলিতে শুনিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! চাকরির তো খুব নিন্দা করলেন, কিন্তু রোজগার না করলে পরিবার প্রতিপালন হয় কি করে?" ঠাকুর তখনি প্রত্যুত্তর দিলেন—"আমি সবার কথা বলছি না। যার ইচ্ছা হয় সে করুক না? রোজগার না করার কথা আমি শুধু এই ছোকরা-ভক্তদের বল্‌ছি। এদের আলাদা থাক।" নিরঞ্জনকে অধিকদিন চাকরি করিতে হয় নাই। মাতার পরলোকগমনের পরেই তিনি সম্পূর্ণরূপে সংসার ছাড়িয়া শ্রীগুরুসকাশে চলিয়া আসেন।

যোগীন্দ্রনাথ (স্বামী যোগানন্দ)—দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পার্শ্ববর্তী গ্রামে ধনী এবং সম্ভ্রান্ত চৌধুরীবংশে যোগীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যোগীনের যখন শৈশব, তখনও পর্যন্ত চৌধুরী পরিবারের ধনসমৃদ্ধি যথেষ্টই ছিল, পূজা-পার্বণ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত এবং পুরাণ-পাঠ, নামসংকীর্তন ইত্যাদিতে গৃহ মুখরিত থাকিত। সাধনকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হরিকথা শুনিতে চৌধুরীদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে যাইতেন এবং পরিবারের কর্তাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যোগীনের কৈশোর অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই চৌধুরী পরিবারে ভাঙ্গন ধরে। বিত্তশালী বৃহৎ পরিবার যখন ভাঙ্গিতে শুরু করে, তখন তাহাতে স্বভাবতঃই নানারূপ বিশৃঙ্খলা, ক্ষুদ্রতা ও অশান্তির ভাব দেখা দেয় এবং পারিবারিক জীবনকে বিষময় করিয়া তোলে। যোগীন্দ্রনাথ কিশোর বয়স হইতেই তৎসমুদয় অপ্রীতিকর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সংসারের কোন আবিলতা তাঁহার নিজের চিত্তকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই। শৈশবাবধি তাঁহার ঝোঁক ছিল ধর্মের দিকে। যোগীন স্থির-ধীর ছিলেন, এবং পূজা-সন্ধ্যা করিতে তিনি খুব ভালবাসিতেন।

যোগীন্দ্রনাথ

যোগীনকে তাঁহার পিতা মিশনারী স্কুলে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু পাঠ্যপুস্তক অপেক্ষা ধর্মপুস্তকেই যোগীনের অধিকতর মনোযোগ দেখা যাইত। বালক যোগীন মাঝে মাঝে রাসমণির বাগানে বেড়াইতে যাইতেন, সেখানেই যৌবনের প্রারম্ভে তিনি প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভ করেন (১৮৮২)। পাড়ার লোকেরা শ্রীরামকৃষ্ণকে 'পাগলা বামুন' বলিয়া ঠাট্টা করিত ; যোগীনের পিতামাতাও শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না। একদিন বিকালে যোগীন বাগানে গিয়াছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে, কালীবাড়ীর কোণের ঘরটিতে অনেক লোক একত্র হইয়াছে ও মন্ত্রমুগ্ধবৎ এক ব্যক্তির কথা শুনিতেছে। নিকটে গিয়া যোগীন অনুমানে ধরিয়া লইলেন, যাঁহাকে লোকে বলে 'পাগলা বামুন', এ ব্যক্তি তিনিই হইবেন। বক্তার সহজ, সরল কথাগুলি বালকের নিকটেও অনায়াসে বোধগম্য হইল,—বালকের মনে সেগুলি একেবারে মুদ্রিত হইয়া গেল। যোগীনের বদ্ধমূল ধারণা জন্মিল—যে ব্যক্তি এরূপ সহজ প্রাণস্পর্শী ভাষায় ঈশ্বরতত্ত্ব ব্যাখ্যান করিতে পারেন, তিনি কখনই পাগল নহেন, নিশ্চয়ই মহাপুরুষ।

পরদিন যোগীন্দ্রনাথ সরাসরি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে খুব সমাদর করিলেন, বলিলেন--তিনি তাঁহাদের বাড়ীর লোকদের চিনেন, পুরাণপাঠ শুনিবার জন্য কতবার সেখানে গিয়াছেন। যুবকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "তোমার এমন মহৎ বংশে জন্ম, আর শরীরে যোগীর লক্ষণ সব রয়েছে। অল্প চেষ্টাতেই তুমি যোগের পথে এগুতে পারবে।" এরূপ স্নেহপূর্ণ ও উৎসাহসূচক বাক্যে বালক যোগীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি খুবই আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন।

যোগীন্দ্রনাথ জানিতেন যে, তাঁহার বাড়ীর লোকেরা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করেন না। অতএব ঠাকুরের নিকট নিজের যাতায়াতের কথা তিনি বাড়ীতে কাহারও নিকট ব্যক্ত করিলেন না। ফুল তুলিবার অছিলায় তিনি রাসমণির বাগানে যাইতেন এবং ঠাকুরের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন। ক্রমে তাঁহার মনে বিবেকবৈরাগ্যের ভাব প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল ; কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং বিবাহ করিবেন না বলিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। মায়ের উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাঁহাকে

পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল। বিবাহের পরমুহূর্তেই কিন্তু তাঁহার মন দারুণ অনুতাপ ও অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিল। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট কি করিয়া মুখ দেখাইবেন, এই ভাবিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ বোধ করিতে লাগিলেন। মনে মনে ঠিক করিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আর কখনও যাইবেন না।

কিছুদিন কাটিয়া গেল,—কালীবাড়ীতে যোগীন আর আসেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ যোগীনের বিবাহের কথা শুনিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। আসিবার জন্য যোগীনের নিকট বারংবার খবর পাঠাইলেন, কিন্তু তাহাতে কোনই কাজ হইল না। তখন তিনি যোগীনের এক বন্ধুকে ডাকিয়া কহিলেন—"তোমাদের যোগীন কেমন লোক হে! অনেকদিন আগে তাকে ক'টি টাকা দিয়েছিলুম, কিছু জিনিসপত্র কিনে দেবার জন্যে। সেই টাকার কোন হিসাব সে আজ পর্যন্ত দিলে না,—এসে একটিবার দেখাও করলে না। তাকে তুমি এই কথাটি একবার জিজ্ঞেস করো তো!" বন্ধুটি যোগীনকে যখন ইহা জানাইলেন, তখন যোগীনের মনে খুব অভিমান হইল। তিনি মনে মনে কহিলেন,—"আধ্যাত্মিক উন্নতির আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছি, কিন্তু তা' বলে আমি পয়সাকড়ির ব্যাপারেও অসাধু হয়েছি না কি? তিনি কি ভাবেন যে হিসাব না দিবার জন্যই আমি তাঁর নিকট যাই না? আজই গিয়ে খরচের হিসাবপত্র এবং উদ্বৃত্ত পয়সাগুলি দিয়ে আসব।" এরূপ মনঃস্থ করিয়া বিকালবেলা যোগীন রাসমণির বাগানের দিকে অগ্রসর হইলেন। যাইতে যাইতে তাঁহার মনের ভিতর কেবলই অনুশোচনা হইতে লাগিল, বিবাহ করিয়া কি মারাত্মক ভুলই জীবনে করিয়াছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ যে-ঘরে থাকিতেন, তাহার বারান্দায় উঠিয়া যোগীন দেখিলেন যে, ধুতিখানি কোলের উপর রাখিয়া ঠাকুর তাঁহার তক্তপোশটির উপর বসিয়া রহিয়াছেন। যোগীনকে দেখিয়াই ধুতিখানি বগলে করিয়া ঠিক বালকের ন্যায় বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন। যোগীনের হাত ধরিয়া তাহাকে ভিতরে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন ও কহিলেন,—"বিয়ে করেছিস্, তাতে হয়েছে কি? আমিও কি বিয়ে করিনি? এতে ভয় পাবার কি আছে? এখানকার (নিজের বুকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) কৃপা থাকলে, লক্ষবার বিবাহেও কিছুই যাবে আসবে না। যদি সংসারেই থাকতে চাস্ তো বৌকে

একদিন এখানে নিয়ে আয়, তার মন এমনভাবে ফিরিয়ে দেব যে, তোর সাধনপথে সে আর কোন বাধা জন্মাবে না, বরঞ্চ সাহায্য করবে। আর যদি গৃহস্থজীবনে অনিচ্ছা থাকে, তবে বল্ আমি তোর বাসনারাশি একেবারে ভস্মসাৎ করে দিচ্ছি।" ঠাকুরের মুখের ভাব ও কথাগুলি হইতে যেন অগ্নি নিঃসৃত হইতেছিল। যোগীন বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন। এত প্রেম, এত করুণা—এও কি সম্ভব? তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে খোঁচা দিয়া নিকটে আনিবার উদ্দেশ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ হিসাবপত্র ও পয়সার কথা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু পয়সাগুলি ফেরত দিবার কথা তিনি নিজেই পাড়িলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে কহিলেন, "ঐ ভাঙ্গা বাক্সটিতে রেখে দে।" যোগীনের মনের উপরে ভয় ও নৈরাশ্যের যে কালো ছায়া বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা মুহূর্তে সরিয়া গেল।

এই ঘটনার পর হইতে সংসারের প্রতি যোগীনের ঔদাসীন্য দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাওয়াতে তাঁহার পিতামাতা বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। একদা তাঁহার জননী ভর্ৎসনার স্বরে তাঁহাকে কহিলেন, "যোগীন, তুই যদি রোজগারই না করবি, তবে বিয়ে করলি কেন?" যোগীন উত্তর করিলেন, "মা, তুমি ত জান, বিয়েতে আমার ইচ্ছা ছিল না, শুধু তোমার কথায় এবং তোমার চোখে জল দেখেই করতে বাধ্য হয়েছিলাম।" জননী তখন বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "বটে! যদি তোর নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল, তবে কি শুধু আমার কথায় বিয়ে করেছিলি?" শেষে মায়ের মুখেও এই কথা! যোগীনের চমক ভাঙ্গিল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণই একমাত্র ব্যক্তি যাঁর মন-মুখ এক। তিনি ভিন্ন এমন নির্ভরযোগ্য আশ্রয় এই সংসারে আর কেহই নাই।" সেদিন হইতেই যোগীনের পারিবারিক সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হইয়া গেল; তিনি একান্তভাবে প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন।

হরিনাথ (স্বামী তুরীয়ানন্দ)—হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন কলিকাতা বাগবাজারের বোসপাড়ার বাসিন্দা। তাঁহার পিতা ৺চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অতিশয় নিষ্ঠাবান্ এবং তেজস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ওয়াটসন কোম্পানির গুদাম-সরকারের কাজ করিতেন। হরিনাথ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হওয়াতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই তাঁহাকে লালনপালন করিয়াছিলেন। ছেলেবেলা হইতেই ধর্মের প্রতি তাঁহার এরূপ প্রবল অনুরাগ

ছিল যে, আত্মীয়স্বজন তাহা দেখিয়া অবাক্ হইতেন। বালক হরিনাথ তিনবেলা গঙ্গাস্নান করিতেন, এবং নিজ হাতে প্রস্তুত হবিষ্যান্ন দেবতাকে নিবেদনপূর্বক তৎপরে প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। সমগ্র গীতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল এবং প্রত্যূষে গীতার আবৃত্তি ছিল তাঁহার নিত্যকর্ম। হরিনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার এই ধর্মকর্মে কখনও বাধা দিতেন না। আত্মীয়স্বজন কেহ অনুযোগ করিলে বলিতেন—'কেন, তোমার-আমার যা' করা উচিত, হরিনাথ কি তা'ই করছে না?'

শ্রীরামকৃষ্ণ একদা বাগবাজারে দীননাথ বসুর বাড়ীতে গমন করিলে পর তথায় হরিনাথ তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। পরবর্তী কালে একটি পত্রে এই দর্শনের বিষয় তিনি এভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—"আমি বাগবাজারে শ্রীযুক্ত দীননাথ বসুর বাটীতে প্রথমে ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলাম। সে বহুদিনের কথা, তখন অধিকাংশ সময় তিনি সমাধিস্থই থাকিতেন। সবে কেশব বাবুর সহিত ঠাকুরের পরিচয় হইয়াছে। দীননাথ বসুর ভ্রাতা কালীনাথ বসু—কেশববাবুর অনুচর,—ঠাকুরকে দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং আপনার জ্যেষ্ঠকে অনুরোধ করিয়া ঠাকুরকে তাঁহার গৃহে আবাহন করেন। আমরা তখন বালক, তের-চৌদ্দ বৎসরের হইব। পরমহংস আসিবেন, এই কথা পল্লীতে রাষ্ট্র হইলে দর্শনার্থ আমরা তথায় সমবেত হইয়াছিলাম। দেখিলাম, একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে করিয়া দুইটি পুরুষ দ্বারে উপস্থিত হইলে সকলেই 'পরমহংস আসিয়াছেন' বলিয়া সেইদিকে আকৃষ্ট হইল। প্রথমে একজন অবতরণ করিলেন, বেশ হৃষ্টপুষ্ট বপু, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, দক্ষিণ হস্তের বাহুতে সুবর্ণপদক, এবং দেখিলেই খুব বলশালী ও কর্মক্ষম বলিয়া মনে হয়। তিনি নামিয়া আরেক জনকে গাড়ী হইতে নামাইতে লাগিলেন। ইনি দেখিতে অত্যন্ত কৃশ। গায়ে একটি পিরান, পরিহিত বস্ত্র কোমরে বাঁধা, এক পা গাড়ীর পাদানে ও অন্য পা গাড়ীর মধ্যে রহিয়াছে। একেবারে সংজ্ঞাহীন, বোধ হইতেছে যেন মহা মাতালকে ধরিয়া নামাইতেছে। যখন নামিলেন, দেখিলাম কি অপূর্ব জ্যোতি মুখমণ্ডলে বিরাজ করিতেছে! মনে হইল শাস্ত্রে যে শুকদেবের কথা শুনিয়াছি, ইনি কি সেই শুকদেব! ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে উপরে লইয়া যাইলে কিঞ্চিৎ সংজ্ঞা পাইয়া দেয়ালে বৃহৎ কালীমূর্তি দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন ও একটি মনোমুগ্ধকর সংগীতে

উপস্থিত সকলের মনে এক অপূর্ব ভক্তিভাব ও সমন্বয়ের স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিলেন। গানটি কালীকৃষ্ণের একত্বসূচক—

যশোদা নাচাত তোরে বলে নীলমণি
সে বেশ লুকালি কোথা করালবদনি [গো মা !]

ইহার দ্বারা লোকের মনে কি যে এক অপূর্ব ভাবের উদয় হইল, তাহা বর্ণনাতীত। তারপর অনেক পরমার্থপ্রসঙ্গ হইয়াছিল। তিনি আরও একবার দীননাথ বসুর বাড়ীতে আসিয়াছিলেন।"

উপর্যুক্ত দর্শনের দু'তিন বৎসর পরে (১৮৭৮ কিংবা ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে) হরিনাথ দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুরের সহিত আলাপ-পরিচয় করেন এবং অত্যল্প কালমধ্যেই তাঁহার অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন।

শাস্ত্রালোচনায় হরিনাথের গভীর অনুরাগ ছিল। কোন কোন সময়ে তিনি পড়াশুনায় এমনভাবে নিমগ্ন হইতেন যে, একাদিক্রমে অনেক দিন পর্যন্ত হয়তো দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া হইয়া উঠিত না। তখন ঠাকুর অস্থির হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। এইরূপে একবার ডাকাইয়া আনিবার পর সম্ভবতঃ হরিনাথের অত্যধিক শাস্ত্রানুরাগ দমন করিবার জন্যই কহিলেন— "কি রে, আজকাল যে এখানে বড় আসিস্ না ? সবাই বলে কেবলি না কি বেদান্ত পড়ছিস্। এটা খুব ভাল। কিন্তু বেদান্তে অত পড়বার আছে কি ? 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'—এই ত বেদান্তের শিক্ষা, না আরও কিছু আছে ? যদি এইটিই একমাত্র শিক্ষা হয়, তবে অত পড়াশুনা না করে—অসৎ বস্তু ছেড়ে সৎ বস্তুকে আশ্রয় করলেই ত হয়।" একথা শুনিয়া হরিনাথের চোখের আবরণ ঘুচিল। সদসৎ-বিচারে এবং জগতের মিথ্যাত্ব উপলব্ধির বিষয়ে তিনি অধিকতর মনোযোগী হইলেন। এই চেষ্টার ফলে দেখিতে পাইলেন যে, 'জগৎ মিথ্যা' একথা মুখে বলা সহজ; কিন্তু প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা খুবই কঠিন।

অল্পকাল পরেই পরমহংসদেব একদিন বলরাম বসুর বাটীতে আসিয়াছেন এবং ভক্তেরাও আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। হরিনাথকে অনুপস্থিত দেখিয়া তিনি তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। হরিনাথ যখন আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন যে, ঠাকুর ঈশ্বর-কৃপা সম্পর্কে ব্যাখ্যান করিতেছেন; তাঁহার মনের ভিতরে যে সংগ্রাম চলিতেছিল, ঠিক যেন তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়াই ঠাকুর বলিতেছেন, "যতই বেদ-বেদান্ত পড়, যতই সাধন-ভজন কর, ঈশ্বরের

কৃপা ব্যতীত সত্যিকার জ্ঞানলাভ কিছুতেই হবার নয়।" এইপ্রকার উপদেশ দিতে দিতে ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া ঠাকুর গান ধরিলেন—

ওরে কুশীলব, করিস্ কিসের গৌরব
ধরা না দিলে কি পারিস্ ধরিতে—ইত্যাদি।

যখন কুশীলব মহাবীরকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া হাত-পা বাঁধিয়াছিলেন, তখন মহাবীর এই উক্তি করিয়াছিলেন। গান গাহিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের নেত্রযুগল হইতে প্রেমাশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। হরিনাথের হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল,—তিনিও কাঁদিয়া আকুল হইলেন। কঠোপনিষদের সেই শ্লোক তাঁহার মনে পড়িয়া গেল—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।" বেদান্তমতেও পরমাত্মার কৃপা ভিন্ন গতি নাই! গুরু-শিষ্যের প্রাণের মিলন ঘটিল। হরিনাথ সংসার ছাড়িয়া একান্তভাবে প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন।

শরচ্চন্দ্র (স্বামী সারদানন্দ)—১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণসকাশে একসঙ্গে আসেন শরচ্চন্দ্র ও শশিভূষণ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ)। পারিবারিকসূত্রে তাঁহারা ছিলেন খুব ঘনিষ্ঠ,—খুড়্তুতো-জ্যেঠতুতো ভাই। তাঁহাদের আদি নিবাস ছিল হুগলী জেলার ময়াল-ইছাপুর গ্রামে। শরচ্চন্দ্রের পিতা ৺গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী কলিকাতায় আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে এক ঔষধের দোকানের অংশীদাররূপে প্রভূত অর্থোপার্জন করিয়া ওখানকারই বাসিন্দা হইয়া পড়েন। গিরিশচন্দ্র ও তাঁহার পত্নী উভয়েই অতিশয় ধর্মপরায়ণ এবং আচারনিষ্ঠ ছিলেন।

শিশুকাল হইতেই শরচ্চন্দ্রের স্বভাব শান্তমধুর ও স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। ক্লাশের পরীক্ষায় তিনি সর্বদা উচ্চস্থান অধিকার করিতেন। তাঁহার হৃদয় ছিল বড়ই কোমল ও দয়ার্দ্র। পরের দুঃখ দেখিলে তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না, সাহায্যদানের নিমিত্ত ছুটিয়া যাইতেন।

শশিভূষণ ছিলেন শরচ্চন্দ্র অপেক্ষা বয়সে প্রায় আড়াই বৎসরের বড়। গ্রামের স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করিয়া ইংরেজী শিক্ষার নিমিত্ত তিনি কলিকাতায় পিতৃব্য গিরিশচন্দ্রের বাটীতে চলিয়া আসেন এবং শরচ্চন্দ্রের সহিত একসঙ্গে প্রতিপালিত হন। শশীর পিতা ৺ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধ ছিলেন। পিতামাতার নিকট হইতে শশিভূষণ সাত্ত্বিক স্বভাব, সুন্দর

দেহকান্তি ও অদম্য জ্ঞানস্পৃহা প্রাপ্ত হন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা কৃতিত্বের সহিত পাস করিয়া তিনি বৃত্তি পাইয়াছিলেন এবং কলেজের ছাত্রাবস্থায় কিছুদিন কেশবচন্দ্রের পরিবারে গৃহশিক্ষকতাও করিয়াছিলেন।

হেয়ার স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাস করিয়া শরৎ সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। তৎপূর্বেই তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেছিলেন। মিশনারী কলেজে ভর্তি হইয়া তিনি উহার অধ্যক্ষ ফাদার লাফঁর নিকটে অভিনিবেশ-সহকারে বাইবেল অধ্যয়ন করেন। কিন্তু একদিকে ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা, অপর দিকে খ্রীষ্টধর্মের ব্যাখ্যান—কোনটাই শরচ্চন্দ্রকে মুহূর্তের জন্যও নিজের আবাল্যসঞ্চিত ধর্মবিশ্বাস ও সদাচার হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই।

কেশবচন্দ্রের সমাজে পরমহংসদেবের কথা শুনিয়া শরৎ এবং শশীর মনে তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রবল আগ্রহ জন্মে। তাহার ফলে উভয়ে একদিন অপরাহ্ণে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া উপস্থিত হন (অক্টোবর, ১৮৮৩)। কেশবের সমাজে যাতায়াত আছে জানিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাদিগকে সমাদরপূর্বক বসাইলেন এবং শশীকে প্রশ্ন করিলেন—"তুমি সাকার ভালবাস, না নিরাকার ?" শশী কহিলেন, "মহাশয়! ঈশ্বর আছেন কি না তাই জানি না,—তা আবার সাকার, নিরাকার!" এই সরল উক্তিতে ঠাকুর খুব সন্তুষ্ট হইলেন। ঘরে আরও অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন এবং বাল্যবিবাহের প্রসঙ্গ উঠিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন—"ইট কাঁচা থাকতেই ছাপ দিতে হয়; পোড়া ইটে ছাপ দেওয়া যায় না। আজকাল মা-বাপ কম বয়সেই ছেলেদের বিয়ে দেয়—পড়াশুনা শেষ না হতেই তারা বাপ হয়ে বসে, আর চাকরির জন্য ছুটাছুটি করে। এটা ভাল নয়।"

জনৈক শ্রোতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, বিয়ে করাটা কি তাহলে অন্যায়? বিবাহ কি ঈশ্বরের ইচ্ছা-বিরুদ্ধ কাজ?" ঘরের দেয়ালে তাকের উপর একখানি বাইবেল রাখা ছিল এবং বইয়ের একটি পাতা চিহ্নিত করা ছিল। সম্ভবতঃ কোন ভক্ত ঠাকুরকে বাইবেলের অংশবিশেষ পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন এবং যে জায়গাটি ঠাকুরের ভাল লাগিয়াছিল, তাহা তিনি চিহ্নিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। বইখানি নামাইয়া চিহ্নিত অংশটি পড়িবার জন্য তিনি বলিলেন। উহাতে যীশুর একটি উক্তি ছিল, যাহার মর্মার্থ এইরূপ : "তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি দারপরিগ্রহ করি নি। যারা অবিবাহিত কিংবা বিধবা,

তাদের আমি বল্‌ছি যে বিবাহ না করাই ভাল। কিন্তু তারা যদি ব্রহ্মচর্য-পালনে অসমর্থ হয়, তবে বিবাহ করাই উচিত ; কারণ, বাসনার আগুনে পুড়ে মরার চেয়ে দাম্পত্যজীবন শতগুণে শ্রেয়।” পড়া শেষ হইলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন যে, বিবাহই সর্বপ্রকার বন্ধনের মূল। অমনি জনৈক শ্রোতা আপত্তি তুলিয়া কহিলেন—“মহাশয়, আপনি কি বলতে চান যে, বিবাহ ঈশ্বরের বিধান-বহির্ভূত ? যদি তাই হয়, তবে সৃষ্টি কেমন করে রক্ষা হবে ?” ঠাকুর হাসিয়া উত্তর দিলেন—“তার ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। যারা বিয়ে করতে চায়, তারা করবে বই কি ? ও আমাদের মধ্যে একটা কথা হয়ে গেল। আমার যা’ বলবার আমি বলেছি, তুমি ন্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়ে যেটুকু নেবার নাও।”

ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত তীব্র বৈরাগ্যের উপদেশ ও তাঁহার সপ্রেম ব্যবহার শরৎ এবং শশী উভয়কেই মুগ্ধ করিল। সেদিন অন্যান্য লোকজন উপস্থিত থাকাতে অন্তরঙ্গভাবে কথাবার্তা হইতে পারিল না। আর একদিন আসিতে বলিয়া ঠাকুর তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। ইহার পর হইতে শরৎ এবং শশীর ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু হইল। দুজনের কলেজ একদিনে ছুটি না থাকার দরুন হউক, কিংবা অপর যে-কোন কারণেই হউক—দুজনের একসঙ্গে যাওয়া বড় একটা হইয়া উঠিত না। যেদিন যাঁহার সুবিধা হইত, একাকী চলিয়া যাইতেন। প্রতি বৃহস্পতিবারে সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজের ছুটি থাকাতে শরৎ প্রায়শঃ ঐদিনে যাইতেন এবং মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরেই রাত্রিযাপন করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে সাধন-ভজনের প্রণালী শিখাইয়া দিয়া দ্রুত ঐ পথে অগ্রসর করিয়া দিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের অন্যান্য যুবক ভক্তদের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইতে লাগিল ;—বিশেষতঃ, নরেনের তিনি গুণমুগ্ধ ও অতিশয় প্রিয়পাত্র হইলেন। দুজনের মধ্যে খুবই হৃদ্যতা জন্মিল।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শরৎ এফ.এ. পরীক্ষা পাস করিয়া মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু পড়াশুনায় বেশীদিন মন টিকিল না। সব ছাড়িয়া শ্রীগুরুর সেবায় তিনি দেহ-মন সমর্পণ করিলেন। তাঁহার পিতা অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইতে সমর্থ হইলেন না।

শশিভূষণ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ)—শশিভূষণের পরিচয় ও তাঁহার দক্ষিণেশ্বর-গমনের বিবরণ পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে। ঠাকুরের

সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারেই শশীর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, যে বস্তু পাইবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল, তাহা এখানেই পাইবেন। ছুটির দিনে তিনি প্রায়ই একাকী দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া যাইতেন; ঠাকুরও পরম স্নেহে তাঁহাকে কাছে রাখিতেন। ঠাকুরের কথামৃত পান করিবার ফলে শশীর মনে যা-কিছু দ্বিধা-সংশয় ছিল, তাহা ক্রমশঃ দূরীভূত হইতে লাগিল। তিনি বলিতেন যে, অনেক সময়েই তাঁহার পক্ষে কোন প্রশ্ন করিবার আবশ্যক হইত না। ঠাকুরের ঘরে যাইয়া দেখিতেন যে, হয়তো ঘরভর্তি লোক এবং তিনি ভগবৎ-প্রসঙ্গে মাতোয়ারা। শশীকে কুশল-প্রশ্ন করিয়া এবং বসিতে বলিয়াই আবার তিনি ঈশ্বরীয় কথায় নিমগ্ন হইতেন;—আর নির্বাক্ বিস্ময়ে শশী শুনিতেন যে, যে সমস্ত প্রশ্ন তাঁহার নিজের মনের ভিতর সঞ্চিত ছিল, কথা-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ সেগুলির উত্তর অথবা সমাধান আপনা হইতেই বলিয়া যাইতেছেন। অধিকন্তু তাঁহার সান্নিধ্যেরই এমন গুণ ছিল যে, তিনি মুখে কিছু না বলিলেও শুধু তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিলেই চঞ্চলতা হইতে বিমুক্ত হইয়া মন উর্ধ্বগামী হইত।

যত দিন যাইতে লাগিল, শশী ততই নরেন্দ্রাদি ভক্তগণের সহিত অধিকতর পরিচিত ও প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। নরেনের মুখে সুফী মরমী কবিদের কবিতার প্রশংসা শুনিয়া শশীর খুবই ইচ্ছা হইল মূল ফারসীতে ঐগুলি পড়িয়া দেখিবেন। তদনুযায়ী ফারসী শিখিতে আরম্ভ করেন। একদা দক্ষিণেশ্বরেই এককোণে বসিয়া তিনি এমন নিবিষ্ট মনে ফারসী পড়িতেছিলেন যে, ঠাকুর তাঁহাকে তিনবার ডাকিয়াও সাড়া পাইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে শশী কাছে আসিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি রে! তুই এত মনোযোগ দিয়ে কি পড়ছিলি?" শশী বুঝাইয়া বলিলে পর তিনি কহিলেন—"ত্যাখ, যদি পরা বিদ্যা ছেড়ে অপরা বিদ্যার পেছনে একবার ছুট্‌তে আরম্ভ করিস্, তবে ভক্তিলাভ হবে না।" এক কথায় শশীর মোহ কাটিয়া গেল। ফারসী কিতাবগুলি তিনি গঙ্গাতে বিসর্জন দিলেন।

অল্পকাল যাইতে না যাইতেই সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া শশী শ্রীগুরুর আশ্রয়ে আসিয়া গেলেন। যদিও বি.এ. পরীক্ষা অদূরবর্তী, এবং পরীক্ষায় তাঁহার কৃতকার্যতা সুনিশ্চিত ছিল, তথাপি সেদিকে ফিরিয়াও তাকাইলেন না।

কালীপ্রসাদ চন্দ্র (স্বামী অভেদানন্দ)—উত্তর কলিকাতার নিমু গোস্বামী লেনের রসিকলাল চন্দ্র ছিলেন 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী' নামক

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ইংরেজী-শিক্ষক। ইংরেজী ভাষার অধ্যাপনায় তাঁহার যথেষ্ট সুনাম ছিল। কালীপ্রসাদ তাঁহারই কনিষ্ঠ পুত্র (জন্ম ১৮৬৬ খ্রীঃ)। কালীমাতার বরে পুত্র লাভ হইয়াছে, এই বিশ্বাসে পিতামাতা নাম রাখেন 'কালীপ্রসাদ'।

শিশুকাল হইতেই কালীপ্রসাদ তীক্ষ্ণ মেধা ও অদ্ভুত জ্ঞানস্পৃহার পরিচয় দিয়াছিলেন। স্কুলের পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে তাঁহার পড়াশুনা সীমাবদ্ধ থাকিত না; বাহিরের অনেক বই পড়িয়া তিনি নিজের জ্ঞান-ভাণ্ডার পূরণ করিতেন। সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। স্কুলে থাকিতেই তিনি 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণ ও 'ছন্দোমঞ্জরী' আয়ত্ত করিয়াছিলেন। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চৌদ্দ বৎসর বয়সেই তিনি সমগ্র গীতাগ্রন্থ উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন ও তৎপরে কালীবর বেদান্তবাগীশের নিকট পাতঞ্জল যোগদর্শন ও শিবসংহিতা পাঠ করেন। যোগশাস্ত্র পড়িয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, শুধু পুস্তকপাঠে বিশেষ কিছুই লাভ নাই;—উপযুক্ত গুরুর নিকট যোগ অভ্যাস করা প্রয়োজন। ঠিক ঐ সময়ে জনৈক সহপাঠীর নিকট তিনি শুনিতে পাইলেন যে, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস নামক এক মহাযোগী আছেন, যাঁহার নিকট সকলেরই অবারিত দ্বার। এই কথা শুনিবামাত্র পরমহংসদেবকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

বাটীতে কাহাকেও না বলিয়া একদা প্রাতঃকালে কালীপ্রসাদ পায়ে হাঁটিয়া দক্ষিণেশ্বরে রওয়ানা হইলেন। উহা ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কোনও এক সময়ের ঘটনা। কালীপ্রসাদ রাস্তা ঠিক জানিতেন না; কখন যে ভবতারিণীর মন্দির ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছেন, কোন খেয়াল নাই। অনেক দূর অগ্রসর হইবার পর নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া পশ্চাৎ ফিরিলেন এবং উত্তর দিকের ফটক দিয়া মন্দির-বাটীতে প্রবেশ করিলেন। তখন বেলা অনেক হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, পরমহংসদেব কলিকাতায় গিয়াছেন, ঐবেলা তাঁহার দেখা পাইবার সম্ভাবনা নাই। ক্ষুণ্ণমনে কালীপ্রসাদ ঠাকুরের থাকিবার ঘরের বারান্দায় বসিয়া আছেন, এমন সময় একটি সৌম্যদর্শন যুবক আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার সহিত কথাবার্তায় কালী জানিতে পারিলেন যে, আগন্তুকের নাম 'শশী' এবং শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট তাঁহার যাতায়াত আছে। শশী কালীপ্রসাদকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন যে, হতাশ

হইবার কারণ নাই, যেহেতু ঠাকুর বাহিরে কদাচ রাত্রিযাপন করেন না এবং সন্ধ্যার পূর্বে কিংবা পরে তিনি নিশ্চয়ই ফিরিবেন। কালীবাড়ীতে শশী যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন; তিনি উভয়ের জন্য প্রসাদ চাহিয়া আনিয়া বন্ধুকে খাওয়াইলেন এবং নিজেও খাইলেন।

শশীর নিকটে কালীপ্রসাদ ঠাকুরের সম্পর্কে অনেক কথা জানিতে পারিলেন এবং সারাদিন বেশ আনন্দেই কাটিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সেদিন ফিরিতে অনেক দেরী হইল। রাত্রি প্রায় নটায় ঘরে পৌঁছিয়া যখন তিনি শুনিলেন যে, একটি বালক তাঁহার দর্শন-লালসায় সারাদিন অপেক্ষা করিয়া আছে, তখনই তাহাকে ডাকাইলেন। কালীপ্রসাদ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে পর ঠাকুর সস্নেহে তাহাকে কাছে বসাইয়া তাহার পরিচয় লইলেন। সাহস পাইয়া কালীপ্রসাদ ইতস্ততঃ না করিয়া সরাসরি বলিয়া ফেলিলেন যে, তিনি যোগ শিখিতে চাহেন এবং এজন্যই আসিয়াছেন। ঠাকুর ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, "এতটুকু বয়সেই তোমার এই ইচ্ছা হয়েছে? তা বেশ! আজ রাত্রিতে বিশ্রাম কর। কাল হবে।" সেইরাত্রি কালীপ্রসাদ দক্ষিণেশ্বরেই কাটাইলেন। এত সহজে মনোরথ পূর্ণ হইবে, তাহা তিনি মোটেই ভাবেন নাই; আনন্দের আতিশয্যে সারারাত্রি প্রায় ঘুম হইল না। প্রভাতে তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সারিয়া ঠাকুরের সন্নিধানে উপস্থিত হইলে পর, ঠাকুর তাহাকে উত্তরের বারান্দায় নিভৃতে লইয়া গিয়া দুচারটি যৌগিক প্রক্রিয়া শিখাইলেন এবং বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন।

অতঃপর কালীপ্রসাদ কালীমন্দিরে যাইয়া ভবতারিণীকে প্রণামানন্তর যখন ঠাকুরের নিকট বিদায় নিতে আসিলেন, তখন ঠাকুর তাহার হাতে মিষ্টিপ্রসাদ দিয়া কহিলেন, "আবার এসো। যদি পয়সা না থাকে, এখান থেকে দেওয়া হবে, এত রাস্তা হাঁটতে হবে না।" কলিকাতাযাত্রী জনৈক ভক্তের গাড়ীতে ঠাকুর কালীপ্রসাদকে তুলিয়া দিলেন। নিজের আগ্রহেই কালীপ্রসাদ আসিয়াছিলেন; এখন ঠাকুরের স্নেহরজ্জুও তাহাকে দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ করিল।

কালীপ্রসাদ সোৎসাহে যোগাভ্যাসে লাগিয়া গেলেন, আর সুযোগ পাইলেই দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করেন। কলিকাতায় কোনও ভক্তগৃহে ঠাকুরের আগমনবার্তা পাইলে কালীপ্রসাদ সেখানে যাইয়াও তাঁহার সঙ্গসুখ লাভ করিতেন। স্বভাবতঃই পড়াশুনায় কালীপ্রসাদের মনোযোগ কমিয়া

গেল। উহাতে পিতামাতা মনঃক্ষুণ্ণ হইলেও কালীপ্রসাদ তাহা গ্রাহ্য না করিয়া আপন সাধনায় রত থাকিলেন। ক্রমশঃ ঘরবাড়ীর বন্ধন কাটাইয়া কালীপ্রসাদ ঠাকুরের সর্বত্যাগী সন্তানদের দলে ভর্তি হইয়া পড়িলেন।

সারদাপ্রসন্ন মিত্র (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ)—সারদাপ্রসন্নের জন্ম ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন জেলা চব্বিশ পরগণার এক বনেদী ধনী বংশের সন্তান এবং তাঁহার মাতামহও ছিলেন প্রতাপশালী জমিদার। পিতা শিবকৃষ্ণ মিত্র কলিকাতাতেই বাস করিতেন। তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে সারদা ছিলেন মধ্যম। সারদার বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। নিম্নতর বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করিয়া চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং তথায় 'মাষ্টার মহাশয়ের' ['কথামৃত'কার শ্রীম-র] স্নেহভালবাসা লাভ করেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষার দ্বিতীয় দিবসে অনবধানতাবশতঃ তাঁহার সোনার ঘড়িটি হারাইয়া যাওয়াতে সারদার মনে এতদূর আঘাত লাগে যে, পরবর্তী দিনগুলিতে তিনি আর মনোযোগপূর্বক প্রশ্নসমূহের উত্তর লিখিতেই পারিলেন না। সুতরাং পরীক্ষার ফল তাঁহার যোগ্যতানুযায়ী না হইয়া অত্যন্ত খারাপ হইল; তিনি দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করিলেন। এই বিপর্যয়ে সারদাপ্রসন্নের মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাঁহার বিমর্ষ ভাব দেখিয়া মাষ্টার মহাশয় তাঁহাকে একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট লইয়া যান।

প্রথম দর্শনেই সারদাপ্রসন্নের মন ঠাকুরের প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট হইল যে, পিতার দারুণ অসন্তোষ অগ্রাহ্য করিয়াও তিনি ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। গাড়ী কিংবা নৌকা ভাড়ার জন্য যাহাতে বাড়ীতে পয়সা চাহিতে না হয়, তজ্জন্য ঠাকুরই এই পয়সা যোগাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ভক্তের কষ্ট নিবারণের জন্য একদিকে যেমন এই মাতৃসুলভ স্নেহপরায়ণতা, ভক্তের অভিমান দূরীকরণের জন্য আবার তেমনি সুদৃঢ় মনোভাব,—সারদাপ্রসন্নের প্রতি ঠাকুরের ব্যবহারে আমরা দেখিতে পাই। বড়ঘরের ছেলে বলিয়া সাধারণ গৃহকর্ম ও সেবাকার্যকে সারদা অবজ্ঞার চোখে দেখিতেন,—তাঁহার দৃষ্টিতে এগুলি ছিল দাসদাসীর কাজ। একদা ঠাকুর তাঁহাকে কহিলেন—'যা, ঘাট থেকে জল নিয়ে আয়, এনে আমার পা ধুইয়ে দে।' একে তো চাকরের কাজ, তাহাও সর্বসমক্ষে কি করিয়া করিবেন—

এই ভাবিয়া সারদা লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। সারদার মনোগত ভাব সম্যক্ জানিয়াও শ্রীরামকৃষ্ণ বাহিরে কিছুই প্রকাশ করিলেন না; আদেশের স্বরে পুনরায় কহিলেন, 'যা নিয়ে আয়।' সারদা কি আর করেন, অগত্যা জল আনিয়া পা ধোয়াইয়া দিলেন। এইরূপে তাঁহার আভিজাত্যের অভিমান চূর্ণীকৃত হইল।

সারদা এফ.এ. ক্লাশে ভর্তি হইয়া প্রথমে লেখাপড়ায় বেশ মন দিয়াছিলেন, কিন্তু ঠাকুরের প্রতি আকর্ষণে লেখাপড়ায় ক্রমশঃ ভাঁটা পড়িল। পরমহংসের কবল হইতে ছেলেকে বাঁচাইবার জন্য সারদার পিতা নানাভাবে চেষ্টা করিলেন এবং তাঁহাকে উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। কিন্তু সারদার মনে দৃঢ়সঙ্কল্প, তিনি সংসারী হইবেন না। বিপদ এড়াইবার উদ্দেশ্যে অবশেষে একদিন গোপনে গৃহ হইতে পলায়ন করিলেন, এবং নানা দুঃখ-বিপদ মাথায় করিয়া পদব্রজে ৺পুরীধাম পৌঁছিলেন। সন্ধান পাইয়া পিতামাতা পুরী যাইয়া তাঁহাকে লইয়া আসিলেন বটে, কিন্তু সারদাকে সংসারে আটকাইয়া রাখা আর সম্ভবপর হইল না। অল্পকাল মধ্যেই সারদা গৃহসম্পর্ক ছিন্ন করিয়া 'চিহ্নিত' ভক্তের দলে মিশিয়া গেলেন।

গঙ্গাধর ঘটক (স্বামী অখণ্ডানন্দ)—গঙ্গাধর ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার আহিরীটোলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কৌলিক উপাধি ছিল 'গঙ্গোপাধ্যায়'; কিন্তু তাঁহার পিতা শ্রীমন্ত তর্করত্ন কুলাচার্যের কাজ করিতেন বলিয়া 'ঘটক' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। অতি অল্পবয়সেই গঙ্গাধরের মধ্যে সাত্ত্বিক গুণের বিকাশ দেখা গিয়াছিল। গঙ্গাস্নান, সন্ধ্যাপূজা, জপ-ধ্যান প্রভৃতিতে তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বাল্যবন্ধু হরিনাথের সঙ্গে দীননাথ বসুর বাড়ীতে গঙ্গাধর প্রথম পরমহংসদেবের দর্শনলাভ করেন। কিন্তু ঐ দর্শনে তাঁহার মনের উপর বিশেষ রেখাপাত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না; কারণ, তৎপরে ৬।৭ বৎসরের মধ্যে তিনি ঠাকুরের নিকটে যান নাই। কৃচ্ছ্রসাধনের দিকেই তাঁহার ঝোঁক ছিল এবং সেইদিকেই সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এমন কি, কৈশোর অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই তিনি স্বপাকে একবেলা হবিষ্যান্ন আহার করিয়া দিন কাটাইতেন। ১৮৮৩ অথবা ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের একদিন অপরাহ্নে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে তিনি দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। ঠাকুর তাঁহাকে পরিচিতের

ন্যায় পরম স্নেহে কাছে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই আগে আমাকে কখনও দেখেছিস্?" গঙ্গাধর উত্তর করিলেন—"হাঁ মহাশয়! ছেলেবেলায় দীনু বোসের বাড়ীতে একবার দেখেছিলাম।" এই উত্তরে ঠাকুর হাসিয়া অদূরবর্তী বুড়ো গোপালকে ডাকিয়া কহিলেন—"শোন এর কথা! এ বলছে কি না ছেলেবেলায় আমাকে দেখেছে। উঃ, এর আবার ছেলেবেলা!" কিছুক্ষণ আলাপ-পরিচয়ের পর শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গাধরকে কালীমন্দিরে পাঠাইলেন এবং রাত্রিতে দক্ষিণেশ্বরে থাকিতে বলিলেন। পরদিন গঙ্গাধর বিদায় নিতে আসিলে ঠাকুর পরমাত্মীয়ের ন্যায় কহিলেন—'আবার আসিস্; শনিবারে আস্‌বি এবং রাত্রিতে এখানে থাক্‌বি।' গঙ্গাধর ঠাকুরের স্নেহরজ্জুতে চিরতরে বাঁধা পড়িয়া গেলেন এবং তখন হইতে ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন।

প্রথমাবস্থায় গঙ্গাধর কালীবাড়ীতে অন্নপ্রসাদ দূরের কথা, অন্য প্রসাদও গ্রহণ করিতেন না। ধীরে ধীরে ঠাকুর তাঁহার মতিগতি অনাবশ্যক কৃচ্ছ্রসাধন হইতে ফিরাইয়া স্বাভাবিকের দিকে লইয়া আসিলেন। তিনি বলিতেন যে, ত্যাগ-সংযম এবং আহার-বিহারে সাত্ত্বিক রুচি অবশ্যই ভাল; এগুলির দিকে স্বাভাবিক ঝোঁক পূর্বজন্মের সুকৃতির ফল। কিন্তু কোন বিষয়েই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। তিনি গঙ্গাধরকে উপদেশ দিলেন নরেনের নিকট যাইবার জন্য; কহিলেন—"নরেন যা পায়, তাই খায়। বড় বড় চোখ, ভেতর দিকে টান। কলকাতার রাস্তা দিয়ে যায়, আর লোকজন, বাড়ী, ঘর-দোর, গাড়ী-ঘোড়া—সব দেখে নারায়ণময়। তুই তার কাছে যাস্, তার সঙ্গ খুব করিস্।" মনে হয়, এই উপদেশের একটা গভীর তাৎপর্য ছিল। বাহ্য আচরণ ও আচার-নিষ্ঠার চরম লক্ষ্য কি, এবং লক্ষ্যে পৌছিবার পর আচার-অনুষ্ঠানের সার্থকতা কিরূপে আপনা হইতেই হ্রাস পায়, নরেনের দৃষ্টান্ত দ্বারা ঠাকুর তাহাই বুঝাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, গঙ্গাধর অচিরকাল মধ্যে নরেনের সহিত প্রগাঢ় বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ঠাকুরের ইচ্ছা পূরণ করিয়াছিলেন।

হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ)—১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে হরিপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈতৃক নিবাস ছিল দক্ষিণেশ্বরের অনতিদূরে বেলঘরিয়াতে। হরিপ্রসন্নর পিতা সেনাবিভাগে কমিসারিয়েটে কাজ করিতেন এবং পুত্রের বয়স যখন মাত্র তেরো বৎসর, তখন কোয়েটাতে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। হরিপ্রসন্নর বাল্যজীবন পশ্চিমেই

কাটিয়াছিল; কিন্তু দশ-এগারো বৎসর বয়স হইতে না হইতেই পড়াশুনার সুবিধার জন্য তাহাকে বেলঘরিয়াতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। বাটী হইতে প্রত্যহ যাতায়াত করিয়া তিনি প্রথম হেয়ার স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করেন এবং তৎপরে সেণ্ট্‌জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। শেষোক্ত কলেজে শরচ্চন্দ্র (স্বামী সারদানন্দ) তাঁহার সহপাঠী ছিলেন।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বেলঘরিয়ার উদ্যানে হরিপ্রসন্ন সর্বপ্রথম পরমহংসদেবের দর্শনলাভ করেন। একদা অপরাহ্ণে বালকেরা মিলিয়া খেলিতেছিলেন, এমন সময়ে কেহ একজন খবর দিল যে, কেশব সেনের ওখানে পরমহংস আসিয়াছেন। অমনি অপর বালকদের সহিত তিনিও সেখানে ছুটিয়া যান। বালকসুলভ কৌতূহল ব্যতীত আর কোন ভাব তাঁহার মনে ছিল না এবং ঐ দর্শন বিশেষ ধর্তব্যের মধ্যে নয়। সত্যিকার দর্শন ঘটে চারি বৎসর পরে যখন শরচ্চন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুরকে দেখিবার জন্যই তিনি দক্ষিণেশ্বরে যান (নভেম্বর, ১৮৮৩)। কিন্তু যে সময়ে তাঁহারা পৌছিলেন, ঠাকুর তখন মণি মল্লিকের বাড়ীতে যাইবার জন্য একেবারে প্রস্তুত—কথা বলিবার অবকাশ ছিল না। ঠাকুরের সঙ্গলাভে নিজেদের বঞ্চিত না করিয়া তাঁহারাও নৌকাযোগে মণি মল্লিকের বাটীতে চলিয়া গেলেন। তথায় ঠাকুরের সুমধুর কথাবার্তা ও সুধাময় সংগীত শুনিয়া এবং অপূর্ব ভাবসমাধি দেখিয়া দুজনের আনন্দের সীমা রহিল না। বাড়ী ফিরিতে অনেক দেরী হওয়াতে হরিপ্রসন্নকে মায়ের নিকট ভৎর্সনা-বাক্য শুনিতে হইল। পরমহংসদেবের নিকট গিয়াছিলেন জানিয়া মা কহিলেন—"সেই পাগলা-বামুনের কাছে গিয়েছিলি—যে সাড়ে তিনশ' ছেলের মাথা খেয়েছে?" জননীর আশঙ্কা অমূলক ছিল না। বস্তুতঃ হরিপ্রসন্নর মনপ্রাণ শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে বিক্রীত হইয়াছিল—আর ফিরাইয়া আনিবার জো ছিল না। ইহার পর হইতে হরিপ্রসন্ন ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাইতে এবং মাঝে মাঝে তথায় রাত্রিবাসও করিতে লাগিলেন। তাঁহার জীবন তখনই ঠাকুরের নিকট উৎসর্গীকৃত হয়, যদিও আরও কয়েক বৎসর সংসারে থাকিয়া তাঁহাকে মা-ভাইয়ের সেবা করিতে হইয়াছিল।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মের অন্তে বি.এ. পড়িবার জন্য হরিপ্রসন্ন পাটনায় চলিয়া যান। ঠাকুরের দেহত্যাগের পূর্বে আর আসিতে পারেন নাই।

সুবোধচন্দ্র ঘোষ (স্বামী সুবোধানন্দ)—ঠনঠনিয়ায় শঙ্কর ঘোষ লেনের সুপ্রসিদ্ধ ঘোষবংশে সুবোধচন্দ্রের জন্ম (১৮৬৭ খ্রীঃ)। সুবোধের পিতা ৺কৃষ্ণদাস ঘোষ অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। সাধুসন্তদের জীবনী ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি নিজে পড়িতেন এবং সন্তানদিগকে পড়িতে দিতেন। সুবোধের জননীও অতিশয় ভক্তিমতী ছিলেন। ছেলে-মেয়েদের নিকট তিনি নানা পৌরাণিক কাহিনী মুখে বলিতেন এবং পড়িয়া শুনাইতেন। সুবোধ নিজেও খুব মেধাবী ও সৎস্বভাবের ছিলেন। এইসমস্ত যোগাযোগের ফলে শৈশবাবধি তাঁহার হৃদয়ে ধর্মভাব বিকশিত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে। কৃষ্ণদাসের ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত ছিল। কেশবচন্দ্রের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের মিলনের ও হৃদ্যতার কথা তিনিই পুত্রের নিকট বর্ণনা করেন। তদ্ভিন্ন, কেশবচন্দ্রের পত্রিকা পড়িয়াও সুবোধ পরমহংসদেবের অলৌকিক চরিত্র ও মাহাত্ম্যের কথা জানিতে পারেন। অবশেষে পিতার সংগৃহীত গ্রন্থরাজির মধ্যে সুরেশচন্দ্র দত্ত-সঙ্কলিত "পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি" নামক পুস্তিকা পড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য সুবোধের মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মে। কৃষ্ণদাস নিজেই পুত্রকে পরমহংসদেবের নিকট লইয়া যাইতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু কোনও কারণে তাঁহার যাইতে দেরী হওয়াতে সুবোধ অপেক্ষা না করিয়া এক সহপাঠী বন্ধুর সঙ্গে রথযাত্রার দিন (১৮৮৪) দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া উপস্থিত হন। সুবোধের পরিচয় পাইয়াই ঠাকুর সস্নেহে কাছে বসাইলেন এবং একেবারে জড়াইয়া ধরিলেন—যেন কত আপনার! সুবোধের সঙ্কোচ দূর করিবার নিমিত্ত আশ্বাস দিয়া বলিলেন—'তুই এখানকার'। আরও কহিলেন যে, ঝামাপুকুরে থাকিতে তিনি তাঁহাদের বাড়ীতে কত গিয়াছেন। এইরূপে পরমাত্মীয়ের ন্যায় অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর সুবোধ বন্ধুসহ বিদায় লইতে চাহিলে ঠাকুর তাঁহাকে শনি অথবা মঙ্গলবারে আবার আসিতে বলিলেন। সুবোধের যাতায়াত ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ঠাকুর পরম স্নেহভরে তাঁহাকে হাত ধরিয়া সাধনপথে অগ্রসর করিয়া দিতে লাগিলেন। সুবোধের বৈশিষ্ট্য ছিল শিশুর ন্যায় সরলতা এবং ঠাকুরের উপর একান্ত নির্ভরশীলতা।

নরেন্দ্রনাথ

নরেন্দ্রনাথ

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে শিমলার সুবিখ্যাত দত্ত-পরিবারে নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বিশ্বনাথ ও মাতার নাম ভুবনেশ্বরী। নরেন্দ্রনাথের পিতামহ দুর্গাচরণ দত্ত পুত্রমুখ-দর্শনের পরেই সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যান। বিশ্বনাথ এটর্ণী হইয়াছিলেন এবং ব্যবসায়ে যথেষ্ট উপার্জন করিতেন; কিন্তু সাংসারিক বুদ্ধি কিংবা সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি তাঁহার মোটেই ছিল না। তিনি মুক্তহস্তে ব্যয় এবং দান-দক্ষিণা করিতেন। ভুবনেশ্বরী পরম ভক্তিমতী ছিলেন। কথিত আছে যে, বীরেশ্বর মহাদেবের আরাধনা করিয়া তিনি পুত্রলাভ করেন এবং সেই পুত্রই নরেন্দ্রনাথ। অতএব পিতামহ, পিতা এবং মাতা,—সকল দিক হইতেই নরেন্দ্রনাথ নিস্পৃহতা, ঈশ্বরভক্তি ও বৈরাগ্যের আদর্শ উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। ছেলেবেলা হইতেই সঙ্গি-সাথীদের মধ্যে সর্বদা সকল বিষয়ে তিনি ছিলেন দলের প্রধান। যেমন তাঁহার দেহ ছিল সুস্থ-সবল, তেমনই চেহারা ছিল সুশ্রী, সুঠাম। চক্ষুর্দ্বয় ছিল অতীব উজ্জ্বল এবং প্রখর বুদ্ধির পরিচায়ক। নরেন্দ্রনাথের ধারণা, স্মৃতিশক্তি, তেজ, সাহস, সত্যনিষ্ঠা সব-কিছুই ছিল অসাধারণ; অপরপক্ষে হৃদয় ছিল অত্যন্ত কোমল, পরের দুঃখ দেখিলে একেবারে গলিয়া যাইত। শৈশবাবধি তাঁহার মন কিরূপ অদ্ভুত ধ্যানপরায়ণ ছিল, সেই সম্পর্কে বহু গল্প প্রচলিত আছে। আবার হাস্য-কৌতুক এবং গান-বাজনাতেও তিনি ছিলেন অসামান্য নিপুণ।

নরেন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী। স্কুল-কলেজে পড়িবার সময়ে তাঁহার বিদ্যাচর্চা কখনও পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত না। পরীক্ষায় উচ্চসম্মান লাভের জন্য তিনি কিছুমাত্র ব্যগ্র হইতেন না। তাঁহার অন্তরে ছিল সত্যিকার জ্ঞান-পিপাসা। পরীক্ষা পাস অপেক্ষা জ্ঞানলাভের প্রতিই ছিল তাঁহার সমধিক আগ্রহ। নানাবিষয়ক বহু গ্রন্থ তিনি ছাত্রাবস্থায়ই পড়িয়াছিলেন।

ঈশ্বরলাভের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যৌবনের প্রারম্ভে নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত আরম্ভ করেন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রভৃতি মহারথিগণের সহিত পরিচয়-স্থাপন ও তাঁহাদের স্নেহ-ভালবাসা

অর্জন করেন। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধান কোথাও না পাইয়া তাঁহার মন ক্রমশঃ অজ্ঞেয়-বাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। মনের যখন ঐরূপ অবস্থা, তখন ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভ করেন। ঠাকুরের আগমন উপলক্ষ্যে সেদিন সুরেন্দ্রনাথের গৃহে একটি ছোটখাট উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। গান গাহিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ প্রতিবেশী যুবক নরেন্দ্রকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। নরেন্দ্রকে দেখিয়া ও তাঁহার গান শুনিয়া ঠাকুর খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং নরেন্দ্রের সম্যক্ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে সুবিধামত শীঘ্রই একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিতে বলিলেন। কিন্তু নরেন্দ্র তখন এফ এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন; অতএব যাইবার অবকাশ ছিল না, এবং এ-বিষয়ে তাঁহার আর কোন খেয়াল রহিল না। যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বাহির হইলে জানা গেল যে, নরেন্দ্রনাথ পাস করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গেই নরেন্দ্রের পিতা তাঁহার বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নরেন্দ্র অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে আপত্তি জানাইবার ফলে এ-বিষয় আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সার সত্য জানিবার জন্য নরেন্দ্রনাথ শুধু দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, তত্ত্বজ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষায় কঠোর ব্রহ্মচর্যব্রত তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন। যিনি এ বিষয়ে আলোক দেখাইতে পারেন, এমন কোন মহাপুরুষকেও তিনি মনে মনে খুঁজিতেছিলেন। ব্যাকুল হৃদয়ে একদা যুবক নরেন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হইয়া সরাসরি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহাশয়! আপনি কি জগদীশ্বরকে স্বচক্ষে দেখেছেন?' এই প্রশ্নের সোজা উত্তর না দিয়া দেবেন্দ্রনাথ দার্শনিক-ভাবে ঈশ্বরতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিলেন; কিন্তু তাহাতে নরেন্দ্রনাথের মনস্তুষ্টি হইল না।

ভক্ত রামচন্দ্র নরেন্দ্রনাথের পিতার গৃহে প্রতিপালিত হইয়া লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন। ঈশ্বরলাভের উদ্দেশ্যেই নরেন্দ্র বিবাহে অনিচ্ছুক, ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি একদিন নরেন্দ্রকে একান্তে লইয়া গিয়া কহিলেন—'যদি প্রকৃত ধর্মলাভই তোর উদ্দেশ্য হয়, তবে এখানে ওখানে বৃথা ঘোরাফেরা না করে আমার সঙ্গে চল্; দক্ষিণেশ্বরে

তোকে নিয়ে যাব, ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষ সেখানে দেখতে পাবি।' এরূপ কথাবার্তা হইবার পর রামচন্দ্র, সুরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সহিত যুবক নরেনও একদা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। যদিও ইতিপূর্বে সুরেন্দ্রের বাড়ীতে একবার দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছিল, তথাপি এ যেন সম্পূর্ণ নূতন সাক্ষাৎকার! নরেনের মহৎ লক্ষণ ও অদ্ভুত শক্তিমত্তা এবারেই যেন ঠিকভাবে ঠাকুরের নজরে পড়িল। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে, এই সুদর্শন যুবক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এবং অপরিসীম সত্ত্বগুণের আধার। বিষয়ী লোকের আবাসস্থল কলিকাতায় যে এরূপ ব্যক্তি থাকিতে পারে, ইহা ভাবিয়া তিনি আশ্চর্যান্বিত হইলেন। সুরেন্দ্রাদি ভক্তগণের নিকট নরেন্দ্রের পরিচয় লইয়া এবং নরেন্দ্র ভাল সঙ্গীতজ্ঞ, একথা জানিতে পারিয়া ঠাকুর তাঁহাকে একটি গান গাহিতে অনুরোধ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ তখন 'মন চল নিজ নিকেতনে' এই গানটি গাহিয়া শুনাইলেন। * তিনি এরূপ সুমধুর কণ্ঠে এবং ষোল আনা মনপ্রাণ ঢালিয়া গানটি গাহিয়াছিলেন যে, ঠাকুর তাহা শুনিয়া আর নিজেকে সামলাইতে পারিলেন না, ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। ভাবের আবেশ কমিলে পর পুনরায় কথাবার্তা হইতে লাগিল।

নরেন্দ্রনাথও ঠাকুরকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতিতে প্রদত্ত 'মদীয় আচার্যদেব'-বিষয়ক বক্তৃতায় তিনি এই প্রথম সাক্ষাৎকারের বিষয় যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইল—"এই মহাপুরুষের কথা আমি শুনিয়াছিলাম। একদিন তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্য আমি তাঁহার নিকট গেলাম। প্রথম দেখিয়া মনে হইল একজন সাধারণ লোক; তাঁহার কোন বৈশিষ্ট্য আমার চোখে পড়িল না। অতি সহজ, সাধারণ ভাষায় তিনি কথা বলিতেছিলেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম —এও কি সম্ভব যে, ইনি একজন মহান্ ধর্মোপদেষ্টা? ধীরে ধীরে আমি তাঁহার কাছে গিয়া বসিলাম এবং যে প্রশ্ন পূর্বে আরও অনেককে করিয়াছি, সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয়! আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?' উত্তর আসিল—'হাঁ, বিশ্বাস করি।' 'আপনি কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ

* 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' (৩য় ভাগ) পরিশিষ্টে লিপিবদ্ধ নরেন্দ্রনাথ ও শ্রীম'র কথোপকথন হইতে জানিতে পারা যায় নরেন্দ্রনাথ ঐ দিন আরও একটি গান গাহিয়াছিলেন— "যাবে কিহে দিন আমার বিফলে চলিয়ে?"

করতে পারেন?' 'হাঁ, পারি।' 'কিরূপে?' 'যেহেতু তোমাকে যেমন এখানে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, তাঁকেও ঠিক তেমনি দেখ্‌চি, বরঞ্চ আরও স্পষ্ট ও নিঃসন্দিগ্ধরূপে দেখতে পাচ্চি।' এই উত্তর তৎক্ষণাৎ আমার অন্তর স্পর্শ করিল। জীবনে এই প্রথম এমন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইলাম যিনি সাহস-পূর্বক বলিতে পারিলেন যে, তিনি ঈশ্বরকে বস্তুতঃ দর্শন করিয়া থাকেন এবং অধিকন্তু কহিলেন যে, জড়জগৎ যেমন আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ-গোচর, ধর্মও তেমনি প্রত্যক্ষ অনুভূতির ব্যাপার;—এমন কি, ধর্মের অনুভূতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির অপেক্ষা আরও বাস্তব, আরও গভীর।" যেন বিশেষ করিয়া নরেন্দ্রনাথকে শুনাইবার জন্যই ঠাকুর সেদিন উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের প্রতি এরূপ উপদেশ দিতেছিলেন—"এই তোমাদিগকে যেমন দেখ্‌চি, তোমাদের সঙ্গে যেমন কথা কইচি, ঈশ্বরকেও ঠিক এমনিভাবে দেখা যায় এবং তাঁর সহিত কথা কওয়া যায়; কিন্তু ওরূপ করতে যায় কে? লোকে আত্মীয়-স্বজনের শোকে ঘটি ঘটি কাঁদে, বিষয় বা টাকার জন্যও ওরূপ করে, কিন্তু ঈশ্বরকে পাবার জন্য কে কাঁদে বল? তাকে পাবার জন্য যদি কেউ ব্যাকুল হয়ে ডাকে, তবে অবশ্যই তিনি দেখা দেন।" কথাগুলি শুনিয়া নরেন্দ্রনাথের প্রতীতি জন্মিল—নিশ্চয় ইনি একান্তভাবে ভগবানের আরাধনা করিয়া যাহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই মুখে ব্যক্ত করিতেছেন।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎকারের যে কয়টি বিবরণ পাওয়া যায়, সেগুলির মধ্যে সকল বিষয়ে মিল না থাকিলেও একটি বিষয়ে মিল আছে। সবগুলি হইতেই সন্দেহাতীতভাবে এবং সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রথম দর্শনেই উভয়ে পরস্পরের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুরের কথাবার্তায় এবং আচরণে এমন ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল যেন নরেন্দ্র-নাথের আগমনের জন্যই তিনি এতদিন প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে নরেন্দ্রনাথও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এতদিনে এমন এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, যিনি ঈশ্বরকে বস্তুতঃ জানেন।

ঠাকুর সেদিন নরেন্দ্রনাথকে পরম সমাদরে নিজের হাতে মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া-ছিলেন এবং বিদায়দান-কালে বারংবার বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি যেন শীঘ্রই আবার আসেন এবং কাহাকেও সঙ্গে না আনিয়া একাকী আসেন। কোন অজ্ঞাত কারণে নরেন্দ্রনাথের পক্ষে উক্ত নির্দেশ-পালনে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিয়াছিল।

মাসদেড়েক পরে তিনি বাটী হইতে দীর্ঘপথ একাকী পায়ে হাঁটিয়া দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। যখন পৌছিলেন, তখন ঠাকুরের ঘরে অপর লোকজন ছিল না। ঠাকুর তাঁহাকে পরম আহ্লাদের সহিত তক্তাপোশের উপরে নিজের পাশে বসাইলেন এবং নরেন্দ্রনাথ কিছু জানিবার কিংবা বুঝিবার পূর্বেই সহসা গাত্রস্পর্শদ্বারা তাঁহার এক অদ্ভুত উপলব্ধি করাইলেন। নরেন্দ্রনাথের মনে হইল যেন সমস্ত বিশ্বসংসার, এমন কি নিজের আমিত্ববোধ পর্যন্ত দ্রুত বিলীন হইয়া যাইতেছে! তিনি দারুণ আতঙ্কে অভিভূত হওয়াতে ঠাকুর তাঁহার বুকে হাত বুলাইয়া তৎক্ষণাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিয়া কহিলেন—'তবে এখন থাক্; একবারে কাজ নেই, কালে হবে।' নরেন্দ্রনাথের মনে ভয় এবং বিস্ময়ের সীমা রহিল না। একবার ভাবিলেন—এ ব্যক্তি মায়াবী কিংবা পাগল নহে তো? কিন্তু এমন জ্ঞানী, এমন ঈশ্বরানুরাগী, এমন প্রেমিক ব্যক্তি তিনি জীবনে কুত্রাপি দেখেন নাই। এ হেন ব্যক্তি কি মায়াবী হইতে পারে? ভয় দূরীভূত হইয়া তাঁহার মনে অধিকতর কৌতূহল ও আগ্রহের সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, এই ব্যাপারের শেষ দেখিতে হইবে। উহার পর হইতে তিনি ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে আসিতে থাকেন, এবং ঠাকুরও তাঁহাকে হাত ধরিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যের গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশে লইয়া যাইতে লাগিলেন। এ সম্পর্কে নরেন্দ্রনাথ স্বয়ং বলিয়াছেন—"দিন দিন আমি সেই মহাপুরুষের অধিকতর নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম এবং স্পষ্ট উপলব্ধি করিলাম যে, ধর্ম সত্যই আদান-প্রদানের বস্তু। সত্যিকার মহাপুরুষের বারেকের স্পর্শ, বারেকের দৃষ্টি জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করিয়া দিতে পারে। বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি অতীতের মহাপুরুষদের সম্পর্কে আমি পড়িয়াছিলাম কিরূপে তাঁহারা কোনও ব্যক্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেন, 'তুমি পূর্ণ হও, তোমার সমস্ত অসম্পূর্ণতা দূরীভূত হউক,'—আর অমনি সেই ব্যক্তি সমস্ত দুর্বলতা, সমস্ত অসম্পূর্ণতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত। এবারে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিলাম যে, এরূপ ব্যাপার সত্যই ঘটিতে পারে। যে মুহূর্তে আমি এই ব্যক্তিটির দর্শনলাভ করিলাম, সেই মুহূর্তেই যেন আমার সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হইল। আমার আচার্যদেব বলিতেন—'টাকাকড়ি, ঘটি-বাটি যেমন একে অন্যকে হাতে তুলিয়া দিতে পারে, আধ্যাত্মিকতাও ঠিক তেমনি, কিংবা আরও বাস্তবরূপে হাতে তুলিয়া দিতে

পারা যায়'।" বলা বাহুল্য, পরমহংসদেবের ন্যায় গুরু এবং নরেন্দ্রনাথের ন্যায় অলোকসামান্য শিষ্যের মধ্যেই এরূপ আদান-প্রদান সম্ভবপর।

আরও একটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঠাকুরের প্রতি অসীম অনুরাগ ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াও নরেন্দ্রনাথ নিজের বিচারবুদ্ধি কখনও বিসর্জন দেন নাই, ব্রাহ্মসমাজের খাতা হইতেও নিজের নাম কাটান নাই।* প্রত্যেক বিষয় স্বয়ং হাতেকলমে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত ঠাকুরই তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেন; এমন কি, অন্যান্য ভক্তদের সহিত তিনি অনেক সময় নরেন্দ্রকে তর্কে প্রবৃত্ত করাইয়া মজা দেখিতেন। নরেন্দ্রনাথ যখন অমিত তেজে প্রতিপক্ষের মত চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া স্বমত প্রতিষ্ঠা করিতেন, তখন ঠাকুরের আনন্দের সীমা থাকিত না।

দিন দিন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং নরেন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া চলিল। প্রায় পাঁচ বৎসরকাল আপন গৃহে থাকিয়াই নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিয়াছিলেন। সপ্তাহে অন্ততঃ একবার তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন এবং কখনও বা দুই-চারি দিন একসঙ্গে ঠাকুরের নিকট অবস্থানপূর্বক ধ্যানভজন অভ্যাস করিতেন। নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের যে অদ্ভুত স্নেহ ও আকর্ষণ ছিল, তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত। এরূপ অনেক সময়ে ঘটিত যে, নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, একটু দূরে থাকিতে তাঁহাকে দেখিয়াই ঠাকুর 'ঐ যে ন—, ঐ যে ন —' বলিয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া একেবারে সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন,—নরেন্দ্রের নাম পুরাপুরি উচ্চারণ করিবার পর্যন্ত অবসর থাকিত না। নরেন্দ্র একটানা কিছুদিন না আসিলে কালীমন্দিরে যাইয়া প্রার্থনা করিতেন, 'মা, নরেনকে শীগ্‌গীর এখানে টেনে নিয়ে আয়।' নরেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই যেন স্বস্তি পাইতেন না। নরেন্দ্রের জন্য তিনি কিরূপ ছটফট করিতেন, এমন কি, অশ্রুবিসর্জন পর্যন্ত করিতেন, তাহা একাধিক ভক্ত ও শিষ্য স্বচক্ষে দেখিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। একবার

* অনেক বৎসর পরে যখন 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামে তিনি জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, তখনও হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুসমাজের ব্যাপকত্ব বুঝাইতে গিয়া 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে'র সহিত নিজের সম্পর্ক তিনি এভাবে ভগিনী নিবেদিতার নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন—"It is for them to say whether I belong to them or not! Unless they have removed it, my name stands on their books to this day!"—'The Master As I Saw Him', Chapter XVII.

তিনি তাঁহার প্রিয়শিষ্য নরেনের সন্ধানে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনামন্দিরে যাইয়া উপস্থিত হন; সেখানে তাঁহাকে কিছু লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথই সেদিন তাঁহাকে অতি সন্তর্পণে জনতার মধ্য হইতে নিরাপদে বাহির করিয়া দক্ষিণেশ্বরে পৌছাইয়া দিয়াছিলেন। মনে হয়, এই আকর্ষণের মূলে এক ছিল ভালবাসা, আর ছিল ভয়। নরেন্দ্র ছিলেন শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আধার, তাঁহার মধ্যে সংসারের কোনরূপ আবিলতা ও সঙ্কীর্ণতা ছিল না। সত্ত্বগুণী লোক দেখিলে ঠাকুর সহজেই আকৃষ্ট হইতেন; সুতরাং নরেন্দ্রনাথের প্রতি ঠাকুর যে বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইবেন, উহাতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু নরেন্দ্রনাথ শুধু সত্ত্বগুণী ছিলেন না,—তিনি ছিলেন অসাধারণ তেজস্বী ও প্রতিভাবান্। ধন, মান ও বিদ্যা-অর্জন, কিংবা জাগতিক প্রতিষ্ঠালাভ প্রভৃতি যে কোন বিষয়েই এই প্রতিভা নিয়োজিত হউক না কেন, উহার পক্ষে সাফল্যলাভ ছিল সুনিশ্চিত। তাই ঠাকুর মনে মনে সর্বদা আশঙ্কা করিতেন, পাছে এই যুবক ঈশ্বরলাভে একান্তভাবে অভিনিবিষ্ট না থাকিয়া অন্য কোন দিকে চলিয়া যায়। ঠাকুর যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেন যে, ঐরূপ ঘটিলে শুধু যে সেই যুবকেরই মহৎ অনিষ্ট ঘটিবে তাহা নহে, সমগ্র মানবসমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

নরেন্দ্রনাথের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিবার পক্ষে নরেন্দ্রনাথ অতি উত্তম অধিকারী। ইহা বুঝিয়া তিনি নরেন্দ্রকে বেদান্তচর্চায় নিরন্তর উৎসাহ দিতেন, —অষ্টাবক্রসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে বলিতেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের মতবাদে আস্থাবান্ ছিলেন বলিয়া নরেন্দ্রনাথ জগদীশ্বরকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও পালনকর্তা বলিয়াই জানিতেন; ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদচিন্তন তাঁহার নিকট অত্যন্ত বিসদৃশ বলিয়া মনে হইত। অদ্বৈতবাদ তিনি কিছুতেই মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন না; এবং এই বিষয় লইয়া তিনি ঠাকুরের সহিত তর্কে পর্যন্ত প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু ঠাকুর ঠিক জানিতেন যে, নরেন্দ্রনাথ জ্ঞানীর প্রকৃতি লইয়া জন্মিয়াছেন এবং দুদিন আগে হউক কিংবা পরে হউক, তাঁহাকে জ্ঞানপন্থা অবলম্বন করিতেই হইবে। সুতরাং সুযোগ পাইলেই ঠাকুর নরেন্দ্রের নিকট অদ্বৈতবেদান্তের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে জ্ঞানমার্গে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতেন। একদিন এইভাবে অনেকক্ষণ ধরিয়া নরেন্দ্রকে

অদ্বৈততত্ত্ব উপদেশ করিলেন; নরেন্দ্র মনোযোগ সহকারে তাহা শুনিয়াও যেন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। ঠাকুরের কথা শেষ হইলে পর তিনি ঘরের বাহিরে গিয়া প্রতাপচন্দ্র হাজরা* মহাশয়ের নিকটে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে হাজরা মহাশয়কে বলিতে লাগিলেন—"এও কি কখনো হতে পারে? ঘটিটা ঈশ্বর, বাটিটা ঈশ্বর, যা' কিছু দেখি সবই ঈশ্বর—আবার আমরা নিজেরাও ঈশ্বর?" হাজরা মহাশয়ও এই সমালোচনায় যোগ দিলেন। অদ্বৈতবাদের অসম্ভাব্যতা লইয়া দুজনে খুব হাসিঠাট্টা চলিতে থাকিল।

ঠাকুর এতক্ষণ ঘরের ভিতরে অর্ধবাহ্য দশায় ছিলেন। হাসির রোল শুনিয়া তিনি নিতান্ত বালকের ন্যায় পরিধানের ধুতিখানি বগলে লইয়া বাহিরে আসিয়া নিজেও খুব হাসিতে লাগিলেন এবং 'তোরা কি বলছিস্ রে' বলিতে বলিতে নরেন্দ্রকে স্পর্শ করিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। ঐ অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন স্পর্শে মুহূর্তমধ্যে নরেন্দ্রের ভাবান্তর উপস্থিত হইল, সমগ্র জগৎ ব্রহ্মময়

* প্রতাপচন্দ্র হাজরার বাড়ী ছিল কামারপুকুরের সন্নিকটবর্তী কোনও গ্রামে। প্রৌঢ় বয়সে সাময়িক বৈরাগ্যভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি বৃদ্ধা মাতা ও স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া আসেন এবং কয়েক বৎসর সেখানে যাপন করেন। প্রায় সময়েই তাঁহাকে মালা জপ করিতে দেখা যাইত। লোকের নিকট নিজেকে একজন খুব উঁচুদরের সাধক বলিয়া পরিচিত করিবার জন্য তিনি বড়ই ব্যগ্র ছিলেন। শাস্ত্রের কিংবা সাধনরহস্যের যে সকল বিষয় তিনি কিছুই জানিতেন না কিংবা বুঝিতেন না,—সেই সকল বিষয়েও লম্বা-চওড়া ব্যাখ্যান করিতেন। আসলে তাঁহার মনে ধন ও যশোলাভের ইচ্ছা ছিল খুবই প্রবল। বাড়ীতে সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না এবং অল্পাধিক ঋণও ছিল। শিষ্য-সেবক জুটাইয়া কিংবা কোন সিদ্ধাই লাভ করিয়া আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিবেন—এই আকাঙ্ক্ষা তিনি সম্ভবতঃ অন্তরে পোষণ করিতেন। বলা বাহুল্য, এরূপ বিষয়লালসা ও কপটাচারে মগ্ন থাকিয়া কখনও ধর্মলাভ হইতে পারে না। হাজরার চরিত্র ও মনোগত ভাব শ্রীরামকৃষ্ণ বিলক্ষণ অবগত ছিলেন এবং মাঝে মাঝে খুব তিরস্কারও করিতেন; তথাপি তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

হাজরার তর্কে খুব মতি ছিল। বিশেষ করিয়া নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি তর্কে একেবারে মাতিয়া উঠিতেন। তজ্জন্য ঠাকুর মাঝে মাঝে যুবক শিষ্যদের সাবধান করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেন,—"হাজরা শালার ভারি পাটোয়ারী বুদ্ধি, ওর কথা শুনিস্ নি।" আবার কখনও বলিতেন—'জটিলা-কুটিলা না হলে লীলা পোষ্টাই হয় না; হাজরার এখানে আগমন ও অবস্থান শুধু লীলা পোষ্টাইয়ের জন্য।'

হইয়া গেল। ঘটি, বাটি প্রভৃতি কি করিয়া ব্রহ্মবস্তু হইতে পারে এই নিয়া ক্ষণকাল পূর্বে হাসিঠাট্টা করিতেছিলেন; এখন প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন—ঘটিবাটি, গাছপালা, ঘরবাড়ী, মানুষ, পশুপক্ষী প্রভৃতি সব কিছু ব্রহ্মের প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই আচ্ছন্ন ভাব কয়েকদিন পর্যন্ত বজায় রহিয়াছিল। ধীরে ধীরে উহা হইতে মুক্তিলাভপূর্বক নরেন্দ্র যখন সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন স্থির করিলেন যে উহা নিশ্চয়ই অদ্বৈতবিজ্ঞানের আভাস। তাঁহার মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে, শাস্ত্রে এ বিষয়ে যাহা লেখা আছে এবং ঠাকুরের মুখে যাহা শুনিয়াছেন, তাহা মিথ্যা নহে। গুরুভাইদিগকে তিনি বলিয়াছিলেন যে, তখন হইতে তাঁহার মনে অদ্বৈততত্ত্বের প্রতি আর কখনও কোনও প্রকার সন্দেহের উদয় হইতে পারে নাই।

এইরূপে ব্রাহ্মসমাজের যুবক নরেন্দ্রনাথ গোঁড়া ব্রাহ্মমত পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈততত্ত্বে আস্থাবান্ হইলেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত তিনি কালী মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে তখনও পর্যন্ত খুব সোৎসাহে মত প্রকাশ করিতেন। যুক্তিতর্ক দ্বারা কিছুতেই নরেনকে এ বিষয় বুঝাইতে না পারিয়া ঠাকুর একদিন তাঁহাকে কহিলেন—"আমার মা'কে মানিস্ না তো তুই এখানে আসিস্ কেন?" নরেন্দ্র প্রত্যুত্তরে কহিলেন—"মহাশয়! এখানে এলেই যে কালী মানতে হবে, এমন কি কথা আছে?" তখন ঠাকুর কহিলেন—"আচ্ছা বেশ, আর বেশীদিন বাকী নেই, তুই যে মা'কে মান্‌বি, শুধু তাই নয়, মায়ের নামে চোখের জলে ভাস্‌বি।" তৎপরে সেখানে উপস্থিত অন্যান্য ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলিলেন—"এই ছোকরা সাকারে বিশ্বাস করে না, আমাকে বলে কি না আমি যেগুলো দেখি সেগুলো সব মিথ্যা, শুধু আমার মাথার খেয়াল। কিন্তু ছেলেটি বড়ই ভাল; খুব সত্ত্বগুণী। প্রমাণ না পেয়ে সে কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। অনেক পড়াশুনা করেছে, আবার বিবেকবুদ্ধিও আছে।"

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে নরেন্দ্রনাথের পিতা সহসা পরলোকগমন করেন এবং নরেন্দ্রনাথ সাংসারিক জীবনে দারুণ সংকটে পতিত হন। তিনি তখন বি-এ পরীক্ষা দিয়াছেন, কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহির হয় নাই। যেদিন ঐ শোকাবহ ঘটনা ঘটে, সেদিন নরেন্দ্রনাথ নিমন্ত্রিত হইয়া বরাহনগরে এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়াছিলেন। সেখানে বয়স্যদের সহিত মিলিত হইয়া প্রায় মধ্যরাত্রি

পর্যন্ত ভজনসঙ্গীতাদি করিবার পর আহারান্তে বিছানায় শুইয়াছেন, কিন্তু নিদ্রিত হইয়া পড়েন নাই—এমন সময়ে সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল তাঁহার পিতাঠাকুর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া রাত্রি দশটার সময়ে সহসা ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায় এই আকস্মিক বিপদের বার্তা পাইয়া নরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ বাটী রওয়ানা হইয়া গেলেন।

শোকবারি নয়ন হইতে না শুকাইতেই, এমন কি, পিতার শ্রাদ্ধশান্তি সম্পন্ন করিবার পূর্বেই—নরেন্দ্রনাথকে অর্থোপার্জনের চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে হইল। এতকাল সাংসারিক কোনও বিষয়ের প্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপমাত্র করেন নাই। এখন অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, পরিবারের আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয়। মুক্তহস্ত বিশ্বনাথ কিছুই সঞ্চয় করিয়া যান নাই, বরঞ্চ কিছু ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন। সংসারের আয় বলিতে কিছুই নাই; অথচ মাতা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা-ভগ্নী, এই পাঁচ-সাতটি প্রাণীর ভরণপোষণ তো না করিলেই নয়। উপরন্তু, যে-সকল আত্মীয়স্বজনকে তাঁহার পিতা জীবিতকালে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহারাই এখন সময় বুঝিয়া নানারূপ অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত; এমন কি, বসতবাড়ী হইতেও নরেন্দ্রনাথকে বঞ্চিত করিতে উদ্যোগী! জন্মাবধি পরম সুখে লালিত-পালিত নরেন্দ্রনাথ যে সহসা কি ঘোরতর কষ্টের মধ্যে পড়িলেন, তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত। কাজকর্মের সন্ধানে তিনি নানা স্থানে যাইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তিন-চারি মাস গত হইল; কোন দিকেই কিছু সুবিধা হইয়া উঠিল না। ওদিকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত নরেন্দ্রের কষ্ট দেখিয়া ঈশান মুখুজ্যে প্রভৃতি ভক্তদিগকে বলিলেন, তাঁহারা যেন নরেনের জন্য একটা রোজগারের ব্যবস্থা করিয়া দেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এত চেষ্টা সত্ত্বেও কোনদিকেই সাফল্যের সূচনা দেখা গেল না। সেই যুগে নরেন্দ্রনাথের ন্যায় একজন কর্মঠ, গুণবান্, কৃতবিদ্য ব্যক্তির একটি সামান্য কর্ম পর্যন্ত জুটিল না—ইহা ভাবিলে বস্তুতঃ বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়। মনে হয় যেন নরেন্দ্রকে সংসার হইতে দূরে রাখিবার জন্য স্বয়ং বিধাতা ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জগদীশ্বরের প্রতি বিশ্বাস তাঁহার মনে দৃঢ় ও অটল ছিল। কিন্তু অবশেষে উহাতেও কঠিন আঘাত পড়িল। একদা প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙিতেই ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে শয্যাত্যাগ করিতেছেন, এমন সময়ে পাশের ঘর হইতে তাঁহার মাতৃদেবী উহা শুনিতে পাইয়া দুঃখে ধৈর্যহারা হইয়া

বলিয়া উঠিলেন—"চুপ কর্ ছোঁড়া, ছেলেবেলা থেকে কেবল ভগবান্, ভগবান্;—ভগবান্ তো সব কল্লেন!" জননীর মুখে এই কথা উচ্চারিত হইতে শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ চমকাইয়া উঠিলেন। স্তম্ভিত হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"ভগবান্ কি সত্যিই আছেন,—এবং যদি থাকেন, তবে আমাদের সকরুণ প্রার্থনায় তিনি কি সত্যিই কর্ণপাত করেন? যদি করেন, তবে এত যে প্রার্থনা করি, তার কোনও উত্তর নাই কেন? শিবের সংসারে এত অশিব কোথা হতে এল—মঙ্গলময়ের রাজত্বে এত প্রকার অমঙ্গল কেন?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথের মনে জগদীশ্বরের প্রতি প্রচণ্ড অভিমানের উদয় হইল; এমন কি, ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ জন্মিল। বন্ধুবান্ধবের সহিত কথাবার্তায় তিনি এই সন্দেহের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন অনেকে তিলকে তাল করিয়া নিন্দাচ্ছলে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, নরেন্দ্রনাথ নাস্তিক হইয়া গিয়াছেন; এমন কি, তাঁহার নৈতিক অধঃপতনও ঘটিয়াছে। খোঁচা দিয়া মজা দেখিবার জন্য এই সকল রটনা কেহ কেহ ইঙ্গিতে ইসারায় নরেন্দ্রকে জানাইলে পর তিনি অভিমানভরে তাঁহার স্বভাবসুলভ তেজস্বিতার সহিত নাস্তিকতার সমর্থনে এবং তথাকথিত নীতিধর্মের দোষত্রুটি দেখাইয়া জোর তর্ক করিতেন। উহার ফলে বন্ধুবর্গের মধ্যেও কেহ কেহ ভাবিতেন, এগুলি বুঝি সত্যই নরেনের অন্তরের কথা। নরেনের গুণমুগ্ধ বয়স্য ভবনাথ একদা কাঁদিতে কাঁদিতে ঠাকুরকে বলিলেন, 'মহাশয়! নরেনের এমন হবে, একথা যে স্বপ্নেরও অগোচর!' উহার উত্তরে ঠাকুর উত্তেজিতভাবে বলিয়াছিলেন—'চুপ কর্ শালারা—মা বলেছেন সে কখনও ওরূপ হতে পারে না। আর কখনও ওসব কথা আমাকে বললি তো তোদের মুখ দেখতে পারব না।' সঠিক জানিতে পারা না গেলেও অনুমিত হয় যে, নানাবিধ ঝঞ্ঝাটের দরুণ কিংবা হয়তো ইচ্ছাপূর্বকই নরেন্দ্রনাথ ঐ সময়ে অনেক দিন পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বর-গমনে বিরত ছিলেন।

দেখিতে দেখিতে কয়েক মাস কাটিয়া গেল—নরেনের কোনরূপ কর্মসংস্থান হইল না,—সাংসারিক দুঃখকষ্টেরও লাঘব ঘটিল না। একদা তিনি সারাদিন অনশনে থাকিয়া ও বৃষ্টিতে ভিজিয়া নানা স্থানে ভ্রমণের পর শ্রান্তদেহে ক্লান্তমনে সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিতেছিলেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে এরূপ অবসন্ন বোধ করিলেন যে, আর এক পা'ও অগ্রসর হইতে পারেন না। পার্শ্ববর্তী এক বাড়ীর

বারান্দায় তিনি শুইয়া পড়িলেন এবং তন্দ্রাবিষ্টের ন্যায় হইলেন। তাঁহার চিত্তে নানা প্রকারের চিন্তা আপনা হইতে উত্থিত ও লয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তাঁহার বোধ হইল যেন মনের ভিতরে একের পর এক পর্দা খুলিয়া যাইতেছে। শিবের সংসারে অশিব কেন, সৃষ্টির ভিতরে এত অযৌক্তিকতা ও অসামঞ্জস্য কেন, জগদীশ্বর পরম কারুণিক হইলেও তাঁহার রচিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এত দুঃখদৈন্য, এত নিষ্ঠুরতার প্রাদুর্ভাব কেন,—ইত্যাদি যে-সকল সমস্যার কোন সমাধান তিনি এ যাবৎ খুঁজিয়া পান নাই,—মনে হইল যেন সেই সকল দুরূহ সমস্যার প্রকৃত সমাধান অন্তরের গভীরতম প্রদেশে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন। প্রকৃতিস্থ হইয়া নরেন্দ্রনাথ যখন পুনরায় গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন, তখন দেহমনের সমস্ত অবসাদ দূরীভূত হইয়া তাঁহার সমগ্র হৃদয় এক অনির্বচনীয় শান্তি ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বাড়ী পৌছিয়া দেখিলেন, রজনী প্রভাত হইতে আর অল্পই বাকী।

সংসারের নিন্দা ও প্রশংসা এখন হইতে নরেন্দ্রনাথের নিকট নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া প্রতিভাত হইল। অর্থোপার্জন ও পরিবার প্রতিপালনের জন্য এতদিন তিনি ব্যগ্র ছিলেন। এখন সেই বাসনাও দূরে গেল, তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি হইল যে, এই কাজের জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই। পিতামহের ন্যায় সংসার-ত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসজীবন যাপনের এক প্রবল প্রেরণা তিনি মনের ভিতরে অনুভব করিলেন এবং ঐ উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য গোপনে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। গৃহত্যাগের নিমিত্ত একটি দিন মনে মনে স্থির করিয়াছেন, এমন সময়ে সংবাদ পাইলেন যে, ঠিক সেই দিবসেই ঠাকুর কলিকাতায় কোনও ভক্তের বাড়ীতে আসিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ উক্ত সংবাদ পাইয়া ভাবিলেন খুবই ভাল হইল, শ্রীগুরুর চরণ বন্দনাপূর্বক চিরকালের মত সংসার ত্যাগ করিবেন। তৎপরে নির্দিষ্ট দিনে ঠাকুরের দর্শনলাভের উদ্দেশ্যে সেই ভক্তের গৃহে গেলে পর ঠাকুর তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন—'তোকে আজ আমার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে যেতেই হবে।' নরেন্দ্রনাথ নানারূপ ওজর-আপত্তি তুলিয়া এড়াই-বার চেষ্টা করিলেও ঠাকুর কিছুতেই ছাড়িলেন না, নরেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া গাড়ীতে চড়িলেন। পথিমধ্যে বিশেষ কিছু কথাবার্তা হইল না। দক্ষিণেশ্বরে পৌছিয়া ঠাকুরের ঘরে অন্যান্য আগন্তুকদের সহিত নরেন্দ্রনাথও আসন গ্রহণ করিলেন। অল্পক্ষণ যাইতে না যাইতেই ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। ভাবাবিষ্ট

অবস্থায় তিনি সহসা উঠিয়া আসিয়া নরেন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া সজল নয়নে গাহিতে লাগিলেন*—

কথা কহিতে ডরাই
না কহিতেও ডরাই
(আমার) মনে সন্দ হয়
বুঝি তোমায় হারাই, হা—রাই।

অন্তরের প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস নরেন্দ্রনাথ এতক্ষণ কোনরকমে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন আর পারিলেন না—তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরলধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তাঁহাদের ঐরূপ অদ্ভুত আচরণে উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কেহ একজন উহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ঠাকুর মৃদু হাসিয়া কহিলেন—'আমাদের ও একটা হয়ে গেল।'

ঠাকুরের আদেশে রাত্রিতে নরেন্দ্রনাথকে দক্ষিণেশ্বরেই থাকিতে হইল। অপর লোকেরা চলিয়া যাইবার পর নরেনকে কাছে ডাকিয়া পরম স্নেহভরে কহিলেন—'জানি আমি, তুই মায়ের কাজের জন্যই এসেছিস্, সংসারে কখনই থাকতে পারবি না; কিন্তু আমি যতদিন আছি, আমার জন্যে থাক্।' এই কথা বলিয়াই হৃদয়াবেগে পুনরায় অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।

পরদিন নরেন্দ্রনাথ বাটী ফিরিবামাত্র সংসারের নানা দুশ্চিন্তা, সর্বোপরি পরিবারের ভরণপোষণের চিন্তা আসিয়া তাঁহার হৃদয় পুনরধিকার করিল। এটর্ণির আফিসে যৎসামান্য কাজকর্ম এবং ইংরেজী পুস্তকের বাংলা অনুবাদের দ্বারা অল্পস্বল্প রোজগার করিয়া কোনও প্রকারে সংসার চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও স্থায়ী এবং উপযুক্ত মাহিনার কাজ জুটিল না, অভাব অনটনও ঘুচিল না। এইভাবে কিছুকাল গত হইবার পর নরেন্দ্রনাথের সহসা মনে হইল, ঠাকুরের কথা তো ভগবান্ শুনেন, অতএব ঠাকুরের দ্বারা প্রার্থনা জানাইয়া কেন মা ও ভাইবোনদের ভরণপোষণের একটা ব্যবস্থা করিয়া লই না,—তাহা হইলে নিজেও অনন্যমনা হইয়া ঈশ্বরলাভে যত্নবান্ থাকিতে পারিব। নরেন্দ্রনাথের মনে সর্বদাই এই ভরসা ছিল যে, তাঁহার কোন আবদার ঠাকুর কখনই অগ্রাহ্য করিবেন না। সুতরাং তিনি অবিলম্বে দক্ষিণেশ্বরে ছুটিয়া গেলেন এবং

* 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'কারের মতে এই ব্যাপার ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ তারিখে (১৯শে ফাল্গুন, দোলপূর্ণিমা তিথিতে) ঘটিয়াছিল।

উক্তরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলেন। ঠাকুর কহিলেন, "ওরে, আমি যে ওসব কথা বলতে পারি না। তুই নিজে জানাস্ না কেন? মা'কে মানিস্ না, সেজন্যই তোর এত কষ্ট!" নরেন্দ্রনাথ বলিলেন—"আমি তো মা'কে জানি না, আপনি আমার জন্য মা'কে বলুন—বলতেই হবে; আমি কিছুতেই আপনাকে ছাড়ব না।" স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে ঠাকুর উত্তর করিলেন—"ওরে, আমি যে কতবার বলেছি, মা, নরেন্দ্রের দুঃখকষ্ট দূর কর; তুই মা'কে মানিস্ না, সেইজন্যেই তো মা শুনেন না। আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার, আমি বলছি আজ রাত্রে কালীঘরে গিয়ে, মা'কে প্রণাম করে তুই যা চাইবি, মা তোকে তাই দেবেন। মা আমার চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তি, ইচ্ছায় জগৎ প্রসব করেছেন—তিনি ইচ্ছা করলে কি না করতে পারেন!"

নরেন্দ্রনাথের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, ঠাকুর যখন বলিয়াছেন, তখন নিশ্চয় এবারে সকল দুঃখের অবসান ঘটিবে। ব্যাকুল আগ্রহে তিনি রাত্রির জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাত্রি এক প্রহর গত হইলে ঠাকুর যখন তাঁহাকে কালীমন্দিরে যাইতে কহিলেন, তখন তাঁহার বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল; মনের ভিতরে যুগপৎ ভয় ও ঔৎসুক্য লইয়া ধীরে ধীরে কালীমন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া ৺শ্রীশ্রীভবতারিণীর মূর্তির দিকে তাকাইবামাত্র তাঁহার মনে হইল সত্যই মা চিন্ময়ী, সত্যই তিনি জীবিতা, প্রত্যক্ষীভূতা—অনন্ত জ্ঞান, প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রস্রবণ-স্বরূপিণী। মায়ের এবংবিধ রূপদর্শনে নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে ভক্তিপ্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তিনি বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন —'মা, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান, ভক্তি দাও—কৃপা কর, যাতে সর্বদা তোমার দর্শনলাভে ধন্য হতে পারি।' নরেন্দ্রনাথ জগৎসংসার ভুলিয়া গেলেন; একমাত্র জগজ্জননী তাঁহার সকল অন্তঃকরণ জুড়িয়া রহিলেন।

ঠাকুর ব্যগ্রভাবে নরেন্দ্রের ফিরিয়া আসার অপেক্ষা করিতেছিলেন। নরেন্দ্র আসিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি রে, সাংসারিক অভাব দূর করবার জন্যে মাকে বলেছিস্ তো?" এই প্রশ্নে নরেন্দ্রনাথের যেন চমক ভাঙ্গিল; তিনি উত্তর করিলেন—"না, মহাশয়! এ কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম, এখন কি উপায়?" ঠাকুর তদুত্তরে কহিলেন—"যা, যা, ফের যা—গিয়ে ঐ কথা জানিয়ে আয়।" নরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ গেলেন;

কিন্তু আবার পূর্বেকার ন্যায় ঘটিল। নিরস্ত না হইয়া ঠাকুর তৃতীয়বার তাঁহাকে কালীঘরে পাঠাইলেন, তখনও সেই একই ব্যাপার। সেবারে প্রাণপণ চেষ্টায় নরেন্দ্রনাথ বিষয়টি মনে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু মুখ দিয়া উহা বাহির করিতে গিয়া লজ্জায় অভিভূত হইলেন। তিনি ভাবিলেন —"সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ীকে এ কি তুচ্ছ কথা বলতে এসেছি! ঠাকুর যে বলেন রাজাকে সামনে পেয়ে লাউ-কুমড়ো ভিক্ষে করা—আমারও দেখছি তেমনি বুদ্ধি হয়েছে। ছি, ছি, এ কি হীন বুদ্ধি!" মায়ের নিকট কোন পার্থিব সুখসম্পদ আর চাওয়া হইল না। পুনঃ পুনঃ বিবেকবৈরাগ্য ও জ্ঞানভক্তি যাচ্ঞা করিয়া এবং দেবীর প্রসাদলাভ করিয়া নরেন্দ্রনাথ মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

প্রাঙ্গণ পার হইয়া ঠাকুরের ঘরের দিকে যাইতে যাইতে নরেন্দ্রনাথ বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, "এ নিশ্চয়ই ঠাকুরের লীলাখেলা; নতুবা তিন তিন বার চেষ্টা করিয়াও জগজ্জননীকে সামান্য একটি প্রার্থনা জানাইতে পারিলাম না কেন?" ঠাকুরের নিকটে পৌঁছিয়াই অনুযোগের স্বরে তাঁহাকে কহিলেন—"না মহাশয়! এবারেও পারি নি। নিশ্চয়ই আপনি আমাকে নিয়ে খেলছেন এবং বার বার ভুল করিয়ে দিচ্ছেন। এবারে আমার হয়ে আপনাকেই মায়ের নিকট বলতে হবে; তা নইলে আমার মা ও ভাইয়েরা যে ভাত-কাপড়ের অভাবেই মারা যাবে।" উহা শুনিয়া ঠাকুর কহিলেন— "ওরে, আমি যে কারো জন্যে ওরূপ প্রার্থনা কখনো করি নি; ওসব কথা যে আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না। তোকে বললুম, মা'র কাছে যা চাইবি তাই পাবি। তুই চাইতে পারলি না, তোর অদৃষ্টে সংসারসুখ নেই, তা আমি কি করব!" নরেন্দ্রনাথ তখন নাছোড়বান্দা হইয়া কহিলেন—"তা হবে না মহাশয়! আমার জন্য আপনাকে ওকথা বলতেই হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি বললেই আমার মা-ভায়ের আর কষ্ট থাকবে না।" নরেন্দ্র যখন কিছুতেই ছাড়িলেন না, তখন ঠাকুর অগত্যা বলিলেন—"আচ্ছা যা, তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না।"

উপর্যুক্ত ঘটনা নরেন্দ্রনাথের জীবনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনয়ন করিল। ইতিপূর্বে তিনি সাকারোপাসনাকে হীনচক্ষে দেখিতেন, এমন কি, দেবদেবীর মূর্তির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন। এবারে তিনি

শ্রীশ্রীভবতারিণীর পাষাণী মূর্তিতে চিন্ময়ীর দর্শন পাইয়া সাকারোপাসনার মর্ম উপলব্ধি করিলেন ও উহাতে আস্থাবান হইলেন। উহার ফলে ঠাকুর যে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাহা জনৈক ভক্তের* প্রদত্ত একটি বিবরণ হইতে জানা যায়। উক্ত ঘটনার ঠিক পরদিন মধ্যাহ্নে ভক্তটি দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। গিয়া দেখিতে পাইলেন, ঠাকুর একাকী ঘরের ভিতরে বসিয়া আছেন এবং নরেন্দ্রনাথ বাহিরে বারান্দায় শুইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। ঠাকুরের চোখে মুখে যেন আনন্দ আর ধরে না! ভক্তটি নিকটে গিয়া প্রণাম করিতেই ঠাকুর কহিলেন—"ওরে দেখ, ঐ ছেলেটি বড় ভাল, ওর নাম নরেন্দ্র, আগে মা'কে মান্‌ত না, কাল মেনেছে। কষ্টে পড়েছে, তাই মা'র কাছে টাকাকড়ি চাইবার কথা বলে দিয়েছিলাম, তা কিন্তু চাইতে পারলে না,—বলে, 'লজ্জা করলে!' মন্দির থেকে এসে আমাকে বললে মা'র গান শিখিয়ে দাও—'মা, ত্বং হি তারা' গানটি শিখিয়ে দিলাম। কাল সমস্ত রাত ঐ গানটা গেয়েছে, তাই এখন ঘুমুচ্ছে। (আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে) নরেন্দ্র কালী মেনেছে, বেশ হয়েছে,—না?" তাঁহার ঐ কথা লইয়া বালকের ন্যায় আনন্দ দেখিয়া বৈকুণ্ঠনাথ উত্তর করিলেন, 'হাঁ মহাশয়, বেশ হইয়াছে।' কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'নরেন্দ্র মাকে মেনেছে! বেশ হয়েছে—কেমন?' ঐরূপে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বারংবার ঐ কথা বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (দিব্যভাব)' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ঐ ভক্তটির প্রদত্ত বিবরণ হইতে আরও কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল—"নিদ্রাভঙ্গে বেলা প্রায় ৪টার সময় নরেন্দ্র গৃহমধ্যে ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। মনে হইল এইবার তিনি তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিবেন। ঠাকুর কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াই ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহার গা ঘেঁষিয়া একপ্রকার তাঁহার ক্রোড়ে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন (আপনার শরীর ও নরেন্দ্রের শরীর পর পর দেখাইয়া), 'দেখছি কি—এটা আমি, আবার এটাও আমি; সত্য বলছি—কিছুই তফাৎ বুঝতে পারচি না। যেমন গঙ্গার জলে একটা লাঠি ফেলায় দুটো ভাগ দেখাচ্ছে,—সত্য সত্য কিন্তু ভাগাভাগি নেই, একটাই রয়েছে! বুঝতে পাচ্চ? তা, মা ছাড়া আর কি আছে বল,

* বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল।

কেমন ?' এইরূপে নানা কথা কহিয়া বলিয়া উঠিলেন—'তামাক খাব।' আমি ত্রস্ত হইয়া তামাক সাজিয়া তাঁহার হুঁকাটি তাঁহাকে দিলাম। দুই এক টান টানিয়াই তিনি হুঁকাটি ফিরাইয়া দিয়া 'কলকেতে খাব' বলিয়া কলকেটি হাতে লইয়া টানিতে লাগিলেন। দুই চারি টান টানিয়া উহা নরেন্দ্রের মুখের কাছে ধরিয়া বলিলেন, 'খা, আমার হাতেই খা।' নরেন্দ্র ঐ কথায় বিষম সঙ্কুচিত হওয়ায় বলিলেন, 'তোর তো ভারী হীন বুদ্ধি, তুই আমি কি আলাদা ? এটাও আমি, ওটাও আমি।' ঐ কথা বলিয়া নরেন্দ্রনাথকে তামাক খাওয়াইয়া দিবার জন্য পুনরায় নিজহাত দুখানি তাঁহার মুখের সম্মুখে ধরিলেন। অগত্যা নরেন্দ্র ঠাকুরের হাতে মুখ লাগাইয়া দুই তিন বার তামাক টানিয়া নিরস্ত হইলেন। ঠাকুর তাঁহাকে নিরস্ত দেখিয়া স্বয়ং পুনরায় তামাক সেবন করিতে উদ্যত হইলেন। নরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—'মহাশয়, হাতটা ধুইয়া তামাক খান।' কিন্তু সে কথা শুনে কে ? 'দূর শালা, তোর তো ভারী ভেদবুদ্ধি!' এই কথা বলিয়া ঠাকুর উচ্ছিষ্ট হস্তেই তামাক টানিতে ও ভাবাবেশে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। খাদ্যদ্রব্যের অগ্রভাগ কাহাকেও দেওয়া হইলে যে ঠাকুর উহা উচ্ছিষ্টজ্ঞানে কখনও খাইতে পারিতেন না, নরেন্দ্রের উচ্ছিষ্ট সম্বন্ধে তাঁহাকে অন্য ঐরূপ ব্যবহার করিতে দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, নরেন্দ্রনাথকে ইনি কতদূর আপনার জ্ঞান করেন!"

কতিপয় গৃহী ভক্ত

রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ দুই-তিন জন গৃহী ভক্তের পরিচয় পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। পরমহংসদেবের কথা কলিকাতার লোকসমাজে প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক গৃহস্থ ভক্ত তাঁহার শরণাপন্ন হইতে আরম্ভ করেন। উঁহাদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েক জনের যৎসামান্য পরিচয় ও ঠাকুরের নিকট আগমনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই অধ্যায়ে প্রদত্ত হইবে।

বলরাম বসু—সর্বপ্রথমেই আমরা বলিব ৺বলরাম বসু মহাশয়ের কথা। বাগবাজারের এক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পরিবারে বলরামের জন্ম। ধনৈশ্বর্য এবং কৌলীন্যের মর্যাদা উক্ত পরিবারের যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক ছিল বদান্যতা ও ধর্মপরায়ণতার খ্যাতি। ভদ্রাসন-বাটীতে ৺শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং নিত্য তাঁহার সেবাপূজা হইত। উড়িষ্যার 'কোঠার' নামক স্থানে এক প্রকাণ্ড জমিদারির তাঁহারা ছিলেন মালিক এবং সেখানে 'শ্যামচাঁদ' নামক বিগ্রহের পূজাভোগের সমস্ত ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ৺শ্রীবৃন্দাবনধামে কুঞ্জনির্মাণ-পূর্বক ৺শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের মূর্তি স্থাপনা করাইয়াছিলেন। বলরামের পিতা বার্ধক্যে বৃন্দাবনেই থাকিতেন। বলরামের মধ্যে পিতৃপুরুষাগত হরিভক্তির ধারা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান ছিল। তিনি সংসারে কখনও লিপ্ত হন নাই। জমিদারি-পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার জ্যেষ্ঠভ্রাতার উপর ছাড়িয়া দিয়া একটি মাসোহারা মাত্র তিনি লইতেন এবং সাংসারিক ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্ত থাকিবার উদ্দেশ্যে দূরে দূরে থাকিতেন, কখনও বা তীর্থস্থানসমূহে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সাধনভজনে ও বৈষ্ণবশাস্ত্রের আলোচনায় তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত।

একদা ৺পুরীধামে অবস্থান-কালে কেশবচন্দ্রের পত্রিকাপাঠে শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় জানিতে পারিয়া তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত বলরামের হৃদয়ে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মে। ঠিক ঐ সময়ে (১৮৮২ খ্রীঃ) কলিকাতার জনৈক বন্ধুর নিকট হইতেও একখানি চিঠি তিনি প্রাপ্ত হন। বন্ধুটি লিখিয়াছেন যে, দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার উপদেশবাক্য শুনিয়া তিনি একেবারে মুগ্ধ হইয়াছেন,—বলরাম যেন শীঘ্র আসিয়া উক্ত মহাপুরুষকে

একবার দেখিয়া যান। এই পত্র পাইয়া বলরামের উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। দৈবক্রমে সেই সময়ে বলরামের কন্যার বিবাহও স্থিরীকৃত হয়। সুতরাং, কলিকাতায় আসিতে তাঁহার কালবিলম্ব ঘটিল না।

কলিকাতায় পৌছিয়া তৎপরদিনই অপরাহ্ণে বলরাম দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও উক্ত দিবসে সদলবলে শ্রীরামকৃষ্ণ-সকাশে গিয়াছিলেন। অতএব, ঠাকুরের ঘরখানি লোকে ভর্তি ছিল। বলরাম চুপচাপ এক কোণে বসিয়া তাঁহার বাক্যসুধা পান করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইবার পর ব্রাহ্মভক্তদিগকে যখন জলযোগের নিমিত্ত অন্যত্র ডাকিয়া লওয়া হইল, তখন ঠাকুর বলরামকে কাছে ডাকিয়া সাদর সম্ভাষণপূর্বক তাঁহার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি না জানিতে চাহিলেন। উহাতে বলরামের সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। তিনি প্রশ্ন করিলেন—

'মহাশয়! ভগবান্ কি সত্যই আছেন?'

ঠাকুর বলিলেন,—'হাঁ, নিশ্চয়ই আছেন।'

বলরাম। 'তাঁকে কি পাওয়া যায়?'

ঠাকুর। 'যায় বই কি। যে ব্যক্তি তাঁকে আপন হতেও আপন বলে জানে, তার কাছে তিনি ধরা দেন। দুএকবার মাত্র ডেকে যদি তাঁর দেখা না পাও, তা থেকে মনে করা উচিত নয় যে তিনি নেই।'

বলরাম। 'এত প্রার্থনা করে এবং বার বার ডেকেও কেন তবে তাঁর দেখা পাই নে?'

ঠাকুর। 'নিজের সন্তানের প্রতি যেমন টান, তাঁর প্রতিও তেমন টান কি তোমার মনের মধ্যে কখনও হয়েছে?'

বলরাম। 'না, মহাশয়! তেমন টান তো কখনও হয় নি।'

ঠাকুর। 'তবে আর পাওনি বলে কেন নালিশ করছ? আপন হতেও আপনার জ্ঞানে তাঁকে ডাক। আমি তোমাকে বল্‌ছি ভক্তের প্রতি তাঁর বড়ই ভালবাসা। ভক্তকে দেখা না দিয়ে তিনি থাকতে পারেন না। মানুষ তাঁকে পুরাপুরি চাইবার আগেই তিনি নিজে এসে দেখা দেন। তাঁর চেয়ে এমন আপনার লোক এবং এমন দয়াল আর কে আছে?'

কথাগুলি বলরামের অন্তর স্পর্শ করিল। তৎপূর্বে ভগবানের সম্পর্কে এমন নিশ্চয়তার সহিত, এমন জোরের সহিত কাহাকেও কথা বলিতে তিনি শুনেন

নাই। বলরামের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না যে, ইনি বস্তুতঃ ব্রহ্মজ্ঞানী পরমহংস। ঠাকুরের পায়ে তিনি মনপ্রাণ সঁপিয়া দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সস্নেহ ব্যবহারও তাঁহাকে যারপরনাই মুগ্ধ করিয়াছিল। বলরাম পদধূলি লইয়া বিদায় চাহিলে ঠাকুর তাঁহাকে কহিলেন—'শীগ্‌গীরই আবার এসো কিন্তু!'

বাটী ফিরিয়া এক মুহূর্তের জন্যও বলরাম দক্ষিণেশ্বরের কথা ভুলিতে পারিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য মূর্তি সারাক্ষণ যেন তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল এবং তাঁহার অমৃতবর্ষী কণ্ঠস্বর কাণে বাজিতে থাকিল। কোন রকমে রাত্রি কাটাইয়া পরদিন সকালেই তিনি পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। পৌঁছিয়া দেখিলেন. ঠাকুর একাকী বসিয়া আছেন,—অপর কোনও লোকজন তথায় নাই। বলরাম নিকটে যাইয়া প্রণাম করিতেই ঠাকুর পরম সমাদরে তাঁহাকে বসাইয়া প্রশ্নচ্ছলে তাঁহার ঘরবাড়ী ও পরিবার-বর্গের সমস্ত পরিচয় লইলেন এবং তৎপরে কহিলেন—'দেখ, মা জানিয়েছেন তুমি এখানকার লোক, এবং এখানকার অনেক জিনিস তোমার কাছে গচ্ছিত রয়েছে। যখনি আস একটু কিছু হাতে করে নিয়ে আসবে।' ভক্তদের প্রতি ঠাকুরের নির্দেশ থাকিত যেন খালি হাতে কখনও না আসেন। দেবতা এবং সাধুসন্ন্যাসী দর্শন করিতে গেলে একেবারে খালি হাতে যাইতে নাই, ইহাই আমাদের সামাজিক প্রথা। ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে অনেক দরিদ্র ব্যক্তিও ছিলেন। উঁহাদের মধ্যে যাহাতে কাহারো কোন কষ্ট না হয়, তৎপ্রতিও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। দুএক পয়সার মিষ্টদ্রব্য আনিলেই তিনি পরম সন্তুষ্ট হইতেন। ক্ষেত্রবিশেষে আবার কখনও বা বলিতেন, "প্রতিবারে এক পয়সা খরচ করবে কেন গো? এক পয়সার সুপুরি কিনে টুক্‌রো করে রেখে দেবে। আসবার সময়ে দুচার টুকরো নিয়ে এলেই যথেষ্ট হবে।"

উপহার-দ্রব্য আনিবার জন্য ঠাকুরের নির্দেশ পাইয়া বলরামের আনন্দের সীমা রহিল না। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া বাজার হইতে কিছু মিষ্টান্ন আনয়ন-পূর্বক তিনি প্রভুকে নিবেদন করিলেন। যত দিন যাইতে লাগিল, উভয়ের সম্পর্ক ততই ঘনিষ্ঠতর হইল। ঠাকুরের রসদ্দারদিগের মধ্যে বলরামও একজন। ঠাকুরের জীবনের শেষ চারি বৎসরকাল ব্যাপিয়া বস্তুতঃ বলরামই তাঁহার আহার্যের সমস্ত উপকরণ নিয়মিতভাবে জোগাইয়াছিলেন।

গৃহী ভক্তদের মধ্যে বলরামকে ঠাকুর কত যে ভালবাসিতেন, তাহা ভাষায়

ব্যক্ত করা অসম্ভব। কলিকাতায় আসিলে সম্ভবপক্ষে বলরামকে না দেখিয়া তিনি বড় একটা দক্ষিণেশ্বরে ফিরিতেন না। পূর্বাহ্ণে আসিলে মধ্যাহ্নভোজন প্রায়শঃ বলরামের বাড়ীতেই সম্পন্ন করিতেন। তিনি বলিতেন—'বলরামের অন্ন শুদ্ধ অন্ন—ওদের পুরুষানুক্রমে ঠাকুরসেবা ও অতিথি-ফকিরের সেবা—ওর বাপ সব ত্যাগ করে বৃন্দাবনে বসে হরিনাম করছে—ওর অন্ন আমি খুব খেতে পারি, মুখে দিলেই যেন আপনা হতে নেমে যায়।' রামকান্ত বসু স্ট্রীটে বলরামের বাড়ীতে ঠাকুর অনেকবার গিয়াছিলেন এবং বহু লোক সেখানে ঠাকুরের দর্শনলাভে ধন্য হইয়াছিল। ঠাকুরের পুণ্য উপস্থিতিতে, তাঁহার নানা উপদেশবাক্যে ও সুমধুর সঙ্গীতে তথায় আনন্দের হাট বসিয়া যাইত।

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে বলরাম নিজ বাটীতে উৎসব করিতেন। কিন্তু সকলই ভক্তির ব্যাপার, বাহ্য আড়ম্বর তাহাতে থাকিত না। ৺শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিগ্রহ একটি ক্ষুদ্র রথে বসাইয়া দোতলার চকমিলানো বারান্দায় ঐ রথ টানা হইত। শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত থাকিয়া রথের আগে আগে নৃত্য করিতেন, সেই দেবনৃত্যের ছন্দে ও হরিসংকীর্তনের মধুর রোলে সমবেত নরনারীর হৃদয়ে আনন্দের বন্যা বহিয়া যাইত।

ঠাকুর উৎসাহভরে বলিতেন, 'বলরামের পরিবার সব একসুরে বাঁধা।' কর্তাগিন্নী হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে পর্যন্ত সকলেই ছিল ঠাকুরের ভক্ত। ভগবানের নাম না করিয়া কেহই জলগ্রহণ করিত না। দেবতার সেবা, অতিথি-সৎকার প্রভৃতি ব্যাপারে আবাল-বৃদ্ধবনিতা—কাহারও আগ্রহের সীমা ছিল না। সাধারণতঃ কোন বৃহৎ পরিবারে এমনটি নিতান্ত দুর্লভ। বলরামের পরিবারবর্গের ভক্তিশ্রদ্ধার গুণে তাঁহাদের সহিত ঠাকুর অতি নিবিড় প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীকে ঠাকুর কৌতুকচ্ছলে 'মা কালীর কেল্লা' বলিয়া নির্দেশ করিতেন। আর বলরামভবন তাঁহার দ্বিতীয় কেল্লা বলিয়া অভিহিত হইত। তিনি কলিকাতায় আসিলে ওখানেই প্রায়শঃ তাঁহার 'রাজদরবার' বসিত।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে এবং তাহার বাহিরেও ইনি 'মাষ্টার মহাশয়' অথবা 'শ্রীম—' নামেই সমধিক পরিচিত। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' নামক অমূল্য গ্রন্থের ইনিই রচয়িতা।

মহেন্দ্রনাথ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষা কৃতিত্বের সহিত পাস করিয়া তিনি অধ্যাপনাকার্যে ব্রতী হন। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত যখন তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎকার হয়, তখন তিনি শ্যামবাজার শাখাবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। মহেন্দ্রনাথের স্বভাব বাল্যকাল হইতেই অতীব শান্তশিষ্ট এবং ধর্মপরায়ণ ছিল; যৌবনে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন।

দক্ষিণেশ্বরের সন্নিকটবর্তী বরাহনগরে ছিল মহেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বাড়ী। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের কোনও এক রবিবারে তিনি সেখানে গিয়াছিলেন। বৈকালে সিদ্ধেশ্বর মজুমদার নামক জনৈক বন্ধুর সহিত বেড়াইতে বাহির হন। অনেক বড়লোকের বাগানবাড়ী তখন ঐ অঞ্চলে ছিল। দুই বন্ধুতে সেই সকল মনোরম উদ্যান দেখিতে দেখিতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর একেবারে সন্নিকটে যাইয়া পৌছেন। তখন বন্ধুটি মাষ্টারকে কহিলেন যে, কাছেই রাণী রাসমণির বাগান, আর সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস থাকেন। একথা শুনিয়া মাষ্টারের মনে বড়ই কৌতূহল জন্মিল; বন্ধুর সহিত তিনি পরমহংসদেবকে দেখিতে চলিলেন।

সদর ফটক দিয়া প্রাঙ্গণে ঢুকিয়া মাষ্টার ও সিধু (সিদ্ধেশ্বর) সরাসরি পরমহংসদেবের ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুর তক্তাপোশের উপর বসিয়া ভগবৎকথা কহিতেছেন, আর ঘরভর্তি লোক নিস্তব্ধ হইয়া সেই কথামৃত পান করিতেছেন। মাষ্টার দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বিমুগ্ধভাবে সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল "যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎকথা কহিতেছেন, আর সর্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে। অথবা যেন শ্রীচৈতন্য পুরীক্ষেত্রে রামানন্দ, স্বরূপাদি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন ও ভগবানের নামগুণ কীর্তন করিতেছেন।" অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ এই নয়নমনোমুগ্ধকর দৃশ্য উপভোগ এবং ঠাকুরের মুখনিঃসৃত বাক্যসুধা পান করিবার পর মাষ্টার ভাবিলেন,—অন্ধকার হইবার পূর্বে চতুর্দিক ঘুরিয়া স্থানটি একটু দেখিয়া লইবেন। কিন্তু ঘরের বাহিরে আসিতে না আসিতেই আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিল। বিভিন্ন মন্দিরের সন্ধ্যারতি দেখিয়া পরম প্রীতমনে দুই বন্ধুতে পুনরায় ঠাকুরের ঘরের সম্মুখে ফিরিয়া গিয়া দেখিলেন লোকজন কেহই নাই, ঘরের দরজা বন্ধ। মাষ্টার ইংরেজী শিখিয়াছেন, ইংরেজী আদব-কায়দাও দুচারটি অভ্যাসের সামিল হইয়া গিয়াছে। সুতরাং, বিনা অনুমতিতে দরজা

ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিতে ইতস্ততঃ করিলেন। দ্বারদেশে একটি ঝি (বৃন্দা) দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,* 'হ্যাঁ গা, সাধুটি কি এখন এর ভিতর আছেন?'

বৃন্দা—হাঁ, এই ঘরের ভিতর আছেন।

মাষ্টার—ইনি এখানে কতদিন আছেন?

বৃন্দা—তা' অনেক দিন আছেন।

মাষ্টার—আচ্ছা, ইনি কি খুব বই-টই পড়েন?

বৃন্দা—আর বাবা বই-টই। সব ওঁর মুখে!

মাষ্টার পড়াশুনাই ভালবাসেন, উহাকেই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বই পড়েন না শুনিয়া আরও অবাক্ হইলেন।

মাষ্টার—আচ্ছা, ইনি বুঝি এখন সন্ধ্যা করবেন? আমরা কি এ ঘরের ভিতর যেতে পারি? তুমি একবার খবর দিবে?

বৃন্দা—তোমরা যাও না বাবা! গিয়ে ঘরে বোসো।

ভরসা পাইয়া দুই বন্ধুতে ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ একাকী তক্তাপোশটির উপর বসিয়া আছেন, নয়নযুগল অর্ধনিমিলিত। ঠাকুর উভয়কে বসিতে বলিয়া 'কোথায় থাক, কি কর, বরাহনগরে কি করতে এসেছ' প্রভৃতি প্রশ্ন থাকিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। মাষ্টার লক্ষ্য করিলেন যে, দুএকটি কথা বলিয়াই ঠাকুর কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছেন। পরে শুনিলেন, এরই নাম ভাব। যেমন কেহ ছিপ হাতে করিয়া মাছ ধরিতে বসিয়াছে। মাছ আসিয়া টোপ খাইতে থাকিলে ফাত্না যখন নড়ে, সে ব্যক্তি যেমন শশব্যস্ত হইয়া ছিপ হাতে করিয়া ফাত্নার দিকে একদৃষ্টে, একমনে চাহিয়া থাকে, কাহারও সহিত কথা কয় না—এ ঠিক সেইরূপ ভাব। পরে শুনিলেন ও দেখিলেন, সন্ধ্যার পর ঠাকুরের ঐরূপ ভাবান্তর হয়, কখন কখন তিনি একেবারে বাহ্যশূন্য হন।

মাষ্টারের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, কথাবার্তার পক্ষে এ উপযুক্ত সময়

---

* এই অনুচ্ছেদের অবশিষ্টাংশের অনেক কথাই, হয় অক্ষরশঃ নতুবা ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থ হইতে গৃহীত। বহুসংখ্যক কোটেশন চিহ্নদ্বারা পৃষ্ঠাগুলিকে ভারাক্রান্ত না করিবার উদ্দেশ্যে এই স্বীকৃতি একসঙ্গে এখানেই প্রদত্ত হইল।

নহে। সুতরাং তাঁহারা বিদায় লইলেন। যাইবার সময়ে ঠাকুর কহিলেন, 'আবার এসো'। ফিরিবার পথে মাষ্টার ভাবিতে লাগিলেন—এ সৌম্য কে, যাঁহার কাছে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে? বই না পড়িলে কি মানুষ মহৎ হয়? কি আশ্চর্য, আবার আসিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইনিও বলিয়াছেন —আবার এসো। কাল কি পরশু সকালে আসিব।

পরদিন বেলা একপ্রহর না হইতেই মাষ্টার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া হাজির হইলেন। ঠাকুর তখন বারান্দায় কামাইতে বসিয়াছেন। সেই অবস্থায়ই কথাবার্তা আরম্ভ হইল। প্রথমে মাষ্টারের পরিচয় আরও বিশদরূপে লইয়া কেশবচন্দ্রের কথা পাড়িলেন। তৎপরে মাষ্টারকে সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি বিবাহিত কি না ও ছেলেপিলে হইয়াছে কি না। মাষ্টার বিবাহিত এবং একটি ছেলেও জন্মিয়াছে জানিয়া ঠাকুর একটু আপসোস করিলেন,— মাষ্টারেরও লজ্জা বোধ হইল।

মাষ্টারের অহঙ্কার চূর্ণ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কৃপাদৃষ্টি করিয়া সস্নেহে বলিতে লাগিলেন,—'দেখ, তোমার লক্ষণ ভাল ছিল, আমি কপাল, চোখ এসব দেখলে বুঝতে পারি। ... আচ্ছা, তোমার পরিবার কেমন? বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি?'

মাষ্টার—আজ্ঞা ভাল, কিন্তু অজ্ঞান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)—আর তুমি জ্ঞানী?

তিনি জ্ঞান কাহাকে বলে, অজ্ঞান কাহাকে বলে, এখনও জানেন নাই। এখন পর্যন্ত জানিতেন যে, লেখাপড়া শিখিলে ও বই পড়িতে পারিলে জ্ঞান হয়। এই ভ্রম পরে দূর হইয়াছিল; তখন শুনিলেন যে, ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে না জানার নামই অজ্ঞান। ঠাকুর বলিলেন—'তুমি কি জ্ঞানী?' মাষ্টারের অহঙ্কারে আবার বিশেষ আঘাত পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, তোমার 'সাকারে' বিশ্বাস, না 'নিরাকারে'?

মাষ্টার (অবাক্ হইয়া, স্বগত)—সাকারে বিশ্বাস থাকিলে কি নিরাকারে বিশ্বাস হয়? ঈশ্বর নিরাকার, এ বিশ্বাস থাকিলে, ঈশ্বর সাকার এ বিশ্বাস কি হইতে পারে? বিরুদ্ধ অবস্থা দুটাই কি সত্য হইতে পারে? সাদা জিনিস দুধ কি আবার কালো হতে পারে?

মাষ্টার—আজ্ঞা নিরাকার—আমার এইটি ভাল লাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বেশ। একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হ'ল। নিরাকারে বিশ্বাস, তাতো ভালই। তবে এ বুদ্ধি কোরো না যে,—এইটি কেবল সত্য, আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো যে নিরাকারও সত্য, আবার সাকারও সত্য। তোমার যেটি বিশ্বাস, সেইটিই ধ'রে থাকবে।

দুইই সত্য, এই কথা বার বার শুনিয়া মাষ্টার অবাক্ হইয়া রহিলেন। একথা তো তাঁহার পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে নাই!

তাঁহার অহঙ্কার তৃতীয়বার চূর্ণ হইতে চলিল; কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। তাই আবার একটু তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মাষ্টার—আজ্ঞা, তিনি সাকার, এ বিশ্বাস যেন হ'ল। কিন্তু মাটির প্রতিমা তিনি তো ন'ন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—মাটি কেন গো! চিন্ময়ী প্রতিমা।

মাষ্টার "চিন্ময়ী প্রতিমা" বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'আচ্ছা, যারা মাটির প্রতিমা পূজা করে, তাদের তো বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়, আর প্রতিমার সম্মুখে ঈশ্বরকে উদ্দেশ করে পূজা করা উচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)—তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক কথা! কেবল লেকচার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া। আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নাই। তুমি বুঝাবার কে? যাঁর জগৎ, তিনি বুঝাবেন। যিনি এই জগৎ করেছেন, চন্দ্র সূর্য মানুষ জীবজন্তু করেছেন, জীবজন্তুদের খাবার উপায়, পালন করবার জন্য মা-বাপ করেছেন, মা-বাপের স্নেহ করেছেন, তিনিই বুঝাবেন। তিনি এত উপায় করেছেন, আর এ উপায় করবেন না? যদি বুঝাবার দরকার হয়, তিনিই বুঝাবেন। তিনি তো অন্তর্যামী। যদি ঐ মাটির প্রতিমা পূজা করাতে কিছু ভুল হয়ে থাকে, তিনি কি জানেন না—তাঁকেই ডাকা হচ্ছে? তিনি ঐ পূজাতেই সন্তুষ্ট হন। তোমার ওর জন্য মাথা ব্যথা কেন? তুমি নিজের যাতে জ্ঞান হয়, ভক্তি হয়, তার চেষ্টা কর।

এইবার তাঁহার অহঙ্কার বোধ হয় একেবারে চূর্ণ হইল।

তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ইনি যা বলেছেন তাতো ঠিক! আমার বুঝাতে যাবার কি দরকার? আমি কি ঈশ্বরকে জেনেছি—না আমার তাঁর উপর ভক্তি হয়েছে? 'আপনি শুতে স্থান পায় না, শঙ্করাকে ডাকে!' জানি না,

শুনি না, পরকে বুঝাতে যাওয়া বড়ই লজ্জার কথা ও হীনবুদ্ধির কাজ! একি অঙ্কশাস্ত্র, না ইতিহাস, না সাহিত্য যে, পরকে বুঝাবে? এ যে ঈশ্বরতত্ত্ব! ইনি যা বলছেন, মনে বেশ লাগছে।

ঠাকুরের সহিত তাঁহার এই প্রথম ও শেষ তর্ক।

ঈশ্বরের প্রতি কি করিয়া ভক্তিপ্রেম হয়, গৃহীর পক্ষে কিভাবে সংসারে থাকা উচিত—এই দুইটি বিষয়ে অতঃপর মাষ্টার শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপদেশ যাচ্ঞা করিলেন।

মাষ্টার (বিনীতভাবে)—ঈশ্বরে কি করে মন হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরের নামগুণ-গান সর্বদা করতে হয়। আর সৎসঙ্গ—ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, এদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভিতর ও বিষয়-কাজের ভিতর রাত দিন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না! মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জন না হলে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন।

যখন চারাগাছ থাকে, তখন তার চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে।

ধ্যান করবে মনে, কোণে ও বনে। আর সর্বদা সদসৎ বিচার করবে। ঈশ্বরই সৎ, কিনা নিত্যবস্তু; আর সব অসৎ, কিনা অনিত্য—এই বিচার করতে করতে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ করবে।

মাষ্টার (বিনীতভাবে)—সংসারে কিরকম করে থাকৃতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সব কাজ করবে, কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক! কিন্তু মনে জানবে যে, তারা তোমার কেউ নয়।

বড়মানুষের বাড়ীর দাসী সব কাজ করছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ীর দিকে মন পড়ে আছে। আবার সে মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের মত মানুষ করে, বলে, 'আমার রাম' 'আমার হরি'। কিন্তু মনে বেশ জানে—এরা আমার কেউ নয়।

কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়, কিন্তু তার মন কোথায় পড়ে আছে জান?—আড়ায় পড়ে আছে। যেখানে তার ডিমগুলি আছে। সংসারের সব কর্ম করবে, কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখবে।

ঈশ্বরে ভক্তি লাভ না করে যদি সংসার করতে যাও, তাহলে আরও জড়িয়ে পড়বে। বিপদ, শোক, তাপ, এসবে অধৈর্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয়চিন্তা করবে, ততই আসক্তি বাড়বে।

তেল হাতে মেখে তবে কাঁটাল ভাঙ্গতে হয়। তা না হলে হাতে আঠা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।

কিন্তু এই ভক্তি লাভ করতে হলে নির্জন হওয়া চাই! মাখন তুলতে গেলে নির্জনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না। তারপর নির্জনে বসে সব কাজ ফেলে, দই মন্থন করতে হয়। তবে মাখন তোলা যায়।

আবার দেখ, এই মনে নির্জনে ঈশ্বর-চিন্তা করলে, জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি লাভ হয়। কিন্তু সংসারে ফেলে রাখলে ঐ মন নীচু হয়ে যায়। সংসারে কেবল কামিনী-কাঞ্চন-চিন্তা।

সংসার জল, আর মনটি যেন দুধ। যদি জলে ফেলে রাখ, তাহলে দুধে-জলে মিশে এক হয়ে যায়, খাঁটি দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না। দুধকে দই পেতে মাখন তুলে যদি জলে রাখা যায়, তাহলে ভাসে। তাই নির্জনে সাধনা দ্বারা আগে জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন লাভ করবে। সেই মাখন সংসারজলে ফেলে রাখলেও মিশবে না—ভেসে থাকবে।

সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনীকাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়, এই পর্যন্ত। ভগবান লাভ হয় না। তাই, টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। এর নাম বিচার; বুঝেছ?

প্রথম দর্শনের পর হইতে মাষ্টার বাড়ীতে থাকিয়াও ঠাকুরের কথা মুহূর্তের জন্য ভুলিতে পারেন না। একটু অবসর পাইলেই ঠাকুরের পুণ্যদর্শন ও পুণ্যসঙ্গ লাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহার চিত্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে। পরবর্তী রবিবার বিকালে মাষ্টার আবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া হাজির হইলেন। সেদিন নরেন্দ্রাদি ভক্তবৃন্দও ঠাকুরের নিকট আসিয়াছিলেন; এই প্রথম তাঁহাদের সহিত মাষ্টারের আলাপ-পরিচয় হইল। নরেন্দ্রের সহিত ঠাকুর নানা বিষয়ে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন; মাষ্টার অবাক্ হইয়া সেই সমস্ত শুনিলেন।

সেদিন আবার নরেন্দ্রের গান শুনিবার সৌভাগ্যও তাঁহার ঘটিল। একমাত্র ঠাকুরের গান ছাড়া এমন সুমধুর সঙ্গীত পূর্বে তিনি কখনও শুনেন নাই। নরেনের গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া মাষ্টার নিজেকে ধন্য মনে করিলেন।

সোমবারেও ছুটি ছিল; বেলা ৩টা আন্দাজ সময়ে মাষ্টার দক্ষিণেশ্বরে আবার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরের ঘরের দরজায় পৌছিতেই চোখে পড়িল ঠাকুর নরেন্দ্রাদি বালকভক্তদের সঙ্গে বসিয়া আমোদ-আহ্লাদে মগ্ন। মাষ্টারকে দেখিয়া ঠাকুর উচ্চহাস্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ঐ রে, আবার এসেছে।' বালকভক্তেরাও সকলেই হাসিয়া অস্থির! মাষ্টার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাতপূর্বক আসন গ্রহণ করিলে ঠাকুর ভক্তদের লক্ষ্য করিয়া হাসিমুখে বলিতে লাগিলেন, 'স্থাখ্, একটা ময়ূরকে বেলা চারটার সময় আফিম খাইয়ে দিছিল। তার পরদিন ঠিক চারটার সময় ময়ূরটা উপস্থিত—আফিমের মৌতাত ধরেছিল—ঠিক সময়ে আফিম খেতে এসেছে!' এই কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া কুটি কুটি হইল। মাষ্টার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইনি তো ঠিক কথাই বলিতেছেন। এইরূপ ভাবিতেছেন, ঠাকুর এদিকে ছোকরাগুলির সহিত অনেক ফষ্টিনাষ্টি করিতে লাগিলেন, যেন তারা সমবয়স্ক! হাসির লহরী উঠিতে লাগিল যেন আনন্দের হাট বসিয়াছে!

মাষ্টার অবাক্ হইয়া এই অদ্ভুত চরিত্র দেখিতেছেন। ভাবিতেছেন, ইঁহারই কি পূর্বদিনে সমাধি ও অদৃষ্টপূর্ব প্রেমানন্দ দেখিয়াছিলাম? সেই ব্যক্তি কি আজ প্রাকৃত জনের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন? ইনিই কি আমায় প্রথম দিনে উপদেশ দিবার সময় তিরস্কার করিয়াছিলেন? ইনিই কি আমায় 'তুমি কি জ্ঞানী' বলিয়াছিলেন? ইনিই কি সাকার নিরাকার দুইই সত্য বলিয়াছিলেন? ইনিই কি আমায় বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরই নিত্য আর সংসারের সমস্তই অনিত্য? ইনিই আমায় সংসারে দাসীর মত থাকিতে বলিয়াছিলেন?

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ করিতেছেন ও মাষ্টারকে এক একবার দেখিতেছেন। দেখিলেন, তিনি অবাক্ হইয়া বসিয়া আছেন। তখন রামলালকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, 'স্থাখ্, এর একটু উমের বেশী কি না, তাই একটু গম্ভীর। এরা এত হাসিখুশি করছে কিন্তু এ চুপ করে বসে আছে।' মাষ্টারের বয়স তখন সাতাশ বৎসর হইবে।

মাষ্টার ক্রমশঃ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে পরিগণিত হইলেন। যখনই সময় ও সুযোগ পাইতেন, তখনই তিনি ঠাকুরের সান্নিধ্যে চলিয়া আসিতেন। এমন কি, ঠাকুর কলিকাতায় আসিলে স্কুলের মাধ্যন্দিন ছুটির ফাঁকে অল্পক্ষণের জন্য হইলেও তিনি ঠাকুরকে একবার দর্শন করিয়া যাইতেন। বহু আত্মীয়-বান্ধব ও ছাত্রকে ঠাকুরের নিকট লইয়া গিয়া তিনি তাঁহার কৃপালাভ করাইয়াছিলেন। ছাত্রদিগকেও লইয়া যাইতেন বলিয়া অপর ভক্তেরা মাঝে মাঝে ঠাট্টা করিয়া তাঁহাকে 'ছেলেধরা' মাষ্টার বলিতেন। ঠাকুরের কথাবার্তা যেদিন যাহা শুনিতেন, তাহাই তিনি যত্নপূর্বক টুকিয়া রাখিতেন। ঐ সমস্ত লিপিবদ্ধ উপকরণ হইতেই তিনি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' রচনা করিয়া গিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় যখন শ্রীরামকৃষ্ণের কথা প্রথম প্রকাশিত হয়, খুব সম্ভবতঃ গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টি সেই সময়ে উহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। পত্রিকা পড়িয়া তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরে একজন 'পরমহংস' আছেন এবং কেশববাবু প্রায়ই সাঙ্গোপাঙ্গসমেত সেখানে যাতায়াত করেন। বিবরণ পড়িয়া গিরিশচন্দ্রের মনে হইয়াছিল যে, কেশব সেনের দলের ব্রাহ্মেরা যখন 'হরি, হরি' ও 'মা, মা' বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের পক্ষে একজন 'পরমহংস' খাড়া করিয়া একটা নূতন ধরনের বুজরুকি সৃষ্টি করা মোটেই অসম্ভব নহে। তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, এই পরমহংস কখনই হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত সত্যিকার 'পরমহংস' নহেন। অল্প কিছুদিন পরেই গিরিশচন্দ্র শুনিতে পাইলেন যে, দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস তাঁহারই জনৈক প্রতিবেশী এবং তৎকালীন প্রসিদ্ধ এটর্ণি দীননাথ বসু মহাশয়ের গৃহে আগমন করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া কৌতূহলবশতঃ তিনি সেখানে গিয়া দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কি যেন বলিতেছেন এবং কেশববাবু-প্রমুখ উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ খুব আগ্রহ সহকারে তাহা শুনিতেছেন ও শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। কেহ একজন একটি প্রদীপ আনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে রাখিল। উহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন "কি গা,—সন্ধ্যা হয়েছে ?" ঘরের ভিতর অন্ধকার হওয়াতে যে আলো জালানো হইয়াছে, সেই বিষয়ে যেন তাঁহার কিছুমাত্র হুঁশ নাই। গিরিশচন্দ্রের নিকট উহা নিতান্ত ন্যাকামি বলিয়া বোধ হইল।

পরমহংসদেবের প্রতি শ্রদ্ধা হওয়া দূরের কথা, মনে অশ্রদ্ধা জন্মিল। তিনি আর সেখানে রহিলেন না, তখনই বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

তৎপরে দুই-চার বৎসর কাল গত হইয়াছে, শ্রীরামকৃষ্ণের কথা গিরিশচন্দ্র প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছেন—এমন সময়ে তাঁহাদের আবার মিলন ঘটিল। আপন ভবনে পরমহংসদেবের আগমন উপলক্ষ্যে বলরাম একটি ছোটখাট উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রও নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গিয়াছেন। গিয়া দেখিলেন ঘরভর্তি লোক,—গান শুনাইবার জন্য বিধু কীর্তনীয়াও সেখানে উপস্থিত। শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণে গিরিশচন্দ্রের একটু চমক লাগিল। তাঁহার মনে বদ্ধমূল ধারণা ছিল—যোগীরা কখনও বেশী কথাবার্তা বলেন না, বেশী লোককে কাছে ঘেঁসিতে দেন না, এবং কাহাকেও নমস্কার করেন না। কিন্তু তিনি দেখিলেন, এই পরমহংসের আচরণ তাহার বিপরীত; ইনি সকল লোকের সঙ্গে সহজভাবেই মেলামেশা করেন, কথাবার্তা বলেন। সেদিন আবার অতি দীনভাবে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া সকলকেই নমস্কার করিতেছিলেন। উহাতে গিরিশচন্দ্রের জনৈক বন্ধু ঠাট্টা করিয়া কহিলেন—"বিধু ওঁর পূর্বের আলাপী, তার সঙ্গে রঙ্গ হচ্ছে।" কথাটা গিরিশচন্দ্রের মোটেই ভাল লাগিল না। ঠিক সেই সময়ে ঐ পাড়ার আর একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি মোটেই শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতেন না। তিনি আসিয়াই গিরিশচন্দ্রকে কহিলেন—"চল, ও আর কি দেখবে?" গিরিশচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল আরও কিছুক্ষণ সেখানে থাকেন, কিন্তু তাঁহার কথায় চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত গিরিশচন্দ্রের তৃতীয়বার সাক্ষাৎকার ঘটে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ষ্টার থিয়েটারগৃহে। গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' নাটক তখন খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। নাটকের ভক্তিমূলক ভাবে, রচনার লালিত্যে, অভিনয়ের উৎকর্ষে কলিকাতার জনসমাজ একেবারে মুগ্ধ। ভক্তদের নিকট নাটকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়া ঠাকুর একদিন উহার অভিনয় দেখিতে চলিলেন। বলা বাহুল্য, ভক্তেরাই সব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক ভক্ত তাঁহার গাড়ীতে করিয়া ঠাকুরকে থিয়েটারগৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। যখন তাঁহারা যাইয়া পৌছিলেন, গিরিশচন্দ্র তখন থিয়েটারবাড়ীর উঠানে পায়চারি করিতেছিলেন। একজন ভক্ত যাইয়া

তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে, পরমহংসদেব 'চৈতন্যলীলা' দেখিতে আসিয়াছেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার জন্য টিকিট লাগিবে কি না। গিরিশচন্দ্র উত্তর করিলেন যে, পরমহংসদেবের জন্য কোন টিকিট লাগিবে না; কিন্তু তাঁহার অনুচরদের জন্য টিকিট কিনিতে হইবে। এই কথা বলিয়া গিরিশচন্দ্র ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিবার উদ্দেশ্যে ফটকের দিকে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন—এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, ঠাকুর ইতিমধ্যেই গাড়ী হইতে নামিয়া উঠানে আসিয়া পড়িয়াছেন। গিরিশকে দেখিয়াই ঠাকুর নমস্কার করিলেন; গিরিশ প্রতিনমস্কার করিতেই ঠাকুর আবার তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। গিরিশ দেখিলেন মহা বিপদ, পালটা নমস্কার করিলে অভিবাদনের পালা চলিতেই থাকিবে। সুতরাং উহাতে বিরত থাকিয়া তিনি দোতলায় ঠাকুরকে লইয়া গিয়া একটি বক্সে বসাইয়া দিলেন এবং পাখা করিবার জন্য একজন ভৃত্য নিযুক্ত করিলেন। গিরিশচন্দ্রের শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া বেশীক্ষণ তাঁহার পক্ষে উপস্থিত থাকা সম্ভবপর হইল না,—থিয়েটার আরম্ভ হইবার অল্প সময় পরেই তিনি বাড়ী চলিয়া গেলেন। 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয়-দর্শনে ঠাকুরের আনন্দের সীমা রহিল না। শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশে তিনি মুহুর্মুহুঃ সমাধিতে মগ্ন হইলেন। পালা ভাঙ্গিলে পর তাঁহাকে অতি সন্তর্পণে গাড়ীতে করিয়া দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছানো হইল।

তখনও পর্যন্ত ঠাকুরের প্রতি গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে কোনরূপ ভক্তিবিশ্বাস জন্মে নাই। চতুর্থবার দর্শনের পর হইতেই বস্তুতঃ তিনি মাথা নোয়াইতে আরম্ভ করেন। গিরিশের অন্তরে ভয়ানক সংগ্রাম চলিতেছিল। জীবনে তিনি বহু বাধাবিপদ ও দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাব উচ্ছৃঙ্খল হইলেও ঈশ্বরলাভের আকাঙ্ক্ষা মনোমধ্যে অতিশয় প্রবল ছিল। 'ইয়ং বেঙ্গলে'র প্রভাবে পড়িয়া একদিকে তিনি প্রচলিত হিন্দুয়ানির উপরে আস্থা হারাইয়াছিলেন, কিন্তু অপর দিকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার মধ্যেও জীবনে শান্তিপ্রদ কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন সদ্‌গুরুলাভের নিমিত্ত গিরিশচন্দ্রের হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল। একদা কোনও বন্ধুর সহিত এইসকল বিষয়ে আলোচনার ফলে তাঁহার চিত্ত এতদূর বিচলিত হয় যে, তিনি ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া নীরবে বহুক্ষণ অশ্রুবিসর্জন করেন।

উহার ঠিক তিনদিন পরে গিরিশচন্দ্র নিজের পল্লীতে চৌরাস্তার উপরে

অবস্থিত জনৈক বন্ধুর বাড়ীতে বারান্দায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ কয়েকজন ভক্তসঙ্গে বলরাম বসুর বাটী অভিমুখে যাইতেছেন। চৌরাস্তা হইতে অল্প দূরে থাকিতেই জনৈক ভক্ত গিরিশচন্দ্রের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ-পূর্বক ঠাকুরের কাণে কাণে যেন কিছু বলিলেন। গিরিশচন্দ্রের উহা লক্ষ্যীভূত হইল। খানিক অগ্রসর হইবার পর গিরিশের সহিত চোখে চোখে মিলন হইবামাত্র ঠাকুর দুই হাত তুলিয়া গিরিশকে নমস্কার জানাইলেন, গিরিশও তৎক্ষণাৎ প্রতিনমস্কার করিলেন। সেদিন ঠাকুর আর নমস্কার পালটাইলেন না, গিরিশ যে বাড়ীতে বসিয়া ছিলেন তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেনও না—সোজা বলরামবাবুর বাড়ীর দিকে যাইতে থাকিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, ঠাকুরের নিকট যাইবার জন্য গিরিশচন্দ্রের মনে প্রবল বাসনার উদয় হইল। কেন জানেন না, কেবলই তাঁহার ইচ্ছা হইতে লাগিল ছুটিয়া গিয়া ঠাকুরের অনুচরবর্গের দলে যোগদান করেন। ঐসময় একজন ভক্ত আসিয়া গিরিশকে কহিলেন যে, ঠাকুর তাঁহাকে বলরামভবনে যাইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। আর কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া মন্ত্রচালিতের ন্যায় গিরিশ বলরাম বসুর বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলেন। পরবর্তী ব্যাপার তিনি নিজে এভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—"আমি চলিলাম, পরমহংসদেব বলরামবাবুর বাটীতে উঠিলেন, আমিও তাঁহার পশ্চাতে গিয়া বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম। বলরামবাবু বৈঠকখানায় শুইয়াছিলেন, বোধ হইল পীড়িত, পরমহংসদেবকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। বসিয়া বলরামবাবুর সহিত দুএকটি কথা বলিবার পর পরমহংসদেব হঠাৎ উঠিয়া 'বাবু আমি ভাল আছি, বাবু আমি ভাল আছি' বলিতে বলিতে কিরূপ এক অবস্থাগত হইলেন। তাহার পর বলিতে লাগিলেন—'না, না—ঢং নয়।' অল্প সময় এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'গুরু কি ?' তিনি বলিলেন—'গুরু কি জান, যেন ঘটক।' আমি ঘটক কথা ব্যবহার করিতেছি, তিনি এই অর্থে অন্য কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন। আবার বলিলেন —'তোমার গুরু হয়ে গেছে।' 'মন্ত্র কি' জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন 'ঈশ্বরের নাম।' দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতে লাগিলেন—'রামানন্দ প্রত্যহই প্রাতঃস্নান করিতেন। ঘাটের সিঁড়িতে কবীর নামে এক জোলা শুইয়া ছিল। রামানন্দ নামিতে নামিতে তাহার শরীরে পাদস্পর্শ করায় সকল দেহে ঈশ্বরের অস্তিত্বজ্ঞানে রাম

শব্দ উচ্চারণ করিলেন। সেই রামনাম কবীরের মন্ত্র হইল; আর সেই নাম করিয়া কবীরের সিদ্ধিলাভ হইল।' কিছুক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট বিদায় লইয়া গিরিশচন্দ্র স্বগৃহে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার মনে একটা খুব স্বস্তির ভাব ও ভরসা জন্মিল। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—"গুরু করিতে হয়, মুখে বলে। এই তো পরমহংসদেব বলিলেন আমার গুরু হয়ে গিয়েছে; তবে আর কার কথা শুনি?"

এই ঘটনার অল্প কয়েক দিন পরেই গিরিশচন্দ্র একদিন থিয়েটারের সাজঘরে বসিয়া কাজকর্ম দেখাশুনা করিতেছেন, এমন সময়ে জনৈক ভক্ত (দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার) আসিয়া খবর দিলেন যে, 'প্রহ্লাদচরিত্র' পালা দেখিবার জন্য পরমহংসদেব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গিরিশচন্দ্র আপন কাজে নিরত থাকিয়াই উত্তর করিলেন—"আচ্ছা বেশ! তাঁকে উপরে নিয়ে গিয়ে একটি বক্সে বসিয়ে দিন।" দেবেন্দ্রনাথ কহিলেন—"সে কি মশায়! আপনি কি নিজে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবেন না?" গিরিশচন্দ্র উহার প্রত্যুত্তরে বলিলেন—"কেন? আমি না হলে কি তিনি গাড়ী থেকে নামতে পারবেন না?" মুখে একথা বলিলেও বস্তুতঃ গিরিশচন্দ্র বাহির হইয়া গেলেন। থিয়েটারবাড়ীর উঠানে যখন পৌছিলেন, তখন ঠাকুর গাড়ী হইতে সবে নামিতেছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র গিরিশের মনোভাব চকিতে পরিবর্তিত হইল। সে কথা স্মরণ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"তাঁহার মুখপদ্ম দেখিয়া আমার পাষাণ হৃদয়ও গলিল। আপনাকে ধিক্কার দিলাম, সে ধিক্কার এখনও আমার মনে জাগিতেছে। ভাবিলাম, এই পরম শান্ত ব্যক্তিকে আমি অভ্যর্থনা করিতে চাহি না! উপরে লইয়া যাইলাম। তথায় শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। কেন যে করিলাম, তাহা আজও বুঝিতে পারি না।" পারস্পরিক সাদর সম্ভাষণের পর ঠাকুর অল্পক্ষণের জন্য ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। ভাবভঙ্গে গিরিশচন্দ্রকে তিনি কহিলেন, 'তোমার মনে বাঁক আছে।' গিরিশচন্দ্র ভাবিলেন—মনের ভিতর অনেক প্রকার কুটিলতা তো আছেই, কিন্তু কোন্‌টিকে লক্ষ্য করিয়া পরমহংসদেব একথা বলিতেছেন? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাঁক যায় কিসে?' পরমহংসদেব বলিলেন, 'বিশ্বাস করো।'

অল্প কিছুদিন পরেই গিরিশচন্দ্র পুনরায় পরমহংসদেবের সাক্ষাৎলাভ করেন। সেদিন ছিল রবিবার। থিয়েটারগৃহে বসিয়া গিরিশচন্দ্র কাজকর্মের

তত্ত্বাবধান করিতেছেন এমন সময় একখানি চিরকুট তাঁহার হাতে আসিয়া পৌছিল। জনৈক বন্ধু উহাতে শুধু এই কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, অপরাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে আসিবেন, অতএব ঐ সময়ে তথায় গেলে দর্শনলাভের সুযোগ ঘটিবে। পত্রখানি পড়িয়াই কি জানি কেন পরমহংসদেবকে দেখিতে যাইবার জন্য গিরিশচন্দ্রের মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তবুও তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। নিমন্ত্রিত না হইয়া একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ীতে যান কিরূপে? উহাই ছিল সঙ্কোচের কারণ। মনের ভিতর ব্যাপারটা যতই তোলপাড় হইতে লাগিল, ততই যাইবার বাসনা আরও প্রবল হইয়া উঠিল। আকর্ষণ তিনি আর কিছুতেই রোধ করিতে পারিলেন না,—কাজকর্ম ফেলিয়া রাখিয়া রামচন্দ্র দত্তের বাটীর দিকে রওয়ানা হইয়া গেলেন। যাইতে যাইতে রাস্তায় কয়েকবার থামিলেন; ভাবিলেন, যাইয়া দরকার নাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে যাইতেই হইল। রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে যখন পৌছিলেন, তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইলেন যে, ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ সুমধুর সঙ্গীত ও নৃত্য করিতেছেন। গান হইতেছিল—'নদে টলমল টলমল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে।' গিরিশচন্দ্রের মনে হইতে লাগিল যে, সাক্ষাৎ মহাপ্রভূর আবির্ভাব হইয়াছে এবং রামবাবুর গৃহের অঙ্গন সত্যই টলমল করিতেছে। এই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া গিরিশের মন একেবারে দ্রবীভূত হইল, নয়নযুগল হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। নৃত্য করিতে করিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তখন আনন্দের স্রোত যেন শতগুণ বর্ধিত হইল। ভক্তেরা সকলেই উল্লসিত হইয়া পরম শ্রদ্ধাভরে বারংবার ঠাকুরের পদধূলি লইতে থাকিলেন। গিরিশেরও খুব ইচ্ছা হইল ঠাকুরের পদরজঃ মস্তকে ধারণ করেন, কিন্তু সঙ্কোচ আসিয়া বাধা দিল। ঐ সময়ে ঠাকুরের সমাধির একটু বিরাম হওয়াতে তিনি নৃত্য করিতে করিতে গিরিশের সম্মুখে আসিয়া আবার সমাধিস্থ হইলেন। এবারে গিরিশের লজ্জাসঙ্কোচ মুহূর্তে দূরীভূত হইল, তিনি ঠাকুরের চরণধূলি মাথায় লইলেন।

সংকীর্তনের শেষে পরমহংসদেবকে রামবাবুর বৈঠকখানা ঘরে লইয়া গিয়া বসানো হইল। গিরিশও সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া কথাবার্তার সুযোগ পাইবামাত্র ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার মনের বাঁক যাবে তো?' ঠাকুর উত্তর

দিলেন—'হাঁ যাবে।' বার বার তিনবার সেই প্রশ্ন করিয়া গিরিশ একই উত্তর পাইলেন। ভক্ত মনোমোহন মিত্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আর ধৈর্য রাখিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ রূঢ়স্বরে কহিলেন—'এখন যাও না; উনি বললেন—আর কেন ওঁকে ত্যক্ত কচ্চ?' ইতিপূর্বে কাহারও নিকট হইতে এরূপ ভৎর্সনা পাইয়া সহ্য করা গিরিশের পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু এবারে নিরুত্তর থাকিয়া মনে মনে কহিলেন—'ইনি ঠিক কথাই বলেচেন। যাঁর এক-বারের কথায় বিশ্বাস হয় না, তিনি শতবার বললেও কি তাঁর কথায় বিশ্বাস হবে?' এইরূপ ভাবিয়া পরমহংসদেবের চরণধূলি গ্রহণপূর্বক বিদায় লইলেন। রাস্তায় দেবেন্দ্রবাবুর সহিত ঠাকুরের বিষয় আলোচনা হইল। দেবেন্দ্রবাবু তাঁহাকে একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পরামর্শ দিলেন।

উপরিবর্ণিত ঘটনার পর হইতে ঠাকুরের প্রতি গিরিশচন্দ্রের মনের টান দিন দিন অতি প্রবল বেগে বাড়িতে লাগিল; অত্যল্পকাল মধ্যেই তিনি একদা দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর তখন দক্ষিণের বারান্দায় একখানি কম্বলের উপর বসিয়া একটি যুবক ভক্তের (ভবনাথের) সহিত আলাপ করিতেছিলেন। গিরিশ যাইয়া প্রণাম করিতেই যেন পরমাত্মীয়ের ন্যায় তাঁহাকে কহিলেন—'তোমার কথাই হচ্ছিল; মাইরি একে জিজ্ঞেস কর।' এই কথার পর তিনি গিরিশকে ধর্মবিষয়ক উপদেশ দিতে অগ্রসর হইলে গিরিশচন্দ্র তাহাতে বাধা দিয়া কহিলেন—'আমি উপদেশ শুনব না। অনেক উপদেশবাক্য আমি নিজেই লিখেচি, ওতে কিছুই হয় না। আপনি আমায় যদি কিছু করে দিতে পারেন, তবে করুন।' গিরিশের মুখে একথা শুনিয়া ঠাকুর বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। তিনি তো ইহাই চাহিতেন যে, ভক্তেরা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও রসাস্বাদন করুক। পার্শ্বে দণ্ডায়মান রামলালকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন—'কি রে, শ্লোকটা বল্ত।' উদ্দিষ্ট শ্লোকটি রামলাল শুনাইলেন। উহার ভাবার্থ এই—'পর্বতগহ্বরে নির্জনে বসিলেও কিছুই হয় না; বিশ্বাসই পদার্থ।' কথাগুলি শুনিয়া গিরিশচন্দ্রের বোধ হইল যেন তাঁহার হৃদয়ের সকল গ্রন্থি ছিন্ন এবং সকল অবিশ্বাস সমূলে উৎপাটিত হইল; এক স্বর্গীয় পবিত্রতা ও প্রসন্নতার ভাব আসিয়া তাঁহার সকল হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিল। তিনি ব্যাকুলভাবে ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন—'আপনি কে?' এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—"আমার জিজ্ঞাসার অর্থ এই যে, আমার ন্যায়

দাম্ভিকের মস্তক কাহার চরণে অবনত হইল? এ কাহার আশ্রয় পাইলাম,—যে আশ্রয়ে আমার সমুদয় ভয় দূর হইয়াছে? আমার প্রশ্নের উত্তরে পরমহংসদেব বলিলেন—'আমায় কেউ বলে আমি রামপ্রসাদ, কেউ বলে রাজা রামকৃষ্ণ—আমি এইখানেই থাকি।' আমি প্রণাম করিয়া বাটীতে ফিরিতেছি, তিনি উত্তরের বারান্দা অবধি আমার সঙ্গে আসিলেন। আমি তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'আমি আপনাকে দর্শন করিয়াছি, আবার কি আমায় যাহা করিতে হয়, তাহা করিতে হইবে?' ঠাকুর বলিলেন—'তা করো না!' তাঁহার কথায় আমার মনে হইল যেন যাহা করি, তাহা করিলে দোষ স্পর্শিবে না।" গিরিশ বুঝিতে পারিলেন যে, থিয়েটারের সংস্রবে থাকিলেও তাঁহার পতন ঘটিবে না, তিনি সুদৃঢ় আশ্রয় লাভ করিয়াছেন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির অবারিত পথ তাঁহার সম্মুখে খুলিয়া গিয়াছে।

বহু অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের পর সমস্ত দ্বিধা-সন্দেহের জাল ছিন্ন করিয়া গিরিশচন্দ্র এবারে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিলেন। উহার ফলে গিরিশচন্দ্রের জীবনে কি বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহার পরিচয় চরিত-গ্রন্থাদিতে পাওয়া যাইবে। আমরা এখানে শুধু গিরিশচন্দ্রের নিজের লেখা হইতে একটুখানি উদ্ধৃত করিয়া প্রসঙ্গ শেষ করিব। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন, "ইহার পর অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে; এই যে পরম আশ্রয়দাতা, ইঁহার পূজা আমার দ্বারা হয় নাই। মদ্যপান করিয়া ইঁহাকে গালি দিয়াছি। শ্রীচরণ সেবা করিতে দিয়াছেন—ভাবিয়াছি, এ কি আপদ! কিন্তু এ সকল কার্য করিয়াও আমি দুঃখিত নই। গুরুর কৃপায় ঐ সকল আমার সাধন হইয়াছে। গুরুর কৃপায় একটি অমূল্য রত্ন পাইয়াছি। আমার মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, গুরুর কৃপা আমার কোন গুণে নহে। অহেতুকী কৃপাসিন্ধুর অপার কৃপা, পতিতপাবনের অপার দয়া—সেইজন্য আমায় আশ্রয় দিয়াছেন। আমি পতিত, কিন্তু ভগবানের অপার করুণা; আমার কোন চিন্তার কারণ নাই। জয় রামকৃষ্ণ!"*

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে এক অত্যাশ্চর্য ব্যক্তি

* গিরিশচন্দ্রের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে রচিত এবং 'উদ্বোধন' ও 'জন্মভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত পরমহংসদেববিষয়ক প্রবন্ধাবলী দ্রষ্টব্য। গিরিশ-গ্রন্থাবলীতে উক্ত প্রবন্ধরাজি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ছিলেন ৺দুর্গাচরণ নাগ। শিশুসুলভ সরলতা ও নিষ্কলুষ চরিত্রের জন্য তিনি 'সাধু নাগমহাশয়' নামে পরিচিত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রমাধুর্য, বিনয়, জীবসেবার প্রবৃত্তি ও ভগবদ্ভক্তির তুলনা পাওয়া কঠিন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—'নাগমহাশয় ঠাকুরের এক অদ্ভুত কীর্তি। পৃথিবীর বহুস্থানে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি, নানা রকম লোকের সংস্পর্শে এসেছি, কিন্তু এমন মহচ্চরিত্র ব্যক্তির সাক্ষাৎ কোথাও পাই নি।' নাগমহাশয়ের জীবনী পর্যালোচনা করিলে পুরাণাদিতে বর্ণিত ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্তদের কাহিনী মনে পড়ে। বর্তমান যুগে এরূপ একনিষ্ঠ ঈশ্বরপ্রেমের দৃষ্টান্ত নিতান্তই বিরল।

পূর্ববঙ্গের নারায়ণগঞ্জ শহরের অনতিদূরে অবস্থিত 'দেওভোগ' গ্রাম দুর্গাচরণের জন্মস্থান। তাঁহার পিতার নাম ৺দীনদয়াল নাগ। তিনি কলিকাতার বাগবাজারে এক মহাজনী গদীতে অতি সামান্য বেতনে কাজ করিতেন। অতি শৈশবে মাতৃহীন হওয়ার দরুন দুর্গাচরণ পিতৃষ্বসার দ্বারা লালিত পালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বালবিধবা পিসীমা অতিশয় ভক্তিমতী ছিলেন এবং ভাইয়ের সংসারেই থাকিতেন। পরিবারে অপর লোকজন কেহই ছিল না।

শিশু দুর্গাচরণ অতীব শান্তশিষ্ট ছিলেন এবং পিসীমার মুখে ভক্তিমূলক পৌরাণিক কাহিনী শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়ায়ও তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ও ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেল। কিন্তু দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে লেখাপড়া বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। উপরন্তু, মাতৃহারা বালককে ত্বরায় সংসারী করিবার আগ্রহাতিশয্যে পিসীমা অতি অল্পবয়সেই দুর্গাচরণের বিবাহ দিলেন। যাহাই হউক, স্ত্রী নিতান্ত বালিকা ছিলেন বলিয়া প্রায়শঃ পিত্রালয়েই থাকিতেন; সুতরাং বিবাহসত্ত্বেও দুর্গাচরণের সংসারবন্ধন উপস্থিত হইল না। বিবাহের কয়েক মাস পরেই দুর্গাচরণ কলিকাতায় পিতার নিকটে যাইয়া ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু দারিদ্র্যনিবন্ধন পড়া বেশীদূর অগ্রসর হইল না। এলোপ্যাথি ছাড়িয়া তখন তিনি হোমিওপ্যাথি শিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার বালিকাবধূ অকস্মাৎ পরলোকগমন করেন।

রুগ্ন ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের সেবার উদ্দেশ্যে দুর্গাচরণ ডাক্তারি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ শিক্ষাসমাপনের পূর্বে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি সেবাকার্যে

ব্রতী হন। গরীব রোগীদিগকে তিনি যত্নপূর্বক ঔষধপত্র দিতেন। এমন কি, দরকার হইলে রোগীর শুশ্রূষা পর্যন্ত নিজের হাতেই করিতেন।

দুর্গাচরণ কলিকাতায় আসিবার অল্পকাল মধ্যেই শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত* মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় ও বন্ধুত্ব জন্মে। সুরেশচন্দ্র ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের যুবক এবং মূর্তিপূজার ঘোরতর বিরোধী; পক্ষান্তরে দুর্গাচরণ দেবদেবী মানিতেন। বাহিরে এরূপ মতের অমিল থাকিলেও এক বিষয়ে দুজনের মধ্যে খুব মিল ছিল। উভয়েই ঈশ্বরলাভের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল ছিলেন এবং নিয়মিতভাবে ঈশ্বরের স্মরণ-মনন করিতেন। দুর্গাচরণ অনেক সময়ে গঙ্গার ধারে কিংবা শ্মশানঘাটে বসিয়া ধ্যানজপ করিতেন। পুত্রের এই বৈরাগ্যভাব দেখিয়া দীনদয়ালের মনে বিষম চিন্তা উপস্থিত হইল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, পুনরায় বিবাহ দিয়া পুত্রকে সংসারে আবদ্ধ রাখিতে হইবে। সুতরাং দুর্গাচরণের অমতে একপ্রকার বলপ্রয়োগে তাঁহাকে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করানো হয়। দুর্গাচরণ তখন মনে মনে জগদীশ্বরের নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, বিবাহ যেন তাঁহার ধর্মজীবনের অন্তরায় না হয়। ভগবান্ ভক্তের সেই বাঞ্ছা পূরণ করিয়াছিলেন।

দীনদয়াল পুত্রকে দেশে লইয়া গিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের পর দুর্গাচরণ কলিকাতায় ফিরিয়া রীতিমত চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন, যেহেতু তিনি রোজগার না করিলে তাঁহার পিতার পক্ষে তখন সংসার চালানো অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলে কি হয়, রোজগারের বুদ্ধি দুর্গাচরণের মোটেই ছিল না। গরীবদের নিকট হইতে তিনি পয়সা লইতেন না; আর যাঁহারা দিতে সমর্থ, তাঁহাদের নিকট হইতেও যৎসামান্যই লইতেন; তাঁহারা বেশী দিতে চাহিলেও গ্রহণ করিতেন না। দুর্গাচরণের এই নিঃস্পৃহতার দরুন পিতা অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কটুবাক্য পর্যন্ত বলিতেন, কিন্তু তদ্দ্বারা ফল কিছুই হইত না।

দুর্গাচরণ যদিও চিকিৎসা ব্যবসায়কে পরোপকার-ব্রত হিসাবেই অবলম্বন করিয়াছিলেন, তথাপি প্রাণে শান্তি পাইতেছিলেন না। জগৎসংসারে চারিদিকেই অপরিসীম দুঃখদৈন্য। জনহিতকর চেষ্টা দ্বারা তাহার কতটুকুই

---

* ইনি পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত হইয়াছিলেন।

বা দূর করিতে পারা যায়? এই চেষ্টা কি নিতান্তই নিষ্ফল নহে? তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে, ঈশ্বরলাভই পরা-শান্তির একমাত্র উপায়। কিন্তু হায়! এতদিন ধরিয়া ব্যাকুলভাবে ডাকিয়াও ঈশ্বরের দেখা পাইলেন না। কে তাঁহাকে পথ বলিয়া দিবে? দুর্গাচরণের মনের যখন ঐরূপ অবস্থা, তখন সুরেশচন্দ্র একদা ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে কেশবচন্দ্রের মুখে পরমহংসদেবের কথা শুনিয়া আসিয়া দুর্গাচরণকে জানাইলেন। উভয়ের হৃদয়েই পরমহংসদেবকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যাকুল আগ্রহ জন্মিল। কালবিলম্ব না করিয়া দুজনে একদা দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের সম্মুখে পৌঁছিয়া বারান্দায় উপবিষ্ট এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে, পরমহংস বাহিরে কোথাও গিয়াছেন, ফিরিতে বিলম্ব হইবে। একথা শুনিয়া তাঁহারা মনঃক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে ঘরের ভিতর হইতে দরজার ফাঁক দিয়া কে যেন তাঁহাদিগকে ইশারায় আহ্বান করিল। সাহসে ভর করিয়া দুজনে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং পরক্ষণেই বুঝিতে পারিলেন যে, ইঙ্গিতকারী ব্যক্তিটি আর কেহই নহেন,—যাঁহার দর্শনমানসে তাঁহারা দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন, স্বয়ং তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট তক্তাপোশখানির উপর আসীন ছিলেন। সুরেশ তাঁহাকে হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিলেন। নাগমহাশয় ভূমিষ্ঠভাবে প্রণতিপূর্বক তাঁহার পদধূলি লইতে হাত বাড়াইলে তিনি তাড়াতাড়ি পা গুটাইয়া লইলেন। উহাতে নাগমহাশয়ের মনে বড়ই দুঃখ হইল, তিনি ভাবিলেন, 'আমি ঘোরতর পাপী, সাধু-মহাত্মার চরণস্পর্শের যোগ্য নহি, তাই শ্রীরামকৃষ্ণ আমাকে পদধূলি দিতে অনিচ্ছুক।'

ঠাকুরের নির্দেশে তাঁহারা আসনপরিগ্রহ করিবার পর তিনি প্রথমে তাঁহাদের পরিচয় লইলেন এবং তৎপর কহিলেন যে, বাহিরের যে ব্যক্তিটি তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, উহার নাম প্রতাপচন্দ্র হাজরা, উহার আচরণ নিতান্ত অদ্ভুত। স্বভাবতঃ লাজুক এবং স্বল্পভাষী নাগমহাশয় নীরবে এতক্ষণ একদৃষ্টে ঠাকুরের প্রতি তাকাইয়া রহিয়াছিলেন। ঠাকুর উহা লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কি দেখিতেছেন। নাগমহাশয় বলিলেন যে, দর্শনের অভিপ্রায়েই তিনি আসিয়াছেন, এবং সেই অভিলাষই পূর্ণ করিতেছেন। এই উত্তরে ঠাকুর অতীব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে নানা উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন—'সংসারে থাকো, কিন্তু পাঁকাল মাছের

মত থাকো। পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে পাঁক লাগে না। তেমনিভাবে সংসারে থাকিয়াও যদি সর্বদা ঈশ্বরে মন রাখা যায়, তবে সংসারের ধূলাবালি গায়ে লাগে না। সংসারে থাক, কিন্তু সংসারী হয়ো না।' এইরূপে কিছুক্ষণ নানা উপদেশ দিবার পর তিনি তাঁহাদিগকে পঞ্চবটীতে যাইয়া ধ্যান করিতে বলিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা তুজন পঞ্চবটী হইতে ফিরিয়া আসিলে পর ঠাকুর নিজে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহাদিগকে সব কিছু দেখাইতে লাগিলেন। কালীমন্দিরে পৌছিবামাত্র সহসা তাঁহার ভাবান্তর ঘটিল, তিনি যেন মায়ের সম্মুখে ক্ষুদ্র শিশুটির ন্যায় হইয়া গেলেন—ষোল-আনা মায়ের উপর নির্ভর, মা বই জগতে আর কিছুই নাই। এই ভাব কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইবার পর আগন্তুকদ্বয় বাটী যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে পুনরায় আসিতে বলিয়া সেদিনকার মত বিদায় দিলেন। পথে যাইতে যাইতে নাগমহাশয়ের কেবলি মনে হইতে লাগিল,—'ইনি কি শুধু একজন সাধু মহাপুরুষ,—না তদপেক্ষাও অধিক আরও কিছু?'

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎকারের ফলে নাগমহাশয়ের ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুলতা যেন শতগুণ বাড়িয়া গেল,—তিনি সংসারের কাজকর্ম ছাড়িয়া প্রায় সারাক্ষণ কেবলি ঈশ্বরচিন্তায় কাটাইতে লাগিলেন,—কাহারও সহিত কথাবার্তা বড় কহেন না; কেবলমাত্র বন্ধু সুরেশ আসিলে হয় ভগবৎপ্রসঙ্গ, নতুবা ঠাকুরের কথা শুধু আলোচনা করেন। এভাবে সপ্তাহখানেক অতিবাহিত হইবার পর দুই বন্ধুতে মিলিয়া দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। এবারে নাগমহাশয়কে দেখিবামাত্র ঠাকুর ভাবোন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া নিজের পাশে বসাইয়া পরম স্নেহভরে কহিতে লাগিলেন—"তোমার আবার ভয় কি? তুমি অনেক পথ এগিয়ে গিয়েছ।" ঐদিনও ঠাকুর তাঁহাদের তুজনকে পঞ্চবটীতে ধ্যান করিতে পাঠাইলেন এবং তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে সুরেশকে একান্তে পাইয়া কহিলেন—'তোমার বন্ধুটি একেবারে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা!'

তৃতীয়বার সাক্ষাতের সময় নাগমহাশয় একাকী দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবেশে অস্ফুটস্বরে কি যেন বলিতে লাগিলেন। ঠাকুরের হাবভাব দেখিয়া নাগমহাশয়ের চিত্তে বড়ই ভয় জন্মিল। ঠাকুর উহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার নিমিত্ত কহিলেন—'হাঁগা, দেখ

দিকিন, আমার পায়ে কি হয়েচে! তুমি ত ডাক্তার, তুমি ঠিক বুঝতে পারবে।' এই স্বাভাবিক প্রশ্নে নাগমহাশয়ের ভয় দূরীভূত হইল; তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে ঠাকুরের চরণযুগল পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ঠাকুর হাসিয়া কহিলেন, 'আরও ভাল করে দেখ।' সহসা নাগমহাশয়ের মোহ ঘুচিল, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ব্যাপার আর কিছুই নহে, ঠাকুর কৃপা করিয়া তাঁহাকে চরণ-সেবার সুযোগ দিয়াছেন। পরবর্তীকালে নাগমহাশয় যখনি এই ঘটনার উল্লেখ করিতেন, তখনি ভক্তিগদ্গদকণ্ঠে বলিতেন, 'ঠাকুর অন্তর্যামী এবং ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু। তাই ভক্তের মনের কথা তাঁহাকে না বলিলেও তিনি ধরিতে পারিতেন এবং একান্তভাবে মনে মনে যে যাহা প্রার্থনা করিত, তাহাই তিনি পূরণ করিতেন।' নাগমহাশয়ের দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল এবং ঠাকুরের প্রিয়তম শিষ্যবর্গের মধ্যে তিনি পরিগণিত হইলেন। কিন্তু তিনি এমনি বিনয়ী এবং লাজুক ছিলেন যে, প্রথম প্রথম রবিবারে অথবা ছুটির দিনে তথায় যাইতেন না—যেহেতু ঐসকল দিনে কলিকাতা হইতে প্রায়শঃ অনেক বিদ্বান্ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ঠাকুরের নিকট সমাগম হইত। ঠাকুর আপন চেষ্টায় ধীরে ধীরে তাঁহাকে নরেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। নাগমহাশয়ের কঠোর তপশ্চর্যা, ভক্তি-বিশ্বাস ও মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়া উঁহারা সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

ঠাকুরের নিকট যে-কোনও কথা শুনিতেন, নাগমহাশয় তাহাই বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন। একদিন তিনি ঠাকুরকে অপর কাহারও প্রতি বলিতে শুনিলেন—'ডাক্তার, উকিল, মোক্তার ও দালালের পক্ষে ঈশ্বরলাভের পথে অগ্রসর হওয়া বড়ই কঠিন।' বিশেষ করিয়া ডাক্তারদের সম্পর্কে ঠাকুর বলিতেছিলেন, 'এক ফোঁটা ওষুধের মধ্যে যার মন লেগে রয়েছে, সে কি আর অনন্ত ঈশ্বরের ধারণা করতে পারে?' কথাগুলি নাগমহাশয়ের অন্তরে যেন তীরের ন্যায় বিদ্ধ হইল। তিনি ভাবিলেন—'এ কথা ত আমার উদ্দেশ্যেই ঠাকুর বলিতেছেন!' নাগমহাশয় তৎক্ষণাৎ মনে মনে স্থির করিলেন, ডাক্তারি ব্যবসায় ছাড়িয়া দিবেন। বাড়ী ফিরিয়াই ডাক্তারি বই এবং ঔষধপত্র সমস্ত গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিলেন। এখন হইতে দিনরাত্রির অধিকাংশ সময় তিনি ধ্যানজপে নিবিষ্ট হইয়া থাকিতেন। ক্রমে সন্ন্যাসগ্রহণের জন্য তাঁহার মনে

প্রবল আগ্রহ জন্মিল। অবশেষে একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া তিনি ঠাকুরের নিকট এ বিষয়ে আপন মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত করিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু ঠাকুর অনুমতি না দিয়া কহিলেন—'কেন, সংসারে থাকলে দোষ কি? শুধু মনটি ঈশ্বরে লাগিয়ে রাখ। জনক রাজা যেমন করেছিলেন, তেমনি কর। গৃহস্থের জীবন কিরূপ হওয়া উচিত, এ বিষয়ে তোমার জীবন আদর্শ হয়ে থাকুক।' নাগমহাশয়ের আর সন্ন্যাস গ্রহণ করা হইল না,—ঠাকুরের আদেশ শিরোধার্য করিয়া তাঁহাকে গৃহীই থাকিতে হইল। কিন্তু অর্থোপার্জনে অথবা যাহাতে সাংসারিক বন্ধন জন্মে, এমন কোন কাজে নাগমহাশয় একেবারেই লিপ্ত হইলেন না। তাঁহার অদ্ভুত জীবনী পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তিনি আপন অন্তর হইতে অহঙ্কার সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন। মহাকবি গিরিশচন্দ্র তাঁহার কবিত্বের ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন—"নরেনকে ও নাগমহাশয়কে বাঁধতে গিয়ে মহামায়া বড়ই বিপদে পড়েছেন। নরেনকে যত বাঁধেন তত বড় হয়ে যায়, মায়ার দড়িতে আর কুলোয় না! শেষে নরেন এত বড় হল যে, মায়া হতাশ হয়ে তাঁকে ছেড়ে দিলেন। নাগমহাশয়কেও মহামায়া বাঁধতে লাগলেন; কিন্তু মহামায়া যত বাঁধেন, নাগমহাশয় তত সরু হয়ে যান। ক্রমে এত সরু হলেন যে, মায়াজালের মধ্য দিয়ে গলে চলে গেলেন।"

নারী-ভক্তবৃন্দ

ভারতভূমিতে একথা চিরকাল স্বীকৃত যে, ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরও সম্পূর্ণ অধিকার। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু ব্রহ্মবাদিনী ঋষির নাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। এযুগে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মবিদ্যার পসরা মেলিয়া বসিলেন, তখনও দেখিতে পাই যে, নারীসমাজকে তাঁহাদের প্রাপ্য অংশ দিতে তিনি কার্পণ্য করিলেন না।* বহুসংখ্যক মহিলার জীবন তাঁহার কৃপালাভে ধন্য ও সার্থক হইয়াছিল। যাঁহারা নিজেদের তপশ্চর্যার গুণে ও ঠাকুরের সহায়তায় উন্নতির চরমশিখরে আরোহণ করিতে পারিয়াছিলেন,—এমন দু'চার জনের বিষয় অতি সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করা হইবে।

ঠাকুর ভাবরাজ্যের এমন এক উচ্চস্তরে নিরন্তর অবস্থান করিতেন, যেখানে স্ত্রী-পুরুষ, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনি-নির্ধন প্রভৃতির কোনও বাচবিচার নাই,—যেখানে সম্পর্ক শুধু আত্মার। যে তাঁহার নিকটে যাইত, সে-ই মনে করিত ঠাকুর তাহার অতি আপনার লোক, নিকট হইতেও নিকটতর আত্মীয়। স্ত্রী-ভক্তেরা একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন—'ঠাকুর যে পুরুষ-মানুষ, একথা আমাদের হৃদয়ে কখনও স্থান পাইত না। আমরা সর্বদা মনে করিতাম, তিনি আমাদেরই একজন। অতএব তাঁহার সম্মুখে আমরা কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিতাম না। তাঁহার নিকট সব কথা অকপটে খুলিয়া বলিতাম।' এক অপার্থিব ভালবাসার টানে তাঁহারা সকলেই ঠাকুরের নিকট ছুটিয়া আসিতেন।

* ভগিনী নিবেদিতা অতি সঙ্গতভাবেই বলিয়াছেন যে, তলাইয়া দেখিতে গেলে সমগ্র রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের মূলে একজন নারী। "যে আন্দোলনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যবর্গ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এক হিসাবে উহার জননী-স্বরূপা ছিলেন নিতান্ত সাধারণ শ্রেণী হইতে উদ্ভূতা এক ললনা। জাগতিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে—দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত না হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসই হইতেন না, আর শ্রীরামকৃষ্ণ না হইলে বিবেকানন্দও হইতে পারিতেন না,—পাশ্চাত্ত্য দেশে হিন্দুধর্মও প্রচারিত হইত না। অতএব সমস্ত ব্যাপারটির গোড়ায় রহিয়াছে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে নির্মিত একটি মন্দির। আর সেই মন্দির ছিল একজন ধনবতী শূদ্রজাতীয়া মহিলার ভক্তিপরায়ণতার ফল।" —The Master As I Saw Him

সর্বপ্রথমে যাঁহারা আগমন করেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন মনোমোহনের জননী—শ্যামাসুন্দরী। তিনি নিরতিশয় ভক্তিমতী ছিলেন এবং ঠাকুর তাঁহার পতিভক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মনোমোহনের সর্বকনিষ্ঠা ভগিনী বিশ্বেশ্বরীর সহিত রাখালচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল। রাখাল যখন ঘর-সংসার ছাড়িয়া একান্তভাবে ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন অনেকেই শ্যামাসুন্দরীকে বলিতে লাগিলেন—"বী'র (বিশ্বেশ্বরীর ডাক-নাম) অমন স্বামী, ঘরসংসার ছেড়ে দক্ষিণেশ্বরে সন্ন্যাসীর সঙ্গে রাতদিন বাস করছে; তোমরা জামাইকে বারণ করতে পার না?" উহা শুনিয়া শ্যামাসুন্দরী উত্তর দিয়াছিলেন—'আহা! আমার কি এমন সৌভাগ্য হবে যে, আমার মেয়ে-জামাই দুজনেই পরমহংসদেবের সেবায় প্রাণ সঁপে দেবে!' আধ্যাত্মিকতার ভাব কত গভীর, এবং হৃদয়ে কতখানি ভক্তি-বিশ্বাস থাকিলে এমন কথা মায়ের মুখে উচ্চারিত হইতে পারে, তাহা ভাবিবার বিষয়।

দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের জননী এবং ব্রাহ্মভক্ত মণিলাল মল্লিক মহাশয়ের ভগিনীর নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা উভয়েই ঠাকুরের বিশেষ কৃপালাভে ধন্য হইয়াছিলেন। যাঁহার পক্ষে যে পথ উপযোগী, ঠাকুর তাঁহাকে ঠিক সেই পথই ধরাইয়া দিতেন। মণি মল্লিক মহাশয়ের ভগিনীর ধ্যানজপে বড়ই অনুরাগ ছিল। কিন্তু একবার এমন হইল যে, ধ্যানে আর কিছুতেই মন বসে না; যতই চেষ্টা করেন, মন তাহা না শুনিয়া কেবলি চারিদিকে ছুটাছুটি করে। অবশেষে নিরুপায় হইয়া ঠাকুরের নিকট এ বিষয়ে উপদেশ চাহিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ ব্যক্তি কিংবা বস্তু সংসারে তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। তদুত্তরে মহিলা জানাইলেন যে, একটি শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রই তাঁহার সর্বাপেক্ষা আদরের ধন। তখন ঠাকুর কহিলেন—'তবে ত বেশ ভালই হল। এই শিশুটিকেই তুমি সাক্ষাৎ বালগোপাল জ্ঞানে হৃদয়ে ধ্যান করবে।' নিষ্ঠার সহিত এই উপদেশ পালন করিবার ফলে মহিলাটির সহজেই চিত্তের স্থিরতা জন্মিল এবং অনতিকালমধ্যে তিনি নানা দিব্যদর্শনলাভে কৃতার্থ হইলেন।

স্ত্রী-ভক্তদের মধ্যে যোগীন-মা, গোলাপ-মা, গৌরী-মা ও গোপালের মা—শ্রীরামকৃষ্ণভক্তসঙ্ঘে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। যোগীন-মা'র আসল নাম ছিল যোগীন্দ্রমোহিনী। সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁহার জন্ম; পিতা

৺ডাক্তার প্রসন্নকুমার মিত্র বহু সাধ করিয়া বড়ঘরে কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামী উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্র হওয়াতে যোগীন্দ্রমোহিনীর গার্হস্থ্য-জীবন দুঃখ ও অশান্তিতে ভরিয়া উঠে। ফলে যৌবনেই তাঁহার হৃদয়ে সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণার উদয় হয়। স্বামিগৃহ হইতে চলিয়া আসিয়া বাগবাজারে পিত্রালয়েই তিনি অতিশয় মনোদুঃখে কালযাপন করিতে থাকেন। বলরামবাবুদের সহিত তাঁহার পরিবারের আত্মীয়তা ছিল। বলরামবাবুর মুখে সর্বপ্রথম ঠাকুরের নাম শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত যোগীন্দ্রমোহিনীর হৃদয়ে ব্যাকুল আগ্রহ জন্মে। সুযোগ পাইবামাত্র কালবিলম্ব না করিয়া তিনি একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরের দর্শনে তাঁহার হৃদয়ের সঞ্চিত সমস্ত দুঃখজ্বালা যেন নিমেষে জুড়াইয়া গেল। ঠাকুর তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণপূর্বক মাতাঠাকুরানীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং অত্যল্পকাল-মধ্যে যোগীন্দ্রমোহিনী তাঁহাদের উভয়ের অতিশয় প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিলেন। সুযোগ পাইলেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া যাইতেন এবং মাঝে মাঝে একটানা কয়েক দিন তথায় অবস্থান করিতেন। ঠাকুর যোগীন-মাকে সাধনার রাজ্যে খুব উচ্চাধিকারিণী বলিয়া উল্লেখ করিতেন। জপতপ এবং ধর্মগ্রন্থাদি পাঠেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির গুণে সমস্ত পৌরাণিক কাহিনী তাঁহার নখদর্পণে ছিল এবং অতি চমৎকার ভঙ্গীতে তিনি সেগুলি বর্ণন করিতেন। তাঁহার মুখ হইতে শুনিয়াই ভগিনী নিবেদিতা অনেক পৌরাণিক আখ্যায়িকা ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।*

যোগীন্দ্রমোহিনীর বাটীর কাছেই থাকিতেন গোলাপসুন্দরী দেবী নামে উচ্চ বংশের জনৈকা ব্রাহ্মণ মহিলা। নিজে গরীব হইলেও তাঁহার একমাত্র কন্যাটিকে তিনি ধনী এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের অল্পকাল পরেই সেই স্নেহের পুত্তলী অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে জননীর নিকট সমস্ত জগৎসংসার যেন শূন্য এবং অন্ধকারময় হইয়া যায়। তাঁহার শোকাবেগ-দর্শনে স্থির থাকিতে না পারিয়া যোগীন-মা নিজেই তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া গিয়া ঠাকুরের পদপ্রান্তে উপস্থিত করিলেন। সন্তানহারা জননীর দুঃখদুর্দশা দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয়ে করুণাসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ ভাবাবিষ্ট থাকিবার পর অর্ধবাহ্যদশায় তিনি বলিতে লাগিলেন—'তুমি

---

* 'Cradle Tales of Hinduism' গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

পরম ভাগ্যবতী! সংসারে যার আপনার বলতে কেউ নাই, ভগবান স্বয়ং তার ভার নিয়ে থাকেন। তোমার আর ভাবনা-চিন্তার কোনই কারণ নাই।' এই অভয়বাণী শুনিয়া মহিলাটির প্রাণে নূতন বলের সঞ্চার হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে তিনি মনপ্রাণ সমর্পণপূর্বক একেবারে লুটাইয়া পড়িলেন। ঠাকুরের কৃপায় আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রবেশদ্বার তাঁহার পক্ষে উন্মুক্ত হইয়া গেল। তিনি গোলাপ-মা নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ঠাকুর এবং মাতাঠাকুরানী উভয়েই তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একবার তাঁহার বাটীতে পর্যন্ত গিয়াছিলেন। উহাতে গোলাপ-মা'র আনন্দের আর পরিসীমা ছিল না, তাঁহার নিকট মানবজীবন সার্থক বলিয়া মনে হইয়াছিল।

গোপালের মা'র আসল নাম ছিল—অঘোরমণি দেবী। ঠাকুর উঁহাকে 'কামারহাটির বামনী' বলিয়া উল্লেখ করিতেন। অল্পবয়সে পতিহীনা হইবার পর পটলডাঙ্গার ৺গোবিন্দচন্দ্র দত্ত নামক জনৈক ধনী ব্যক্তির বিধবা পত্নীর সহিত অঘোরমণির পরিচয় ও হৃদ্যতা জন্মে। গোবিন্দবাবুর পত্নী প্রভূত বিত্তশালিনী হইলেও ভোগবিলাসে তাঁহার মতি ছিল না; তিনি অতীব ধর্মপরায়ণা ছিলেন এবং কঠোর, সংযত জীবন যাপন করিতেন। দক্ষিণেশ্বর হইতে তিন মাইল উত্তরে কামারহাটি নামক স্থানে গঙ্গাতীরে ঘাট ও মন্দির নির্মাণ করাইয়া সেই মন্দিরে তিনি ৺শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং অঘোরমণির জন্য তথায় থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। গঙ্গার ঠিক উপরেই একটি ক্ষুদ্র কুঠরিতে অঘোরমণি বাস করিতেন। তিনি অতিশয় স্বাধীনচেতা ছিলেন। নিজের যৎসামান্য নগদ টাকার পুঁজি ছিল; উহার সুদের আয়ের দ্বারাই নিজের অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন মিটিয়া যাইত, কাহারও নিকট কোনও বিষয়ে প্রার্থী হইতেন না। পাথরের মেঝের উপর পাতা একখানি মাদুর, ক্ষুদ্র একটি বিছানা এবং রান্না-খাওয়ার দুচারখানি বাসনপত্র —উহাই ছিল গৃহস্থালীর সাজসরঞ্জাম। এতদ্ভিন্ন সম্পত্তির মধ্যে ছিল একখানি রামায়ণ ও একটি জপমালা। যখনই ইচ্ছা হইত, রামায়ণখানি খুলিয়া পড়িতেন; অবশিষ্ট সময়ে প্রায়শঃ জপধ্যানে কাটাইতেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তিনি একটানা এইভাবেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই বিরামহীন সাধনা ত্রিশ বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক শুভদিনে অঘোরমণি সর্বপ্রথম যখন শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্দর্শনমানসে দক্ষিণেশ্বরে উপনীত হন, তখন জীবনের অধিকাংশ পথ অতিক্রমণপূর্বক তিনি বার্ধক্যে পদার্পণ করিয়াছেন—বয়স প্রায় ষাট বৎসর। তিনি ছিলেন বাৎসল্য-ভাবের সাধিকা; ভগবানের শ্রীগোপালমূর্তিই সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। ঠাকুরকে দেখিয়াই, কি জানি কেন, তাঁহার হৃদয়ে বাৎসল্যরসের সঞ্চার হইল এবং ঠাকুরও তাঁহাকে আপন জননীর ন্যায় গ্রহণ করিলেন। উভয়ের এই ভাব আমরণ বিদ্যমান ছিল। এমন কি, শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী দেবী গোপালের মা কর্তৃক 'বৌমা' সম্বোধনে অভিহিতা হইতেন, কদাচ উহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

প্রাথমিক আলাপ-পরিচয় ও সাদর-সম্ভাষণের পর ঠাকুর অঘোরমণিকে নানাবিধ ধর্মকথা ও কয়েকটি গান শুনাইলেন। তৎপরে অঘোরমণি বিদায় লইবার কালে ঠাকুর তাঁহাকে পুনরায় শীঘ্র আসিবার জন্য বিশেষভাবে বলিয়া দিলেন। বাটী ফিরিবার পথে অঘোরমণির কেবলই মনে হইতে লাগিল—'আহা! লোকটি কি পরম ভক্ত; কথাবার্তা এবং ব্যবহার কেমন মিষ্টি! এঁকে দেখলে হৃদয়ের স্নেহ আপনা থেকে উথলে উঠে। আবার একদিন এঁর কাছে আসতেই হবে।' এদিকে ঠাকুরের ঘরে যাঁহারা তখন উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের নিকট অঘোরমণি এবং গোবিন্দবাবুর পত্নীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তিনি বলিলেন যে, এঁদের মত ভক্তিমতী সচরাচর দেখা যায় না।

অল্পদিনের মধ্যেই অঘোরমণি দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া হাজির হইলেন। আসিবার সময় দুতিন পয়সা মূল্যের যৎসামান্য মিষ্টদ্রব্য কিনিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ঠাকুর কহিলেন—'ওঃ, তুমি এসেছ; দাও দিকিন্ আমার জন্য কি খাবার-টাবার এনেছ।' অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত অঘোরমণি পুঁটুলি হইতে খাবার বাহির করিলে পর ঠাকুর খুব আগ্রহ ও আহ্লাদের সহিত তাহা গ্রহণপূর্বক বলিলেন—'এ যে দেখছি, কিনে এনেছ। কেনবার কি দরকার? নিজেই নারকেলের নাড়ু তৈরি করে রাখবে; আর যখনি এখানে আস, সেই নাড়ু দু'চারটি সঙ্গে করে আনবে। অথবা, নিজের জন্য যা রান্না কর, তা থেকেই একটুখানি নিয়ে আসবে; তোমার হাতের রান্না খেতে আমার বড়ই সাধ যায়।' পরবর্তী কালে অঘোরমণি বলিতেন—'তাঁর মুখে এসব কথা শুনে আমার মনে হল এ কি রকম সাধু, কেবলি খাবার

কথা বলে ! এটা খাব, ওটা খাব। আমি গরীব বিধবা, এত খাবার-টাবার কোত্থেকে জোগাড় করি ! আর এখানে আসা হবে না দেখ্‌চি। কিন্তু যেই দক্ষিণেশ্বরের ফটক পার হয়ে গেলুম, অমনি মনে হল, পেছন থেকে কে যেন আমায় টানছে। অতি কষ্টে নিজেকে কোনরকমে সামলে নিয়ে কামারহাটির দিকে এগুতে থাকলুম।' কয়েকদিন যাইতে না যাইতে অঘোরমণি স্বহস্তে প্রস্তুত ব্যঞ্জন লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঠাকুরও তাহা আহ্লাদের সহিত ভোজনপূর্বক পরম তৃপ্তি প্রকাশ করিলেন।

যত দিন যাইতে লাগিল, ঠাকুরের নিকট অঘোরমণির যাতায়াতও ততই বাড়িতে থাকিল। এক দুর্নিবার শক্তি যেন তাঁহাকে ঠাকুরের নিকট টানিয়া লইয়া আসিত। উহার ফলে তাঁহার মনে এক-একবার দারুণ ভয় ও অনুশোচনার উদয় হইত। অত্যন্ত দুঃখের সহিত তিনি ভাবিতেন, "হায় গোপাল ! সারাজীবন তোমার আরাধনা করে অবশেষে আমার কি এই গতি হল ! তুমি এমন এক সাধুর কাছে আমাকে নিয়ে এলে যে শুধু 'খাই-খাই' আবদারে আমাকে অস্থির করে তুললে ! আমার ধর্মকর্ম সবই গেল !" মনে এইরূপ চিন্তারাশির উদয় হইবার পর অল্পকালমধ্যেই অঘোরমণির এক অদ্ভুত স্বপ্নদর্শন অথবা দিব্যদর্শন ঘটিল,—যাহার ফলে তিনি নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিলেন যে, এই সমুদয় ব্যাপার তাঁহার ইষ্টদেবতা ৺শ্রীশ্রীবালগোপালেরই লীলা। এমন কি, বালগোপালের সাক্ষাৎ দর্শনলাভে বৃদ্ধা ধন্য হইলেন।

উপরিলিখিত ঘটনা-নিচয়ের অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই অঘোরমণি দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া প্রথমে ঠাকুরের সহিত দেখাসাক্ষাতের পর মাতাঠাকুরানীর নিকট গিয়াছেন এবং তথায় নিত্যকার অভ্যাসমত মালাজপ সারিয়া স্বীয় ইষ্টদেবকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় ঠাকুর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—'আর এত মালাজপ কেন? যা পাবার তা কি এখনও পাও নি?'

অঘোরমণি—তাহলে এবার সব ছেড়ে-ছুঁড়ে দেব না কি? আমার কি সাধনভজন সব সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, নিশ্চয়ই।

অঘোরমণি—আর কিছুই বাকী নেই?

শ্রীরামকৃষ্ণ—না। সব পূর্ণ হয়েচে।

অঘোরমণি—তুমি কি ঠিক ঠিক বল্‌চ, আমার সকল কর্ম শেষ হয়েচে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, আমি নিশ্চিত বলছি,—তোমার নিজের জন্যে সাধনার আর কিছুই আবশ্যক নেই; তবে (নিজের শরীর দেখাইয়া) এই খোলটার জন্য নাম জপ করতে পার।

মানুষের পক্ষে এরূপ মহৎ সৌভাগ্য এবং এমন অভয়-বাণী আর কি হইতে পারে? পরবর্তী কালে এই কথাবার্তার উল্লেখ করিতে গিয়া গোপালের মা উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিতেন—'তাঁর মুখে ঐ কথা শুনে আমি থলে-সমেত জপমালা তক্ষণি গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে এলুম। শুধু আমার গোপালের (অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের) মঙ্গলের জন্যে আঙ্গুলের পরে মালাজপ করতুম। বহুদিন পরে আবার একখানা মালা জোগাড় করেছিলুম। একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে ত! মালা জপতে জপতে সময়টা বেশ কেটে যায়। তাই এখন আবার মালা জপি।'

ঠাকুরের নারীভক্তবৃন্দের মুকুটমণি ছিলেন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী। সম্পূর্ণ আত্মত্যাগের, নিঃশেষে নিজেকে মুছিয়া ফেলিবার—এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে অতি বিরল। ভগিনী নিবেদিতার অমর লেখনী-নিঃসৃত একটি অতুলনীয় বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই অধ্যায় শেষ করিব। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর একখানি চমৎকার আলেখ্য এই বর্ণনার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভগিনী নিবেদিতা কলিকাতায় আসিয়া শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর নিকটে বাসা লইয়াছেন এবং তৎসম্পর্কে লিখিতেছেন—"আমাদের এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর যিনি অধীশ্বরী, তাঁহার সম্পর্কে কিছু বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। তাঁহার জীবনের ইতিহাস সুপরিজ্ঞাত। কিরূপে পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, তৎপরে বয়ঃক্রম আঠারো বৎসর না হওয়া পর্যন্ত তিনি স্বামী কর্তৃক বিস্মৃতপ্রায় হইয়াই ছিলেন,—তৎপরে কিরূপে তিনি তাঁহার জননীর সম্মতিক্রমে সুদূর পল্লীগ্রামের আবাস হইতে পদব্রজে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া গঙ্গাতীরবর্তী দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আপন জীবনদেবতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন,—কিরূপে সেই দেবতা বিবাহবন্ধনের কথা অস্বীকার না করিয়াও কহিয়াছিলেন যে, তিনি সংসারধর্ম পরিত্যাগপূর্বক ভিন্ন আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন—কিরূপে সেই মহীয়সী নারী স্বামীর মর্মকথা সম্যক্‌ উপলব্ধি করিয়া প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন, 'ভাল, তাই হউক, পতিরূপে নহে—গুরুরূপে আমাকে শিক্ষাদান কর'—এই

সকল কাহিনী বহুবার বহুস্থলে বর্ণিত হইয়াছে। তখন হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক বৎসর ব্যাপিয়া তিনি সেই উদ্যানবাটিকার একটি ক্ষুদ্র গৃহে তাঁহার জীবনদেবতার সান্নিধ্যে তদ্‌গতপ্রাণা হইয়া বাস করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে গৃহিণী এবং সন্ন্যাসিনী—শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যবর্গের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাগ্রগণ্যা। স্বামীর নিকট যখন প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয়, তখন বয়স ছিল অল্প। সেই শিক্ষা যে কত বহুমুখী ছিল, তাহা মাতাঠাকুরানী গল্পচ্ছলে মাঝে মাঝে খুব মৃদুস্বরে আমাদিগকে বলিয়া থাকেন। ঠাকুর শৃঙ্খলা ভালবাসিতেন—খুঁটিনাটি জিনিসও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিতেন; দিনের বেলায় প্রদীপটি কোথায় রাখিতে হইবে, পিলসুজই বা কোথায় থাকিবে—তাহাও তিনি মাতাঠাকুরানীকে নিজে দেখাইয়া দিতেন। অপরিচ্ছন্নতা তিনি একেবারেই সহ্য করিতে পারিতেন না। যদিও তিনি অত্যন্ত সাদা-সিধা এবং কঠোর সন্ন্যাসজীবন যাপন করিতেন—তবুও সৌন্দর্য, সুশৃঙ্খলা, ভব্যতা—এগুলির তিনি ছিলেন বড়ই পক্ষপাতী। মাতাঠাকুরানীর সেই সময়কার জীবনের একটি খুব উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা আমরা শুনিতে পাই। একদিন তিনি ঝুড়িভরা ফল ও শাকসব্‌জি অত্যন্ত আহ্লাদ-সহকারে ঠাকুরের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন; ছোট শিশু যেমন প্রচুর জিনিসপত্র পাইলে আনন্দে ও গর্বে বুক ফুলাইয়া সকলকে দেখায়—মাতাঠাকুরানীর ভাবও ছিল ঠিক তেমনি। কিন্তু ঠাকুর একটু গম্ভীরভাব ধারণপূর্বক বলিলেন—'এতগুলি কেন? অপচয় ভাল নয়।' বালিকা-বধূর মুখে যে উজ্জ্বল হাসি ঝলমল করিতেছিল, তাহা এই প্রশ্নবাণ-নিক্ষেপের ফলে তৎক্ষণাৎ নিবিয়া গেল—নৈরাশ্যের ছায়া আসিয়া সুকুমার মুখখানি মুহূর্তে নিষ্প্রভ করিয়া দিল। 'এতগুলি কখনই আমার একার জন্যে নয়'—এই উত্তর দিয়া তিনি মুখ ফিরাইয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে উহা বিচলিত না করিয়া পারিল না। যে সকল যুবক ভক্ত তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন—'তোদের মধ্যে কেউ একজন এক্ষণি যা, গিয়ে ওঁকে ফিরিয়ে আন। ওঁর চোখে জল দেখলে আমার ঈশ্বরভক্তি পর্যন্ত উবে যাবে!'

"ঠাকুরের নিকট মাতাঠাকুরানী এমনি ভালবাসার পাত্রী ছিলেন! কিন্তু তাঁহার আচরণের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে—যে ঠাকুরকে তিনি সারাক্ষণ

অন্তরে পূজা করেন, সেই ঠাকুরের বিষয়ে কিছু বলিতে গেলে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিতের ন্যায় কথাবার্তা বলেন। যাঁহারা সর্বদা মাতাঠাকুরানীর কাছে থাকেন, তাঁহারা বলেন যে, ঠাকুর যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটি উপদেশবাক্য জীবনে রূপায়িত করিবার জন্য মাতাঠাকুরানীর সঙ্কল্প সর্বদা সকল অবস্থায় মেরুর ন্যায় অটল। কিন্তু যখনই মাতাঠাকুরানী ঠাকুরকে উল্লেখ করিতে চাহেন, তখনই 'গুরুদেব' শব্দটি ব্যবহার করেন—এমন একটি শব্দও তিনি কদাচ উচ্চারণ করেন না, যদ্দ্বারা বুঝা যাইতে পারে যে, ঠাকুরের সম্পর্কে কোনরূপ নিকটতর সম্বন্ধের দাবি তাঁহার রহিয়াছে। যদি কেহ তাঁহার আসল পরিচয় না জানে, তবে সেই ব্যক্তি কখনও মনে করিতে পারিবে না যে, ঠাকুরের সহিত মাতাঠাকুরানীর কোনরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান,—এবং ঠাকুরের উপর অন্যান্য শিষ্যাদের তুলনায় তাঁহার দাবির মাত্রা অধিক, কিংবা তাঁহার আসন অধিকতর নিকটবর্তী। মাতাঠাকুরানীর আচরণ দেখিলে মনে হয়, তিনি যেন শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যা ব্যতিরিক্ত অপর কিছু বলিয়া নিজেকে ভাবেনই না,—তিনি যে কখনও ঠাকুরের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, সে কথা মন হইতে একেবারেই মুছিয়া ফেলিয়াছেন।

* * *

"আমার সর্বদাই একথা মনে হয় যে, আদর্শ ভারত-ললনা কেমনটি হওয়া উচিত—সে সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ মনে মনে যে ধারণা পোষণ করিতেন, মাতাঠাকুরানী তাহারই পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। কিন্তু সত্যই তিনি কি শুধু একটি পুরাতন আদর্শের শেষ মূর্ত বিগ্রহ? একথা কি আমরা মনে করিতে পারি না যে, তিনি এক নূতন আদর্শের স্থাপয়িত্রী?"

বিবিধ প্রসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্যবর্গের সামান্য পরিচয় এবং দক্ষিণেশ্বরে তাঁহাদের আগমনের কথা পূর্ববর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ১৮৭৫ হইতে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিরোধানের সময় পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন জাতীয় ইতিহাসের দিক হইতে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ঐ সময়েই তিনি নব্যবঙ্গের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। আমরা দেখিতে পাই যে, উক্ত সময়ের মধ্যে এক দিকে তিনি ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনপূর্বক ভাবের আদান-প্রদান করিতেছেন, অপর দিকে যে-সকল শক্তিমান যুবক শ্রীগুরুর ভাবধারার অনুশীলনে ও প্রচারে নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ করিবেন, তাঁহাদিগকে নিকটে টানিয়া অপরিসীম যত্ন ও ভালবাসার সহিত সাধনার পথে হাত ধরিয়া সম্মুখে লইয়া চলিয়াছেন। কিন্তু উহাতেই তাঁহার কার্য সীমাবদ্ধ নহে। দেশের হাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছে, নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ কে কোন্ পথের পথিক, কে কতদূর শক্তিমান্, উহা জানিবার নিমিত্ত তাঁহার হৃদয়ে ছিল অপার কৌতূহল। সে যুগে দেশের যাঁহারা চিন্তানায়ক এবং হিন্দুধর্মের সংস্কার ও পুনরুদ্ধারের জন্য যাঁহারা যত্নশীল, তাঁহাদের অনেকের সহিত তিনি নিজে যাচিয়া আলাপ করিয়াছিলেন। ঐসকল সাক্ষাৎকারের বিবরণ অতি সামান্যই লিপিবদ্ধ হইতে পারিয়াছিল; কিন্তু যেটুকু পাওয়া যায়, সেটুকু পড়িয়াই আমরা মুগ্ধ হই। মাত্র দু'তিনটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ নিম্নে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হইল।* আরও জানিতে হইলে পাঠককে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইবে।

বিদ্যাসাগর—সর্বপ্রথমে আমরা বলিব প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত মিলনের কথা। ঠাকুর বাল্যকাল হইতেই বিদ্যাসাগরের নাম শুনিয়া আসিতেছিলেন এবং তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ মনোমধ্যে পোষণ করিতেন। 'শ্রীম' আসিবার পর উক্ত বাসনা চরিতার্থ করিবার উত্তম সুযোগ উপস্থিত হইল, কারণ তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগরের স্কুলের মাস্টার ও

---

* এই সকল বিবরণ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থ হইতে হয় অক্ষরশঃ, নতুবা ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করা হইয়াছে।

বিশেষ স্নেহভাজন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট অপরাহ্ণে মাস্টার মহাশয় পরমহংসদেবকে বিদ্যাসাগরবাটীতে লইয়া যান। বিদ্যাসাগর মহাশয় পরম সমাদরে ও শ্রদ্ধাভরে ঠাকুরকে অভ্যর্থনাপূর্বক প্রথমে জলযোগ করাইলেন। তৎপরে প্রাণখোলাভাবে উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা আরম্ভ হইল। আলাপের মধ্যে দু'জনের রসিকতারও প্রচুর নিদর্শন আমরা দেখিতে পাই।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল, বিল, হ্রদ, নদী দেখেছি; এইবার সাগর দেখছি (সকলের হাস্য)।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান (হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো! নোনা জল কেন? তুমি ত অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর (সকলের হাস্য)! তুমি ক্ষীরসমুদ্র (সকলের হাস্য)!

* * *

তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বের রজঃ। সত্ত্বগুণ থেকে দয়া* হয়। দয়ার জন্য যে কর্ম করা যায়, সে সাত্ত্বিক কর্ম বটে—কিন্তু এ রজোগুণ সত্ত্বের রজোগুণ, এতে দোষ নেই। শুকদেবাদি লোকশিক্ষার জন্য দয়া রেখেছিলেন—ঈশ্বরবিষয় শিক্ষা দিবার জন্য। তুমি বিদ্যাদান, অন্নদান করছো, এও ভাল। নিষ্কাম করতে পারলে এতেই ভগবান্ লাভ হয়। কেউ করে নামের জন্য, পুণ্যের জন্য, তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়। আর সিদ্ধ তুমি ত আছই।

বিদ্যাসাগর—মহাশয়, কেমন করে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আলু-পটল সিদ্ধ হলে ত নরম হয়, তা তুমি ত খুব নরম। তোমার অত দয়া (হাস্য)!

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—কলাইবাটা-সিদ্ধ ত শক্তই হয় (সকলের হাস্য)!

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি তা নও গো; শুধু পণ্ডিতগুলো দরকচা-পড়া। না এদিক, না ওদিক। শকুনি খুব উঁচুতে উঠে, তার নজর ভাগাড়ে। যারা শুধু পণ্ডিত, শুনতেই পণ্ডিত, কিন্তু তাদের কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি—শকুনির মত পচা মড়া খুঁজছে। আসক্তি অবিদ্যার সংসারে। দয়া, ভক্তি, বৈরাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য।"

* "দয়া খুব ভাল। দয়া আর মায়া অনেক তফাত। দয়া ভাল, মায়া ভাল নয়। মায়া আত্মীয়ের উপর ভালবাসা, স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগিনী, ভাইপো, ভাগনে, বাপ, মা, এদেরই উপর। দয়া সর্বভূতে সমান ভালবাসা।"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া শুনিতেছেন। আর যাঁহারা উপস্থিত, তাঁহারাও পরম ভক্তিভরে কথামৃত পান করিতেছেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—এই জগতে বিদ্যামায়া অবিদ্যামায়া দুই-ই আছে; জ্ঞান-ভক্তি আছে, আবার কামিনীকাঞ্চনও আছে; সৎও আছে, অসৎও আছে। ভালও আছে, আবার মন্দও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ভাল-মন্দ জীবের পক্ষে, সৎ-অসৎ জীবের পক্ষে, তাঁর ওতে কিছু হয় না। যেমন প্রদীপের সম্মুখে কেহ বা ভাগবত পড়ছে, আর কেহ বা জাল করছে। প্রদীপ নির্লিপ্ত।...

ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়্‌দর্শন, সব এঁটো হয়ে গেছে। মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে—তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিসটি ব্রহ্ম! ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্যন্ত কেউ মুখে বলতে পারে নাই।

বিদ্যাসাগর—বা! এটি ত বেশ কথা! আজ একটি নূতন কথা শিখলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—...তবে বেদে পুরাণে যা বলেছে, সে কি রকম বলা জান? একজন সাগর দেখে এলে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, কেমন দেখলে, সে লোক মুখ হা করে বলে, 'ও! কি দেখলুম! কি হিল্লোল, কল্লোল!' ব্রহ্মের কথাও সেইরকম। বেদে আছে তিনি আনন্দস্বরূপ, সচ্চিদানন্দ। শুকদেবাদি এই ব্রহ্মসাগরতটে দাঁড়িয়ে দর্শন, স্পর্শন করেছিলেন। এক মতে আছে, তাঁরা এ সাগরে নামেন নাই। এই সাগরে নামলে আর ফিরবার জো নাই।"

শ্রোতৃবর্গের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমাধিস্থ ব্যক্তি কি কখনও কথা বলেন না?"

"শ্রীরামকৃষ্ণ—শঙ্করাচার্য লোকশিক্ষার জন্য বিদ্যার 'আমি' রেখেছিলেন। ব্রহ্মদর্শন হলে মানুষ চুপ হয়ে যায়। যতক্ষণ দর্শন না হয়, ততক্ষণই বিচার। ঘি কাঁচা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই কলকলানি। পাকা ঘির কোন শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন পাকা ঘিয়ে আবার কাঁচা লুচি পড়ে, তখন আর একবার ছ্যাঁক—কলকল করে। যখন কাঁচা লুচিকে পাকা করে, তখন আবার চুপ হয়ে যায়। তেমনি সমাধিস্থ পুরুষ লোকশিক্ষা দিবার জন্য আবার নেমে আসে, আবার কথা কয়।

* * *

কলিতে অন্নগত প্রাণ, দেহবুদ্ধি যায় না। এ অবস্থায় 'সোঽহং' বলা ভাল

নয়। সবই করা যাচ্ছে, আবার 'আমিই ব্রহ্ম' বলা ঠিক নয়। যারা বিষয় ত্যাগ করতে পারে না, যাদের 'আমি' কোনমতে যাচ্ছে না, তাদের 'আমি দাস', 'আমি ভক্ত'—এ অভিমান ভাল। ভক্তিপথে থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়। ···তিনি যতক্ষণ 'আমি' রেখে দেন, ততক্ষণ ভক্তিপথই সোজা।

বিজ্ঞানী দেখে যিনিই ব্রহ্ম তিনিই ভগবান্; যিনিই গুণাতীত তিনিই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান্। এই জীব-জগৎ, মন, বুদ্ধি, ভক্তি, বৈরাগ্য, জ্ঞান, এ সব তাঁর ঐশ্বর্য। (সহাস্যে) যে বাবুর ঘর-দ্বার নাই, হয়তো বিকিয়ে গেলো, সে বাবু কিসের বাবু (সকলের হাস্য)! ঈশ্বর ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। সে ব্যক্তির যদি ঐশ্বর্য না থাকতো তাহলে কে মানতো (সকলের হাস্য)!

দেখ না, এই জগৎ কি চমৎকার। কতরকম জিনিস, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র। কতরকম জীব। বড়-ছোট, ভাল-মন্দ, কারু বেশী শক্তি, কারু কম শক্তি।

বিদ্যাসাগর—তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন? তাহলে ত ঈশ্বরেতে বৈষম্যদোষ হয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিভুরূপে তিনি সর্বভূতে আছেন। পিঁপড়েতে পর্যন্ত। কিন্তু শক্তিবিশেষ। তা না হলে একজন লোকে দশজনকে হারিয়ে দেয়, আবার কেউ একজনের কাছ থেকে পালায়। আর তা না হলে তোমাকেই বা সবাই মানে কেন? তোমার কি শিং বেরিয়েছে দুটো (হাস্য)? তোমার দয়া, তোমার বিদ্যা আছে—অন্যের চেয়ে, তাই তোমাকে লোকে মানে, দেখতে আসে। তুমি একথা মানো কি? (বিদ্যাসাগরের মৃদুহাস্য)"

এইরূপে নানা কথাবার্তা বলিতে বলিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমাধি উপস্থিত হইল। উহার ঘোর কিঞ্চিৎ কাটিয়া যাইবার পর প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় তিনি দু'তিনটি শ্যামাসঙ্গীত গাহিলেন এবং তৎপরে আবার বলিতে লাগিলেন—"কেউ কেউ মনে করে, বেশী ঈশ্বর, ঈশ্বর করলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। তা নয়। এ যে সুধার হ্রদ, অমৃতের সাগর। বেদে তাঁকে অমৃত বলেছে, এতে ডুবে গেলে মরে না—অমর হয়।

"পূজা, হোম, যাগ, যজ্ঞ কিছুই কিছু নয়। যদি তাঁর উপর ভালবাসা আসে, তাহলে আর এসব কর্মের বেশী দরকার নাই। যতক্ষণ হাওয়া পাওয়া না যায়, ততক্ষণই পাখার দরকার; যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি আসে, পাখা রেখে দেওয়া যায়। আর পাখার কি দরকার?

"তুমি যেসব কর্ম করছো, এসব সৎকর্ম। যদি 'আমি কর্তা' এই অহঙ্কার ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে করতে পারো, তাহলে খুব ভাল। এই নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ঈশ্বরেতে ভক্তি-ভালবাসা আসে, ঈশ্বরলাভ হয়।

"অন্তরে সোনা আছে, এখনও খপর পাও নাই। একটু মাটি চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, অন্য কাজ কমে যাবে।···

"এ যা বল্লুম, বলা বাহুল্য, আপনি সব জানেন—তবে খপর নাই (সকলের হাস্য)। বরুণের ভাণ্ডারে কত কি রত্ন আছে! বরুণ রাজার খপর নাই।"

কথাবার্তায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এবারে বিদায়গ্রহণের পালা। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং আগে আগে বাতি দেখাইয়া সিঁড়ি নামিলেন এবং তৎপরে বাগান পার হইয়া, ফটক পর্যন্ত যাইয়া ঠাকুরকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। কাজটি সামান্য হইলেও কী গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন! স্মরণ রাখা উচিত যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন দেশপূজ্য ব্যক্তি এবং বয়সে ঠাকুরের চেয়ে ষোল বৎসরের বড়।

শশধর তর্কচূড়ামণি—১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুন রথযাত্রার দিনে ঠাকুর ঠনঠনিয়াতে ভক্ত ঈশান মুখুজ্যের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া অসিয়াছেন। তথায় উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইলেন যে, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি নিকটেই কাহারও বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত অনেক দিন যাবৎই ঠাকুরের মনে মনে প্রবল ইচ্ছা ছিল। এবার সুযোগ উপস্থিত। হিন্দুশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা এবং হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের সমর্থকরূপে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির তখন দেশময় খ্যাতি। ভক্তেরা ঠিক করিলেন, বৈকালে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট ঠাকুরকে লইয়া যাইবেন।

তর্কচূড়ামণি যে বাড়ীতে ছিলেন, বিকালে চারটার সময় ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া ঠাকুরকে তথায় লইয়া যাওয়া হইল। অভ্যর্থনার নিমিত্ত গৃহস্বামী বাটীর দরজায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি পরম সমাদরে ঠাকুরকে দোতলায় তর্কচূড়ামণির নিকটে লইয়া গেলেন। পণ্ডিতের বয়স প্রৌঢ়, বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। অতিশয় বিনীতভাবে প্রণামপূর্বক তিনি ঠাকুরকে বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া বসাইলেন এবং তৎপরে অপর সকলে উপবেশন করিলেন।

আসনগ্রহণের পর ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ ভাবাবিষ্ট হইয়া রহিলেন। ভাবাবেশ

কমিবার পর কথাবার্তা আরম্ভ হইল। তর্কচূড়ামণি সাধারণের মধ্যে খুব বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন এবং ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান যথাযথভাবে পালনের উপর বক্তৃতায় খুব জোর দিতেন। ঐ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই যেন ঠাকুর বলিতে আরম্ভ করিলেন—"কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি। শাস্ত্রে যে-সকল কর্মের কথা আছে, তার সময় কই? আজকালকার জ্বরে দশমূল পাঁচন চলে না। দশমূল পাঁচন দিতে গেলে রোগীর এদিকে হয়ে যায়! আজকাল ফিবার মিক্‌শ্চার। কর্ম করতে যদি বল ত নেজামুড়া বাদ দিয়ে বলবে। আমি লোকদের বলি, তোমাদের 'আপোধন্বন্ত্বা' ও-সব এত বল্‌তে হবে না। তোমাদের গায়ত্রী জপলেই হবে।···

"হাজার লেকচার দাও, বিষয়ী লোকদের কিছু করতে পারবে না। পাথরের দেওয়ালে কি পেরেক মারা যায়? পেরেকের মাথা ভেঙ্গে যাবে ত দেওয়ালের কিছু হবে না! তরোয়ালের চোট মারলে কুমীরের কি হবে? সাধুর কমণ্ডলু (তুম্বা) চার ধাম করে আসে, কিন্তু যেমন তেঁতো তেমনি তেঁতো। তোমার লেকচারে বিষয়ী লোকদের বড় কিছু হচ্ছে না। তবে তুমি ক্রমে ক্রমে জানতে পারবে।··· কে ভক্ত, কে বিষয়ী চিনতে পার না। তা সে তোমার দোষ নয়। প্রথম ঝড় উঠলে কোন্‌টা তেঁতুল গাছ, কোন্‌টা আম গাছ বুঝা যায় না।

"ঈশ্বরলাভ না হলে কেউ একেবারে কর্মত্যাগ করতে পারে না। সন্ধ্যাদি কর্ম কত দিন? যতদিন না ঈশ্বরের নামে অশ্রু আর পুলক হয়। একবার 'ওঁ রাম' বলতে যদি চক্ষে জল আসে, নিশ্চয় জেনো তোমার কর্ম শেষ হয়েছে। আর সন্ধ্যাদি কর্ম করতে হবে না। ··· সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী প্রণবে লয় হয়। প্রণব সমাধিতে লয় হয়। যেমন ঘণ্টার শব্দ টং-ট-অম্। যোগী নাদ ভেদ করে পরব্রহ্মে লয় হন। সমাধির মধ্যে সন্ধ্যাদি কর্মের লয় হয়।"

সমাধির কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। মুখমণ্ডলে স্বর্গীয় জ্যোতি, দেহ কঠিন, নেত্র নিস্পলক, বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত। অনেকক্ষণ পরে পানীয় জল চাহিলেন; উহাই সমাধিভঙ্গের লক্ষণ। সমাধির পরে জল খাইতে চাহিলেই ভক্তেরা বুঝিতে পারিতেন যে, এবারে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিতেছে। প্রকৃতিস্থ হইয়া তর্কচূড়ামণির প্রতি কহিলেন—"বাবা, আর

একটু বল বাড়াও, আর কিছুদিন সাধনভজন কর। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি; তবে তুমি লোকের ভালর জন্য এসব করছ। যখন প্রথমে তোমার কথা শুনলুম, জিজ্ঞাসা করলুম যে এই পণ্ডিত কি শুধু পণ্ডিত, না বিবেক-বৈরাগ্য আছে? যে পণ্ডিতের বিবেক নাই, সে পণ্ডিতই নয়। যদি আদেশ হয়ে থাকে, তাহলে লোকশিক্ষায় দোষ নাই। আদেশ পেয়ে যদি কেউ লোকশিক্ষা দেয়, তাকে কেউ হারাতে পারে না। বাগ্বাদিনীর কাছ থেকে যদি একটি কিরণ আসে, তাহলে এমন শক্তি হয় যে, বড় বড় পণ্ডিতগুলো কেঁচোর মত হয়ে যায়।

"প্রদীপ জ্বাললে বাদুলে পোকাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আপনি আসে, ডাকতে হয় না। তেমনি যে আদেশ পেয়েছে, তার লোক ডাকতে হয় না; অমুক সময় লেকচার হবে বলে খবর পাঠাতে হয় না। তার নিজের এমনি টান যে, লোক তার কাছে আপনি আসে। ... যে লোকশিক্ষা দিবে, তার খুব শক্তি চাই। চৈতন্যদেব অবতার। তিনি যা করে গেলেন তারই কি রয়েছে বল দেখি? আর যে আদেশ পায় নাই, তার লেকচারে কি উপকার হবে? তাই বলছি, ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও।" এইসকল কথা বলিতে বলিতে প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া ঠাকুর গান ধরিলেন—

'ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন,
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেমরত্নধন।'

তৎপরে অমৃতস্বরূপের গুণ ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন যে, ঈশ্বরলাভই আসল বস্তু। উহা হইলে আদেশও হয়, লোকশিক্ষাও হয়। পুনরায় জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির তুলনা করিয়া কহিলেন যে, এ যুগের পক্ষে ভক্তিমার্গ ই উপযোগী। কিন্তু ভক্তি দ্বারা কি ব্রহ্মজ্ঞান পাওয়া যায়? তিনি কহিলেন যে, নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। পথ তিনটি বিভিন্ন হইলেও গন্তব্যস্থল এক। ভক্তবৎসল ইচ্ছামাত্রই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন। জগতের মা'কে পাইলে জ্ঞান, ভক্তি সবই পাওয়া যায়।

তর্কচূড়ামণি তীর্থযাত্রার কথা পাড়িলেন এবং ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন, তিনি তীর্থে গিয়াছেন কি-না ও কতদূর পর্যন্ত। ঠাকুর উত্তর করিলেন—"হাঁ, কতক জায়গা দেখেছি। (সহাস্যে) হাজরা অনেক দূর গিছল, আর খুব উঁচুতে উঠেছিল। হৃষীকেশ গিছল। (সকলের হাস্য) আমি অতদূর যাই নাই, অত

উঁচুতেও উঠি নাই। চিল শকুনিও অনেক উচ্চে উঠে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে (সকলের হাস্য)। ভাগাড় কি জান? কামিনীকাঞ্চন। যদি এখানে থেকে ভক্তিলাভ করতে পার, তীর্থে যাবার কি দরকার? ... তীর্থে গিয়ে যদি ভক্তিলাভ না হলো, তাহলে তীর্থে যাওয়ার আর ফল হল না। আর ভক্তিই সার, একমাত্র প্রয়োজন।"

তৎপরে পরমহংসদেব তিনরকম বৈদ্য ও তিনরকম আচার্যের কথা বলিলেন। অধম থাকের বৈদ্য শুধু নাড়ী দেখিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া যায়, রোগীর আর কোন খোঁজ-খবর লয় না। সেইরূপ কতক আচার্য শুধু উপদেশ দিয়াই আপন কর্তব্য শেষ করে, উপদেশের ফলাফল কি হইল তাহার কোন সন্ধান রাখে না। উহারা অধম থাকের আচার্য।

যাঁহারা মধ্যম থাকের বৈদ্য, তাঁহারা রোগীর জন্য ঔষধব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না; রোগী স্বেচ্ছায় ঔষধ না খাইলে, তাহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইয়া রাজী করান। মধ্যম শ্রেণীর আচার্যের ব্যবহারও তদ্রূপ। লোক যদি সোজা পথে না চলে, তবে তাঁহারা ভাল কথায় নানাপ্রকারে চেষ্টা করেন তাহাদিগকে সৎপথে লইয়া যাইতে।

উত্তম বৈদ্য আরও আগাইয়া যান। মিষ্ট কথায় যদি রোগীকে পথে আনিতে পারা না যায়, তবে আবশ্যকবোধে তাহার বুকে হাঁটু দিয়া ঔষধ খাওয়ান। তদ্রূপভাবে উত্তম থাকের যিনি আচার্য, তিনি শিষ্যদিগকে সৎপথে আনিবার জন্য বলপ্রয়োগেও দ্বিধা করেন না।

এইরূপ হৃদয়গ্রাহী বাক্যালাপে বহুক্ষণ কাটাইয়া গাত্রোত্থানের সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আজ আমার খুব দিন। আমি দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখলাম (সকলের হাস্য)। দ্বিতীয়ার চাঁদ কেন বললুম জান? সীতা রাবণকে বলেছিলেন, 'রাবণ পূর্ণচন্দ্র, আর রামচন্দ্র আমার দ্বিতীয়ার চাঁদ।' রাবণ মানে বুঝতে পারে নাই, তাই ভারি খুশী। সীতার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, রাবণের সম্পদ যতদূর হবার হয়েছে, এইবার দিন দিন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় হ্রাস পাবে। রামচন্দ্র দ্বিতীয়ার চাঁদ, তাঁর দিন দিন বৃদ্ধি হবে।" এই আশীর্বাণী ও গল্পের দ্বারা ঠাকুর স্পষ্ট ইঙ্গিত করিলেন যে, তর্কচূড়ামণির খ্যাতি-প্রতিপত্তি আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে। তৎপরে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তগণসহ বিদায় লইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র—১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে অধরচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটীতে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত পরমহংসদেবের সাক্ষাৎকার ঘটে। বঙ্কিম ও অধর ছিলেন সহকর্মী (ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট) এবং পরস্পর পরম বন্ধু। আবার অধর ছিলেন ঠাকুরের পরম ভক্ত। খুব সম্ভবতঃ তিনিই উভয়কে একসঙ্গে নিমন্ত্রণপূর্বক এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিয়াই অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে ঠাকুর বুঝিতে পারিলেন যে, ইনি কৃষ্ণভক্ত। ইংরেজগণ (বিশেষতঃ পাদ্রীসাহেবেরা) রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্ব কিছুই না বুঝিয়া, কিংবা হয়তো ইচ্ছাপূর্বকই, উহার কুৎসা রটনা করিতেন। উহার প্রতিবাদে বঙ্কিমচন্দ্র কিছুদিন পূর্বে ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং উক্ত প্রবন্ধে রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলনকে পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমের সহিত দেখা হইলে পরমহংসদেব কি জানি কেন, রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব সম্পর্কেই কথা পাড়িলেন। তিনি কহিলেন, যুগলমূর্তির মানে কি? মানে—অভেদ। পুরুষ ও প্রকৃতি একসঙ্গে ব্যতীত থাকিতে পারেন না; যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তির পৃথক অস্তিত্ব কদাচ কল্পনাই করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নূতন জিনিস, তিনি একেবারে বিমোহিত হইয়া গেলেন। তিনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি এসকল অমূল্য তত্ত্ব লোকসমাজে প্রচার করেন না কেন?" উত্তরে ঠাকুর বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, অধিকারী বুঝিয়া তত্ত্বকথা বলিতে হয় এবং ঈশ্বরের আদেশ ব্যতীত প্রচারকার্য করিতে নাই। তৎপরে বঙ্কিম-চন্দ্রের অপর একটি ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার উদ্দেশ্যেই যেন তিনি বঙ্কিমকে প্রশ্ন করিলেন—"তুমি কি বল? আগে বিবিধ বস্তুর জ্ঞান, না আগে ঈশ্বর?" বঙ্কিম নিঃসঙ্কোচে বলিলেন—"আগে জগতের সম্পর্কে দশটা জানতে হয়, একটু পড়াশুনা করতে হয়—সৃষ্টির বিষয়ে একটু না জানলে স্রষ্টার কথা ভাবব কেমন করে?" তখন ঠাকুর তাঁহার সেই পুরাতন উপমার সাহায্যে বুঝাইলেন—"তুমি বাগানে আম খেতে এসেছ, আম খেয়ে যাও, বাগানে কত আমগাছ, কত ডাল, কত আম, কত পাতা—এগুলো দিয়ে তোমার দরকার কি? আরও দেখ, সব লোক বাবুর বাগান দেখে অবাক্—কেমন গাছ, কেমন ফুল, কেমন ঝিল, কেমন বৈঠকখানা, কেমন তার ভিতর ছবি—এসব দেখেই অবাক্। কিন্তু কই বাগানের মালিক যে বাবু, তাঁকে খোঁজে ক'জন?" বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা

করিলেন, "তাঁকে পাই কেমন করে?" ঠাকুর কহিলেন, "ব্যাকুলভাবে তাঁর নিকট প্রার্থনা কর। ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।"

এইভাবে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর কীর্তন আরম্ভ হইল। ঠাকুর ভাবাবেশে সহসা দাঁড়াইয়া একেবারে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন এবং সমাধির ভাব কিঞ্চিৎ তিরোহিত হইলে অর্ধবাহ্যদশায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। এমন দৃশ্য বঙ্কিমচন্দ্র জীবনে কখনও দেখেন নাই; প্রাণ ভরিয়া উহা উপভোগ করিতে লাগিলেন।

প্রতিভার মূর্তবিকাশ বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত বাক্যালাপে পরমহংসদেবও পরম সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন। উভয়ের দেখাসাক্ষাতের অল্প কয়েক দিন পরেই আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার নির্দেশানুযায়ী মাস্টার মহাশয় 'দেবীচৌধুরানী' বইখানি দক্ষিণেশ্বরে লইয়া গিয়া উহার অংশবিশেষ ঠাকুরকে পড়িয়া শুনাইতেছেন এবং ঠাকুর তাহা শুনিতে শুনিতে কখনও অনুকূল, কখনও প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। কি অপার কৌতূহল, কি অপরিসীম সহানুভূতি!

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী এক অদ্ভুত জিনিস। উহা ঘরে ঘরে এবং দেশেবিদেশে সমাদৃত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। উহার আসল কারণ এই যে, বাক্যসমূহ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের উক্তি, এবং তজ্জন্য অসীম শক্তিসম্পন্ন। তদ্দ্বারা নাস্তিকের মনেও প্রত্যয় উৎপন্ন হয়। আর, গৌণ হইলেও একটি বিশেষ কারণ এই যে, পরমহংসদেবের কথা বলিবার একটি বিশেষ ভঙ্গী ছিল। নিতান্ত সহজ, সরল ভাষায়—উপমা, গল্প প্রভৃতির সাহায্যে অতীব দুরূহ তত্ত্বসমূহ তিনি ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন,—আবার দু'একটি সংক্ষিপ্ত, বিদ্যুৎপ্রভ, সুতীক্ষ্ণ বাক্যের দ্বারা লোকের ভুল-ভ্রান্তি, ভণ্ডামি মুহূর্তে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিতেন। এ বিষয়ে যীশুখ্রীষ্টের সহিত তাঁহার প্রভূত সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয়েই খুব সহজবোধ্য ভাষায় তাঁহাদের অগ্নিগর্ভ বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় কিংবা দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে তাঁহার কতক উপদেশাবলী ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, সুরেশচন্দ্র দত্ত ও রামচন্দ্র দত্ত কর্তৃক সংকলিত এবং মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু উক্ত সংকলন-সমূহ ছিল অতিশয় সংক্ষিপ্ত এবং সূত্রাকারে নিবদ্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর সম্পূর্ণ এবং জীবন্ত রূপ আমরা পাই শ্রীম-লিখিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থে।

স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' পুস্তকেও পরমহংসদেবের বহু উক্তি এবং আখ্যায়িকা সুচারুভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকের পক্ষে ঐসকল শাশ্বত বাণীই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রকৃষ্ট পরিচয়। উহা বারংবার পড়িলে এবং অনুধ্যান করিলে মনে হয় যেন তাঁহাকে চোখে দেখিবার সৌভাগ্য না হইলেও তাঁহার কথা স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি এবং তদ্দ্বারা আমাদের বহু সন্দেহের নিরসন এবং বহু সমস্যার সমাধান তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে। দু'চারিটি মাত্র দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যাইতে পারে।

সাংখ্যদর্শনের পুরুষ-প্রকৃতির সুস্পষ্ট ধারণা করিতে বেগ পাইতে হইতেছে কি? তবে শুনুন—"ওই যে গো দেখনি, বে-বাড়ীতে? কর্তা হুকুম দিয়ে নিজে বসে বসে আলবোলায় তামাক টানছে। গিন্নী কিন্তু কাপড়ে হলুদ মেখে একবার এখানে, একবার ওখানে বাড়ীময় ছুটোছুটি করে এ-কাজটা হল কি না, ও-কাজটা করলে কি না, সব দেখ্ছেন শুন্ছেন, বাড়ীতে যত মেয়েছেলে আস্ছে তাদের আদর-অভ্যর্থনা করছেন—আর মাঝে মাঝে কর্তার কাছে এসে হাতমুখ নেড়ে শুনিয়ে যাচ্ছেন—'এটা এইরকম করা হল, ওটা এইরকম হল, এটা করতে হবে, ওটা করা হবে না'—ইত্যাদি। কর্তা তামাক টানতে টানতে সব শুনছেন আর 'হুঁ' 'হুঁ' করে ঘাড় নেড়ে সব কথায় সায় দিচ্ছেন!—সেইরকম আর কি!"

বেদান্তের মতে পুরুষ ও প্রকৃতি পৃথক্ নহে; একই বস্তু কখনও এভাবে কখনও অন্যভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে। "সেটা কি রকম জানিস্? যেমন সাপটা কখনও চল্ছে, কখনও স্থির হয়ে পড়ে আছে। যখন স্থির হয়ে আছে, তখন হল পুরুষভাব—প্রকৃতি তখন পুরুষের সঙ্গে মিশে এক হয়ে আছে। আর যখন সাপটা চলছে, তখন যেন প্রকৃতি পুরুষ থেকে আলাদা হয়ে কাজ করছে!" অন্যত্র—"আদ্যাশক্তি আর পরব্রহ্ম অভেদ। একটিকে ছেড়ে আর একটিকে চিন্তা করবার জো নাই। যেমন জ্যোতি আর মণি। মণিকে ছেড়ে মণির জ্যোতিকে ভাববার জো নাই। সাপ আর তির্যগ্‌গতি। সাপকে ছেড়ে তির্যগ্‌গতি ভাববার জো নাই; আবার সাপের তির্যগ্‌গতি ছেড়ে সাপকে ভাববার জো নাই।"

প্রকৃতি ও পুরুষ যদি অগ্নি এবং অগ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায় নিত্যযুক্ত হন,—মায়া যদি ব্রহ্মেরই শক্তি এবং ব্রহ্মেতেই অধিষ্ঠিত হন, তাহা হইলে

সহজেই এই প্রশ্ন উঠে যে, ঈশ্বরও কি তবে মায়াবদ্ধ? পরমহংসদেব ইহার উত্তরে কহিয়াছেন, "না রে, তা নয়। এই দেখ্ না—সাপ যাকে কামড়ায় সে-ই মরে; সাপের মুখে বিষ সর্বদা রয়েছে, সাপ সর্বদা সেই মুখ দিয়ে খাচ্ছে, ঢোক গিলছে, কিন্তু সাপ নিজে ত মরে না—সেইরকম!"

তত্ত্বজ্ঞানবিহীন পাণ্ডিত্যের আবরণে সহজ সত্য চাপা পড়িবার উপক্রম। একটিমাত্র বাক্যের প্রভাবে কিরূপে সেই আবরণ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেছে, তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন। "এক হরিসভায় আমায় নিয়ে গিছলো। আচার্য হয়েছিলেন একজন পণ্ডিত, তাঁর নাম সামাধ্যায়ী। বলে কি ঈশ্বর নীরস, আমাদের প্রেম ভক্তি দিয়ে তাঁকে সরস করে নিতে হবে। শুনে ত অবাক্! বেদে যাঁকে 'রসস্বরূপ' বলেছে, তাঁকে কি না নীরস বলে! আর এতে বোধ হচ্ছে, সে-ব্যক্তি ঈশ্বর কি বস্তু কখনও জানে নাই! তাই এরূপ গোলমেলে কথা।

"একজন বলেছিল তার মামার বাড়ীতে একগোয়াল ঘোড়া আছে। একথায় বুঝতে হবে ঘোড়া আদবে নাই; কেন না, গোয়ালে ঘোড়া থাকে না।"

কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায় আহার-বিহারে অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দু; তাঁহার দৃষ্টিতে কেশববাবুর আচার-ব্যবহার অতিশয় 'অহিন্দু'। ঠাকুর যে কেশববাবুর বাড়ীতে যান এবং আহারাদি করেন, উহা উপাধ্যায়জীর মনঃপূত নহে। ঠাকুর সবই বুঝেন এবং শুনেন, কিন্তু বিশেষ উচ্চবাচ্য করেন না। অবশেষে একদিন বিশ্বনাথ উপাধ্যায় কেশবচন্দ্রের সম্পর্কে 'ভ্রষ্টাচার,' 'ম্লেচ্ছাচার,' 'বাবু' প্রভৃতি নিন্দাসূচক বাক্য ব্যবহার করিলে শ্রীরামকৃষ্ণের আর সহ্য হইল না। তীব্র ভৎর্সনার স্বরে তিনি কহিলেন—"তুমি লাটসাহেবের কাছে যেতে পার টাকার জন্য, আর আমি কেশব সেনের কাছে যেতে পারি না? সে ঈশ্বরচিন্তা করে, হরিনাম করে। তবে না তুমি বল, 'ঈশ্বর মায়া জীবজগৎ—যিনি ঈশ্বর, তিনিই এইসব জীবজগৎ হয়েছেন।'" এক কথায় কাপ্তেন চুপ।

'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় ঠাকুরের সহিত দেখা করিয়া গিয়াছেন। "কৃষ্ণদাস পাল এসেছিল। দেখলাম, রজোগুণ। তবে হিন্দু; জুতো বাইরে রাখলে। একটু কথা কয়ে দেখলুম, ভিতরে কিছুই নাই। জিজ্ঞাসা করলুম—মানুষের কি কর্তব্য? তা বলে—

'জগতের উপকার করবো।' আমি বললাম—'হ্যাঁ গা, তুমি কে? আর কি উপকার করবে? আর জগৎ কতটুকু গা যে, তুমি উপকার করবে?' " কৃষ্ণদাস পালের অহমিকা চূর্ণ হইল।

কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুর পর নববিধান সমাজের অন্যতম নেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় একদা ঠাকুরের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাকে কহিলেন—"কেশব ও তুমি ছিলে যেন গৌর-নিতাই—দু'ভাই। লেকচার দেওয়া, তর্ক, ঝগড়া, বাদবিসংবাদ এসব ত অনেক হলো, এখন সব মনটা কুড়িয়ে ঈশ্বরেতে দাও।" প্রতাপচন্দ্র কহিলেন যে, উহা ঠিক বটে, তবে কি-না বক্তৃতাদি যাহা করিতেছেন তাহা নিজের জন্য নহে, কেশবচন্দ্রের নামটা যাহাতে বজায় থাকে শুধু তারই জন্য। ঠাকুর অমনি একটি গল্প প্রথমে বলিয়া প্রতাপচন্দ্রকে কহিলেন—"কেশবের নাম তোমায় রক্ষা কর্তে হবে না। যা কিছু হয়েছে, জানবে ঈশ্বরের ইচ্ছায়। তাঁর ইচ্ছাতে হলো, আবার তাঁর ইচ্ছাতে যাচ্ছে; তুমি কি করবে?" প্রতাপচন্দ্রের চিন্তাধারার গলদ কোথায়—তাহা এক কথায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

ঠাকুরের বাক্য কোন কোন সময়ে ধারাল হইলেও উহাতে কাহারও প্রাণে আঘাত লাগিত না। উহার কারণ ছিল তাঁহার স্বার্থলেশশূন্য ভালবাসা। সেই ভালবাসার প্রভাবে প্রত্যেকেই মনে করিত, ইনি আমার নিতান্ত আপনার লোক—ইঁহার সহিত সকল বিষয় প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতে কোনই বাধা নাই, আর যদি বা ইনি কোন পরুষ বাক্য বলেনও, তথাপি আমার মঙ্গলের জন্যই বলিতেছেন। আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ঠাকুর বালকের ন্যায় সকলের সঙ্গে মিশিতেন—যাঁহারা একটু অন্তরঙ্গ কিংবা সরল-প্রকৃতির লোক, তাঁহাদের সহিত কথাবার্তায় হাসিঠাট্টা ফষ্টিনাষ্টির যেন ফোয়ারা খুলিয়া যাইত, আনন্দের হাট বসিত। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত যখন যুবক, তখন ১৮৮১ হইতে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কয়েকবার ঠাকুরের নিকট গিয়াছিলেন। সেই দেখাসাক্ষাৎ সম্পর্কে পরবর্তীকালে যাহা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার একটুখানি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করা হইবে—

"ঠাকুরের সঙ্গেও মাত্র চার পাঁচ দিনের দেখা, কিন্তু ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই এমন হয়েছিল যে, তাঁকে (ঠাকুরকে) মনে হত যেন এক ক্লাসে পড়েছি, কেমন বে-আদবের মত কথা বলেছি; সম্মুখ থেকে সরে এলেই মনে হত 'ওরে

বাপরে, কার কাছে গেছলাম!' ঐ ক'দিনেই যা দেখেছি ও পেয়েছি, তাতে জীবন মধুময় করে রেখেছে। সেই দিব্যামৃতবর্ষী হাসিটুকু যতনে পেটারায় পুরে রেখে দিইছি।* সে যে নিঃসম্বলের অফুরন্ত সম্বল গো! আর সেই হাসিচ্যুত অমৃতকণায় আমেরিকা অবধি অমৃতায়িত হচ্ছে—এই ভেবে হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ, হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ।" †

* এই সদাহাস্যময় প্রেমের ঠাকুরকে মনশ্চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়াই কি ভক্ত অশ্বিনীকুমার গান বাঁধিয়াছিলেন?—

'আমি তোর মুখফুলানো ভগবানের ধার ধারি না ভাই,
আমার ঠাকুর হাসিখুসি খেলাধুলোর পাগল দেখতে পাই।'...ইত্যাদি।

† শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ—পরিশিষ্ট

পানিহাটির মহোৎসব

নব্যবঙ্গের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত হইলেও শেষ বয়স পর্য্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরের সহিত গভীর ভালবাসার সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াছিলেন। প্রায় প্রতিবৎসর বর্ষাকালে একবার তিনি জন্মভূমি-সন্দর্শনে যাইতেন এবং গ্রামবাসীদের সহিত তাঁহার চিরমধুর সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করিয়া আসিতেন। সর্বশেষ তিনি কোন্ বৎসরে গমন করেন, তাহা সঠিক জানা যায় না। তবে এইটুকু জানা যায় যে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহিত মিলনের পরেও অন্ততঃ একবার তিনি কামারপুকুরে গিয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহেও যাইয়া হরিসংকীর্তনের দ্বারা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই একেবারে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। উহাই যে শেষ সাক্ষাৎকার, তাহা মনে মনে জানিতে পারিয়াই সম্ভবতঃ তাঁহার প্রেমসিন্ধু বিপুল আবেগে উথলিয়া উঠিয়াছিল।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বরে আনন্দের হাট পুরামাত্রায় চলিয়াছিল। ঐ সময়ের মধ্যে অগণিত নরনারী ঠাকুরের অমৃতোপম উপদেশবাক্য ও সুমধুর সঙ্গীত শুনিবার জন্য—তাঁহার ভাবসমাধি দেখিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন। তিনিও নিজের সুখসুবিধা কিংবা আরামের প্রতি কিছুমাত্র দৃকপাত না করিয়া অকাতরে তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ করিতেন। অনবরত কথা বলার পরিশ্রমে এবং উপযুক্ত বিশ্রামের অভাবে তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। তবুও তিনি বিরত হইতেন না। থামাইতে গেলে, কিংবা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "যদি লোকের মুক্তির জন্য আমাকে বার বার জন্মাতে হয়, তাতেও আমি রাজী। একটিমাত্র মানুষের সাহায্যের জন্য আমি এরকম বিশ হাজার বার জন্ম নিতে প্রস্তুত।" *

---

* স্বামী তুরীয়ানন্দের একখানি পত্রের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথাগুলির তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে উহা আমাদিগকে প্রভূত সাহায্য করে।

"ঠাকুর বলিতেন, তাঁহার মুক্তি নাই। একথা তাঁহার মুখেই শুনিয়াছি। এ মুক্তি নির্বাণ-মুক্তি, যাহাতে আর সংসারে আসিতে হয় না। জীবকোটিরাই সংসার-দুঃখে জ্বালাতন হইয়া আর সংসারে আসিতে চায় না, তাই নির্বাণ চায়। যাঁহাকে পরদুঃখে কাতর

জ্ঞান ও ভক্তি অকাতরে বিলাইয়া দিবার জন্য ঐ সময়ে তিনি যেন একেবারে অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে উত্তাপ বড়ই প্রখর হইয়াছিল। সেই সময়ে কলিকাতায় বরফের ব্যবহারও মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য ভক্তেরা কেহ না কেহ প্রায় প্রত্যহ বরফ লইয়া আসিতেন। পানীয় জল, শরবত প্রভৃতির সহিত তিনিও বালকের ন্যায় আনন্দে বরফ খাইতেন। উহার ফলেই হউক, কিংবা অন্য কারণেই হউক, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি গলায় ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলেন। এপ্রিলের মাঝামাঝি দেখিতে পাই, তিনি গলার ব্যথায় যথেষ্ট কষ্টভোগ করিতেছেন।* প্রথমে তিনি উহা তেমন গ্রাহ্য করিলেন না; কিন্তু মাসখানেক যাইতে না যাইতে ব্যথা খুব বাড়িয়া গেল। বিশেষতঃ যেদিন বেশী কথা কহিতেন কিংবা অধিকক্ষণ সমাধিস্থ থাকিতেন,

---

হইয়া বারংবার তাহাদের হিতের জন্য এই সংসারে আসিতে হয়, তাঁহার নির্বাণ কিরূপে সম্ভবে? তাই ঠাকুর বলিতেছেন তাঁহার মুক্তি নাই।

আর ঠাকুর স্বামীজিকে বলিয়াছিলেন, 'যে রাম, যে কৃষ্ণ—সে-ই ইদানীং রামকৃষ্ণ; কিন্তু তোর বেদান্তের দিক্ দিয়ে নয়।' এর অর্থ এই যে, বেদান্তের অদ্বৈতমতে বলিয়া থাকে যে জীব ব্রহ্ম এক। ইহার অর্থ কেহ কেহ করিয়া থাকেন যে, সকলেই রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি, তাঁহাদের বিশেষত্ব নাই। তাই পাছে স্বামীজি মনে করেন যে, সেইভাবে ঠাকুর বলিতেছেন—'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং রামকৃষ্ণ'—সেইজন্য ঠাকুর উল্লেখ করিলেন 'তোর বেদান্তের দিক্ দিয়ে নয়'। অর্থাৎ—তাঁর ঈশ্বর চৈতন্য, জীব চৈতন্য নহে। অদ্বৈতমতে জীব—সাধন, ভজন, সমাধি প্রভৃতি দ্বারা অজ্ঞান দূর করিয়া ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু সহস্র চেষ্টা করিয়াও জীব ঈশ্বর হইতে পারে না। ঈশ্বর যিনি, তিনি চিরদিনই ঈশ্বর। তিনি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া জীবের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও ঈশ্বরই থাকেন, কখনই জীব হন না। যেমন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

> বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন
> তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।
> অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্
> প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

ঠাকুরও সেইরূপ বলিতেছেন তোর বেদান্তের দিক্ দিয়ে নয়।"

* ২৪শে এপ্রিল, 'বলরাম বসুর বাড়ীতে শ্রীম'র সঙ্গে দেখা হইলে মাস্টারকে বলিতেছেন—"কে জানে বাপু, আমার গলায় বীচি হয়েছে। শেষরাত্রে বড় কষ্ট হয়।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

সেদিন যাতনা দারুণভাবে বৃদ্ধি পাইত। সেক, প্রলেপ প্রভৃতি সহজ চিকিৎসাই প্রথমে করা হইল; কিন্তু এগুলিতে উপকার না হইয়া পীড়া যখন উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকিল, তখন ভক্তেরা সকলেই ভয় পাইলেন। বৌবাজারের রাখালবাবু নামক জনৈক ডাক্তারের গলার ব্যাধির চিকিৎসা সম্পর্কে খ্যাতি ছিল। তাঁহাকেই ডাকিয়া আনা হইল। তিনি দেখিয়া শুনিয়া গলার ভিতরে ও বাহিরে লাগাইবার ঔষধপত্র এবং মালিশের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু উহাতে বিশেষ কিছুই ফল দেখা গেল না। ঠাকুর যাহাতে বেশী কথাবার্তা না বলেন, এবং বারংবার ভাবসমাধিতে মগ্ন না হন, সে বিষয়েও রাখাল ডাক্তার সতর্ক করিয়া দিলেন। কিন্তু ঠাকুরকে নিবারণ করা সম্ভবপর ছিল না।

ক্রমে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী নিকটবর্তী হইল। ঐ তিথিতে দক্ষিণেশ্বরের কয়েক মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরবর্তী পানিহাটি নামক স্থানে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মহোৎসব ও প্রকাণ্ড মেলা হইয়া থাকে। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীমৎ প্রভু নিত্যানন্দ একবার কিছুদিন পানিহাটিতে বাস করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি ভক্ত শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়া তাঁহার নির্দেশে তথায় সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে চিঁড়ার ফলারে আপ্যায়িত করেন। প্রভু পরম পরিতুষ্ট হইয়া রঘুনাথের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। সেদিন পানিহাটিতে শত শত ভক্তের হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল বহিয়াছিল, হরিনামের উচ্চ রোলে ভাগীরথীর তীর মুখরিত হইয়াছিল। ঐ পুণ্য দিবসের স্মৃতিরক্ষাকল্পে বৈষ্ণব ভক্তেরা প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে পানিহাটিতে মহোৎসব করিয়া আসিতেছেন। উহা পানিহাটির 'চিঁড়ার মহোৎসব' নামে খ্যাত। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় প্রতি বৎসরই সেই উৎসব দেখিতে যাইতেন। কিন্তু তাঁহার ইংরেজীশিক্ষিত ভক্তবৃন্দের আগমনের পর হইতে কয়েক বৎসর আর উহাতে যোগদান করেন নাই। এবারে তিনি আবার উৎসবে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন এবং ভক্তদিগকে কহিলেন, "সেখানে ঐদিন আনন্দের মেলা, হরিনামের হাটবাজার বসে। তোরা সব ইয়ং বেঙ্গল, কখনো ওরূপ দেখিস্ নি—চল্ দেখে আস্‌বি।" এই প্রস্তাবে রামচন্দ্র দত্ত-প্রমুখ একদল ভক্ত খুব উল্লসিত হইলেন। কিন্তু অপর কেহ কেহ বলিলেন যে, মহোৎসবে গেলে শরীরের উপর অত্যাচার

হইবেই, এবং তাহাতে ঠাকুরের গলার ব্যাধি আরও বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। এই আশঙ্কার কথা তুলিয়া তাঁহারা ঠাকুরকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। তাহাদের আশঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত তিনি কহিলেন, "এখান থেকে সকাল সকাল দুটি খেয়ে রওয়ানা হয়ে যাব, আর ওখানে মাত্র দু-এক ঘণ্টাকাল থেকে আবার চলে আসব। তাতে গলার বিশেষ ক্ষতি হবে না।" ঠাকুরের এই কথার উপর আর কাহারও আপত্তি টিকিল না। ভক্তেরা পানিহাটি যাইবার যোগাড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন।

মহোৎসবের দিন সকালেই কলিকাতা হইতে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া পৌছিলেন এবং তথায় খাওয়া দাওয়া সারিয়া বেলা দশটা আন্দাজ সময়ে সকলে নৌকায় পানিহাটি রওয়ানা হইলেন। ঠাকুরের জন্য পৃথক্ একখানি নৌকা ঠিক করা হইয়াছিল, তিনি তাহাতেই উঠিলেন।

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় নৌকাগুলি পানিহাটিতে পৌছিল; সেখানে গঙ্গাতীরে প্রাচীন বটগাছের নীচে অনেক লোক তখন জড় হইয়াছে, আবার একটু দূরে দূরে ভিন্ন ভিন্ন কীর্তনীয়ার দল সংকীর্তন করিতেছে। সদলবলে নৌকা হইতে নামিয়া ঠাকুর সোজা শ্রীযুক্ত মণি সেনের বাটীর অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। গিরিশ প্রভৃতি একটু বয়োজ্যেষ্ঠ ভক্তেরা ঠাকুরকে সাবধানে আগলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যাহাতে তিনি কোন সংকীর্তনের দলে মিশিয়া খুব বেশী মাতামাতি না করেন। ঠাকুরের আগমনে পরম আহ্লাদিত হইয়া মণিবাবুর বাড়ীর লোকেরা অতিশয় সমাদর ও যত্নের সহিত ঠাকুর এবং তাঁহার অনুচরদিগকে বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া বসাইলেন। সেখানে অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর ঠাকুর ভক্তদিগকে সঙ্গে লইয়া মণিবাবুর ঠাকুরবাড়ীতে ৺শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীকে দেখিতে চলিলেন।

ঠাকুর অর্ধবাহ্যদশায় ৺শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীকে কিছুক্ষণ দর্শনের পর যখন প্রণাম করিতেছিলেন, সেই সময় একদল কীর্তনীয়া উঠানে প্রবেশ করিয়া কীর্তন আরম্ভ করিল। ইহাই ছিল প্রচলিত নিয়ম যে, কোন কীর্তনীয়ার দল মহোৎসবে যোগদান করিতে আসিলে প্রথমেই ৺শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীকে দর্শন

ও তাঁহার সম্মুখে কিছুক্ষণ নামসংকীর্তন করিত,—তারপর গঙ্গাতীরে মেলার স্থানে আনন্দ করিতে যাইত। প্রণাম সারিয়া ঠাকুর একপাশে দাঁড়াইয়া শান্তভাবে নবাগত কীর্তনীয়াদলের গান শুনিতেছিলেন, এমন সময়ে ফোঁটাতিলকধারী এক গোঁসাইজী সেখানে আসিয়া ভাবাবিষ্টের ন্যায় খুব অঙ্গভঙ্গী, হুঙ্কার ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পরিপাটি বেশভূষা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা গেল, তিনি মেলার দিনে রোজগারের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছেন। গোঁসাইয়ের বিচিত্র ভাবভঙ্গী একটু সময় লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর পার্শ্ববর্তী নরেন্দ্রাদি ভক্তদিগকে আস্তে আস্তে কহিলেন, "ঢং দ্যাখ্।" ভক্তেরা লোকটার রকম-সকম দেখিয়া যেমন আমোদ বোধ করিতেছিলেন, তেমনি আবার মনে মনে প্রমাদ গণিতেছিলেন; কারণ অপরের নকল ভাব দেখিয়াও অতি সহজেই ঠাকুরের আসল ভাবের উদ্দীপন হইত। ঠাকুরের মন্তব্য শুনিয়া তাঁহাদের মনে ভরসা জন্মিল যে, যাহাই হউক, ঠাকুর স্বয়ং প্রকৃতিস্থ আছেন ও নিজেকে সামলাইয়া চলিতেছেন। কিন্তু এই ধারণা ছিল অলীক। ক্ষণকাল পরেই ঠাকুর সহসা উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া কীর্তনীয়াদলের মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞা একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। কখনও অর্ধবাহ্য অবস্থায় তিনি সিংহবিক্রমে নৃত্য করিতে লাগিলেন, কখনও সংজ্ঞাহীনভাবে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সমস্ত জনতা বিস্ময়-বিস্ফারিত, নিষ্পলক নেত্রে দেখিতে লাগিল ঠিক যেন একটি মীন সুখময় সায়রে মহানন্দে খেলা করিতেছে! কীর্তনীয়ার দল ঠাকুরকে বেড়িয়া মহোল্লাসে কীর্তন গাহিতে লাগিল। আর ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ পাশে পাশে থাকিয়া যথাসম্ভব তাঁহাকে আগলাইয়া রাখিতে যত্নবান রহিলেন।

এইভাবে প্রায় অর্ধঘণ্টা সময় গত হইবার পর ঠাকুরের ভাবাবেশ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে ভক্তগণ তাঁহাকে কীর্তনের দল হইতে সরাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেইস্থান হইতে মাইলখানেক দূরে মহাপ্রভুর পার্ষদ রাঘব পণ্ডিতের বাটী। যে যুগলবিগ্রহ ও শালগ্রামশিলায় রাঘব পণ্ডিত নিত্য দেবসেবা করিতেন—ঠাকুর তাহা দর্শনের নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। স্থির হইল ওখানে গিয়া দেবতাদর্শন করিয়াই নৌকায় ফেরা হইবে; এদিক ওদিক আর কোথাও যাওয়া হইবে না। ঠাকুর উহাতে সম্মত হইয়া মণি সেন মহাশয়ের বাটী হইতে ভক্তবৃন্দসমেত নিক্রান্ত হইলেন। কিন্তু কীর্তনীয়ার দল

তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না, তাহারা পিছু পিছু আসিতে লাগিল। প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ সেদিনকার কথা স্মরণ করিয়া লিখিয়াছেন—"ঠাকুরের শরীরে সেইদিন যে দিব্যোজ্জ্বল সৌন্দর্য দর্শন করিয়াছি, সেইরূপ আর কখনও নয়নগোচর হইয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না। ··· ভাবাবেশে দেহের অতদূর পরিবর্তন নিমেষে উপস্থিত হইতে পারে, একথা আমরা ইতিপূর্বে কখনও কল্পনা করি নাই। তাঁহার উন্নতবপুঃ প্রতিদিন যেমন দেখিয়াছি, তদপেক্ষা অনেক দীর্ঘ এবং স্বপ্নদৃষ্ট শরীরের ন্যায় লঘু বলিয়া প্রতীত হইতেছিল, শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল হইয়া গৌরবর্ণে পরিণত হইয়াছিল ; ভাবপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডল অপূর্ব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া চতুষ্পার্শ্ব আলোকিত করিয়াছিল, এবং মহিমা, করুণা, শান্তি ও আনন্দপূর্ণ মুখের সেই অনুপম হাসি দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় জনসাধারণকে কিছুক্ষণের জন্য সকল কথা ভুলাইয়া তাঁহার পদানুসরণ করাইয়াছিল।"

ভাবাবিষ্ট অবস্থায় গঙ্গাতীরবর্তী রাজপথ দিয়া ঠাকুর যখন রাঘব পণ্ডিতের কুটীরাভিমুখে চলিলেন, তখন তাঁহার সেই দিব্যরূপ ও প্রেমোন্মাদ দেখিয়া আর একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বহুশ্রুত ঘটনার দৃশ্য আপনা হইতেই সকলের মনের ভিতরে জাগিয়া উঠিল। পরম উৎসাহভরে গগনভেদী রবে কীর্তনীয়ার দল গান ধরিল—

সুরধুনীর তীরে হরি বলে কে রে
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।
ওরে হরি বলে কে রে
জয় রাধে বলে কে রে
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে—
(আমাদের) প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।
নিতাই নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে—
(এই আমাদের) প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আরও কয়েকটি কীর্তনীয়ার দল এবং দর্শক ও শ্রোতার এক বিশাল জনতা ঠাকুরের চারিপার্শ্বে সমবেত হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিল। সকলেরই মনে হইতে লাগিল যে, সত্যিই তো এক অত্যাশ্চর্য 'প্রেমদাতা' মহাপুরুষ তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন! ভাবাবিষ্ট

অবস্থায় ঠাকুর কখনও নৃত্য করেন, কখনও আগাইয়া চলেন, কখনও স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকেন। এইভাবে রাঘব পণ্ডিতের কুটীর পর্যন্ত পৌছিতে সম্পূর্ণ তিন ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইল।

যখন তথায় পৌছিলেন, তখন শরীর নিতান্ত অবসন্ন। বিগ্রহদর্শনান্তে ঠাকুর প্রায় অর্ধঘণ্টাকাল তথায় বিশ্রাম করিলেন। অনুবর্তী জনতাও পরিশ্রান্ত হইয়াছিল এবং বেলাও পড়িয়া আসিতেছিল। সুতরাং লোক চলিয়া যাওয়াতে ভিড় কমিয়া গেল। এই সুযোগে ভক্তেরা কোনও প্রকারে ঠাকুরকে নৌকায় লইয়া যাইতে সমর্থ হইলেন।

সদলবলে ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা। ঠাকুরকে তাঁহার ঘরে পৌছাইয়া ভক্তেরা বিদায় গ্রহণপূর্বক আপন আপন আলয়ে চলিয়া গেলেন। আপামরে প্রেম বিলাইয়া ঠাকুরের মনপ্রাণ সেদিন আনন্দে ভরপুর। একজন বালক ভক্তকে বিদায় দিবার প্রাক্কালে তিনি কহিলেন, "কি রে, কেমন দেখ্‌লি? হরিনামের একেবারে হাট বসে গিয়েছিল,—নয় কি?"

দিনের বেলায় শরীরের উপরে যে অত্যাচার ঘটিয়াছিল, তাহার ফল ফলিতে ব্যতিক্রম ও বিলম্ব ঘটিল না। গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়া ঠাকুর ভয়ানক যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন; সারারাত্রির মধ্যে একটুও নিদ্রা হইল না। পানিহাটিতে উৎসবের জনতার মধ্যে অবশ্যই বহু অশুচি স্বভাবের লোকও ছিল। এইরূপ লোকের স্পর্শ ঠাকুরের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইত। একদিন পরেই ছিল স্নানযাত্রার উৎসব। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি সেদিন এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম পাইলেন না,—কারণ দলে দলে অগণিত নরনারী তাঁহার দর্শন-লাভের জন্য আসিয়া ভিড় করিতে লাগিল। তাঁহার উচ্চ সাত্ত্বিক ভাব ও অবস্থা না বুঝিয়া সাংসারিক নানাবিষয়ক ফললাভের উদ্দেশ্যে আবার কতক স্বার্থপর লোক আসিয়া ধন্না দিত, উহাতে ঠাকুরের ক্লেশের অবধি থাকিত না। বিশেষতঃ ঐদিন একজন স্ত্রীলোক নিজের বিষয়সম্পত্তির বন্দোবস্তের ব্যাপারে ঠাকুরের আশীর্বাদ-লাভের জন্য একেবারে নাছোড়বান্দা হইয়া তাঁহার পিছনে সারাক্ষণ লাগিয়া থাকেন, এমন কি রাত্রিতে পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করেন,—উহাতে ঠাকুরের বড়ই বিরক্তি ও অস্বস্তিবোধ হইয়াছিল। মনোদুঃখে তিনি একজন স্ত্রীভক্তকে কহিয়াছিলেন, "এখানে লোক আসে প্রেমভক্তি পাবার

জন্য, এখানে ওর বিষয়ের কি বন্দোবস্ত হবে বল দেখি? কামনা করে আঁব-সন্দেশাদি এনেছে,—তার একটু মুখে তুলতে পারলুম না। আজ স্নানযাত্রার দিন, অন্যান্য বছর এই দিনে কত ভাবসমাধি হত,—দু-তিনদিন পর্যন্ত ভাবের ঘোর থাকৃত; আজ কিছুই হল না—নানা ভাবের লোকের হাওয়া লেগে উচ্চভাব আসতে পারল না।”

শ্যামপুকুর

পানিহাটির মহোৎসবে যোগদানের পর হইতেই ঠাকুরের গলার ব্যথা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। উৎসবের দিন মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইয়াছিল। সেই বৃষ্টিতে ভিজিয়া অনেকখানি পথ হাঁটিয়াছিলেন, তদুপরি প্রায় সারাক্ষণ ভাবসমাধিতে মগ্ন ছিলেন। ব্যাধিগ্রস্ত শরীরের পক্ষে এই দুইই ছিল মহা অনিষ্টকর। ডাক্তার ভয় দেখাইয়া বলিলেন যে, বিধিনিষেধ না মানিয়া এরূপ অত্যাচার করিতে থাকিলে ব্যাধি কিছুতেই প্রশমিত করা যাইবে না, বরঞ্চ উত্তরোত্তর উহা বাড়িয়া গিয়া গুরুতর আকার ধারণ করিবে। এই কথা শুনিয়া ঠাকুর একেবারে ছোট বালকের ন্যায় হইয়া গেলেন। এমন ভাব দেখাইলেন যেন তিনি অত্যন্ত ভয় পাইয়াছেন,—এবং নিজের দোষ স্থালনের জন্যও চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যে-সকল ভক্ত তাঁহাকে পানিহাটি লইয়া যাইতে আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন, তাঁহাদের উপর সমস্ত দায়িত্ব আরোপ করিয়া কহিলেন, "ওরা যদি একটু জোর করে আমাকে নিষেধ করত, তাহলে কি আমি ওখানে যেতুম!"

পানিহাটির উৎসবের দুই-চারিদিন পরে জনৈক ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া দেখিলেন, ঠাকুর ছোট তক্তাপোশটির উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছেন,—একটি বালককে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ হইতে নিবৃত্ত করিলে যেমন ক্ষুণ্ণমনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, ঠাকুরও ঠিক তেমনি বিষণ্ণবদনে উপবিষ্ট। উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে গলার প্রলেপ দেখাইয়া আস্তে আস্তে কহিলেন, "ওই ত্যাখ্ না, ব্যথা বেড়েছে, ডাক্তার বেশী কথা বলতে মানা করেছে।" ভক্তটি তখন দুঃখ প্রকাশপূর্বক বলিলেন, "তাই তো মশায়! শুনলাম, সেদিন আপনি পেনেটি গিয়েছিলেন, বোধ হয় সেইজন্যই ব্যথাটা বেড়েছে।" উহাতে ঠাকুর বালকের ন্যায় অভিমানভরে কহিতে লাগিলেন, "হাঁ, ত্যাখ্ দেখি, এই উপরে জল, নীচে জল, আকাশে বৃষ্টি—পথে কাদা, আর রাম কি না আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে সমস্ত দিন নাচিয়ে নিয়ে এলো! সে পাশ-করা ডাক্তার, যদি ভাল করে বারণ করতো, তাহলে কি আমি সেখানে যাই?" ভক্তটি ঠাকুরের এরূপ অদ্ভুত বালকভাবের কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "তাই তো

মশায়! রামের ভারী অন্যায়। তা যা হবার তো হয়ে গিয়েছে, এখন কয়েকটা দিন একটু সাবধানে থাকুন, তাহলেই সেরে যাবে।" এই আশ্বাসে খুশী হইয়া ঠাকুর তখন কহিলেন,—"তা বলে একেবারে কথা বন্ধ করে কি থাকা যায়? এই ছাখ্ দেখি—তুই কত দূর থেকে এলি, আর আমি তোর সঙ্গে একটিও কথা কইব না, তা কি হয়?" ভক্ত ঠাকুরকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনাকে দেখলেই আনন্দ হয়, কথা না-ই বা বললেন, আমাদের মনে একটুও কষ্ট হবে না—ভাল হউন, আবার কত কথা শুনব।" কিন্তু এই অনুনয়বাক্য শোনে কে? ভক্তেরা আসিলে ডাক্তারের নিষেধ, নিজের যন্ত্রণা প্রভৃতি সবকিছু ভুলিয়া ঠাকুর তাঁহাদের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইতেন। কলিকাতায় ও পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে ঠাকুরের নাম বহুলভাবে প্রচারিত হওয়াতে অনেক অপরিচিত লোকও তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিত। আর তিনিও অল্পস্বল্প কথাবার্তা না বলিয়া আগন্তুকদিগকে একেবারে নিরাশ করিয়া ফিরাইয়া দিতে পারিতেন না। তাঁহার আচরণ দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইত যে, লোকের আধ্যাত্মিক কল্যাণের নিমিত্ত তিনি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বিলাইয়া দিতে কৃতসংকল্প। ব্যাধির নিমত্ত অশেষ কষ্ট হয় হউক, শরীর যায় যাউক,—কিন্তু কোন তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি ধর্মলাভার্থ আসিয়া কিংবা পাপীতাপী, দীনদুঃখী আশ্রয়লাভের আশায় আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে যেন শূন্যহাতে ফিরিয়া না যায়, ইহাই ছিল তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প। যখন অত্যধিক পরিশ্রম হইত এবং যন্ত্রণা বাড়িত, তখন এক একবার জগদম্বার উপর অভিমান করিতেন। একদা কোনও ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় বিছানার উপর বসিয়া আছেন এবং আপন মনে মা কালীর উদ্দেশ্যে বলিয়া যাইতেছেন,—"যত সব এঁদো লোককে এখানে আনবি, এক সের দুধে একেবারে পাঁচ সের জল, ফুঁ দিয়ে জ্বাল ঠেলতে ঠেলতে আমার চোক্ গেল, হাড় মাটি হল,—অত করতে আমি পারব না, তোর সখ থাকে তুই করগে যা। ভাল লোক সব নিয়ে আয়, যাদের দুএককথা বলে দিলেই (চৈতন্য) হবে।"

কথাবার্তা এবং ভাবসমাধি, এই দুইটি জিনিস হইতে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত থাকিতে ডাক্তার ঠাকুরকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। এই দুই নিষেধের কোনটিই ঠাকুরের দ্বারা পালন করা হইল না। লোকের সঙ্গে যেমন কথাবার্তা বলিতেন, তেমনি

আবার ঘন ঘন ভাবসমাধিতে মগ্ন হইতেন। গলার যন্ত্রণায় এবং মহাভাবের প্রেরণায় রাত্রিতে প্রায় ঘুম হইত না। এইসকল কারণে শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন ও দুর্বল হইতে লাগিল। আষাঢ়, শ্রাবণ গত হইয়া ভাদ্র মাস উপস্থিত; ঠাকুরের পীড়ার কিছুমাত্র উপশম না হইয়া ব্যাধির প্রকোপ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। ভক্তগণ সকলেই ভাবিয়া আকুল হইলেন। কি করা যাইতে পারে, এ সম্পর্কে কোন যুক্তি যখন তাঁহারা খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না, তখন অকস্মাৎ একটি ব্যাপার ঘটিয়া তাঁহাদিগকে স্বকীয় কর্তব্যের পথ দেখাইল।

বাগবাজারের জনৈকা মহিলা একদিন ঠাকুরের ভক্তদিগকে সান্ধ্যভোজে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকেও আনাইবার জন্য তাঁহার মনে বিশেষ আগ্রহ ছিল; কিন্তু অসুস্থ শরীরে ঠাকুরের পক্ষে আসা কষ্টকর হইবে ভাবিয়া আমন্ত্রণ পাঠাইতে নিবৃত্ত রহিয়াছিলেন। বিকাল বেলা তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; ঠাকুর না আসিলে সমস্তই অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে, এই কথা বারংবার মনে উদিত হইয়া তাঁহাকে পীড়া দিতে লাগিল। ঠাকুরের অবস্থা একটু ভাল থাকিলে অল্পক্ষণের জন্য তিনি হয়তো একবার দর্শন দিয়া যাইতে পারিবেন,—এই মনে করিয়া অবশেষে সেই মহিলা জনৈক ভক্তকে দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়া দিলেন। সন্ধ্যাকালে নিমন্ত্রিত ভক্তেরা আসিয়া উপস্থিত এবং ঠাকুরের আগমনের প্রতীক্ষায় সকলেই উদ্‌গ্রীব। রাত্রি নয়টা বাজিবার উপক্রম, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে প্রেরিত ভক্তটির দেখা নাই! ঠাকুরের আগমন-বিষয়ে হতাশ হইয়া গৃহকর্ত্রী যখন সমবেত অতিথিদিগকে আহারে বসাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, তখন সেই ভক্তটি ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, ঠাকুরের অসুখ খুব বাড়িয়াছে, তাঁহার গলা হইতে রুধির বাহির হইয়াছে, এবং সেজন্য তিনি আসিতে পারিলেন না। রামচন্দ্র দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, মাস্টার প্রভৃতি প্রবীণ ভক্তেরা তথায় উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুরের পীড়াবৃদ্ধির সংবাদে সকলেই চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হইলেন। পরামর্শক্রমে এরূপ সাব্যস্ত হইল যে, যেমন করিয়া হউক, ঠাকুরকে কলিকাতায় আনিয়া চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে,—তিনি যাহাতে আরোগ্যলাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব চেষ্টা করিতে হইবে। নরেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখা গেল। জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিলেন যে, বর্ণনা শুনিয়া

তাঁহার মনে হইতেছে যে, ঠাকুরের গলদেশের রোগ সম্ভবতঃ ক্যান্সারে পরিণত হইয়াছে—তিনি যতদূর জানেন ক্যান্সারের কোন চিকিৎসা নাই, —তাঁহাদের প্রাণের ঠাকুর বুঝি বা আর বেশীদিন দেহধারণ করিয়া থাকিবেন না।

পরদিন অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক ভক্তদের মধ্যে কয়েকজন দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া চিকিৎসার জন্য ঠাকুরকে কলিকাতায় লইয়া আসিবার প্রস্তাব করিলে পর ঠাকুরের সম্মতি সহজেই পাওয়া গেল। ভক্তেরা উহাতে উৎসাহিত হইয়া বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখার্জি স্ট্রীটে ছোট একখানি বাড়ী ভাড়া করিয়া কয়েক দিনের মধ্যেই ঠাকুরকে তথায় লইয়া আসিলেন। ঠাকুর চিরকাল মুক্তস্থানে বাস করিতে অভ্যস্ত, গলির ভিতরে ঐ ছোট বাড়ীতে পা দিয়াই কহিলেন যে, ওখানে তাঁহার থাকা হইবে না। যেমন কথা, তেমন কাজ। তৎক্ষণাৎ পায়ে হাঁটিয়া বলরাম বসু মহাশয়ের ভবনে চলিয়া গেলেন। যতদিন মনোমত কোন বাড়ী ভাড়া পাওয়া না যায়, ততদিন পর্যন্ত তাঁহার আলয়েই থাকিবার নিমিত্ত বলরাম বিশেষভাবে অনুরোধ করাতে ঠাকুর তাহাতে রাজী হইলেন।

উপযুক্ত বাটীর জন্য চারিদিকে অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। কিন্তু চিকিৎসার ব্যাপারে কালক্ষেপ করা উচিত নহে মনে করিয়া ভক্তেরা ইতিমধ্যেই একদিন কলিকাতার বড় বড় কবিরাজদিগকে বলরামভবনে ডাকিয়া আনিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ, গোপীমোহন, দ্বারিকানাথ, নবগোপাল প্রভৃতি সেই সময়কার প্রসিদ্ধ কবিরাজেরা ঠাকুরকে একযোগে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার 'রোহিণী' রোগ হইয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ পূর্ব হইতেই ঠাকুরকে জানিতেন; সাধনকালে যখন তাঁহার অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তিনিই তাঁহাকে চিকিৎসা করিয়াছিলেন। জনৈক ভক্তকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া তিনি কহিলেন যে, ডাক্তারেরা যাহাকে 'ক্যান্সার' বলেন, 'রোহিণী' তাহাই; আয়ুর্বেদশাস্ত্রে এই ব্যাধি চিকিৎসার অসাধ্য। কবিরাজদিগের নিকট হইতে এরূপ হতাশাব্যঞ্জক উত্তর পাইয়া ভক্তেরা ঠাকুরকে হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করাইবার সিদ্ধান্ত করিলেন; কারণ এলোপ্যাথিতেও ক্যান্সারের চিকিৎসা বিশেষ কিছু ছিল না, অধিকন্তু এলোপ্যাথিক ঔষধ ঠাকুরের ধাতে সহ্য হইত না।

সপ্তাহকাল অতীত হইবার পূর্বেই শ্যামপুকুর স্ট্রীটে অবস্থিত গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্য নামক জনৈক ভদ্রলোকের বৈঠকখানা ঘরটি ঠাকুরের থাকিবার জন্য ভাড়া পাওয়া গেল। সেখানে তাঁহাকে লইয়া গিয়া ভক্তেরা স্বনামধন্য চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের দ্বারা হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা আরম্ভ করাইলেন। শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন যে, তাঁহার যতদূর স্মরণ হয়, প্রথম দিন ঠাকুরকে দেখিবার কালে ডাক্তার সরকার দর্শনী লইয়াছিলেন, কিন্তু উহার পর আর কখনও দর্শনী গ্রহণ করেন নাই। চিকিৎসাসূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইয়া তিনি ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধা-পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি আসিয়াছিলেন ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসা করিতে; কিন্তু আসিয়া দেখিলেন, ঠাকুর স্বয়ং ভবরোগের বৈদ্য! বয়সে ডাক্তার সরকার ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা বছর তিনেকের বড়; কিন্তু অল্প কয়েক দিনেই উভয়ের মধ্যে এরূপ হৃদ্যতা জন্মিল যে, একে অপরকে 'তুমি' সম্বোধন করিতে লাগিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি ঠাকুরের নিকট বসিয়া তাঁহার কথামৃত পান করিতেন। উহাতে কাজের এবং ব্যবসায়ের প্রভূত ক্ষতি হইলেও সেই ক্ষতি কিছুমাত্র গণ্য করিতেন না;—রহস্য করিয়া বলিতেন যে, ঠাকুরের পক্ষে অন্যের সঙ্গে কথা বলিতে মানা, কেবল তাঁহার (ডাক্তারের) সহিত কথা বলিতে মানা নাই। ডাক্তার সরকার ছিলেন প্রখর যুক্তিবাদী, এবং তাঁহার স্বভাব ছিল অত্যন্ত স্থির ধীর। ধর্মভাবের বাহ্য প্রকাশ এবং ধর্মের নামে মাতামাতি তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেন 'গম্ভীরাত্মা'। কিন্তু ঠাকুরের প্রেমস্পর্শে আসিয়া ডাক্তার সরকারের অন্তর্নিহিত ভক্তিভাব কিরূপে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করিয়াছিল—'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থে তাহা কতক বর্ণিত আছে। নব্যবঙ্গের এরূপ একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী ব্যক্তি কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে গ্রহণ করিয়াছিলেন ও তাঁহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহা বস্তুতঃ অনুধাবনযোগ্য।

শ্যামপুকুরের বাটীতে লইয়া যাইবার পর ঠাকুরের পথ্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে দক্ষিণেশ্বর হইতে তথায় আনা হইল। যুবক ভক্তেরাও সেবাকার্যে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। যেমন অপর সকল বিষয়ে, তেমনি এই বিষয়েও নরেন্দ্রনাথ হইলেন তাঁহাদের নেতা। প্রথম প্রথম নিজ নিজ অভিভাবকদিগের অনুমতিক্রমেই তাঁহারা আসিয়া ঠাকুরের নিকট

থাকিতেন এবং রাত্রি জাগিয়া আবশ্যকমত ঠাকুরের সেবাশুশ্রূষা করিতেন। কিন্তু ঠাকুরের পীড়াবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা কলেজ কামাই করিতে লাগিলেন, এমন কি বাড়ী যাওয়াও একপ্রকার বন্ধ হইয়া গেল। উহাতে অভিভাবকেরা স্বভাবতঃই বিরক্ত ও শঙ্কিত হইয়া যুবকদিগকে ঠাকুরের নিকট হইতে সরাইয়া লইয়া যাইতে নানারূপ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হইলেন না। যাঁহারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়া শ্রীগুরুর সেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন, কাহার সাধ্য, তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করে? ঠাকুরের সেবা ব্যতীত নরেন্দ্রনাথের সঙ্গও ছিল তাঁহাদের নিকট একটা প্রধান আকর্ষণ। নিজের দৃষ্টান্ত ও উৎসাহবাক্যের দ্বারা নরেন্দ্রনাথ সর্বক্ষণ সঙ্গীদের মনে ঈশ্বরলাভেচ্ছা জাগাইয়া রাখিতেন—সংসারের কোন প্রলোভনই তাঁহাদিগকে গন্তব্য পথ হইতে এক পা টলাইতে পারিত না।

শয্যাগত অবস্থায় থাকিয়াও আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ভাব বিতরণে ঠাকুরের কিছুমাত্র কার্পণ্য নাই। বরঞ্চ আমরা দেখিতে পাই যে, আপন প্রিয় শিষ্যদিগকে তিনি হাত ধরিয়া সাধনমার্গে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন। তাঁহার কৃপায় অনেকেই নানাবিধ দিব্য অনুভূতির অভিজ্ঞতা এবং আস্বাদ পাইয়া ঈশ্বরারাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়া দিলেন।

ঠাকুরের দর্শনলাভের নিমিত্ত, তাঁহার শ্রীমুখ হইতে দুই-চারিটি কথা শুনিবার নিমিত্ত সর্বদাই বহু লোক আসিত। তিনি কাহাকেও বিমুখ করিতেন না। যদিও কথা বলা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক এবং অনিষ্টকর ছিল, তথাপি ডাক্তারের নির্দেশ এবং সমস্ত সাবধানতা উপেক্ষাপূর্বক তিনি আগন্তুকদিগের প্রার্থনা পূরণ করিতেন। হরিশ্চন্দ্র মুস্তফী, সারদাপ্রসন্ন মিত্র, মণীন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি গৃহী ভক্তবৃন্দ সর্বপ্রথমে ঐ সময়েই ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহার কৃপালাভে ধন্য হন। নিজের রোগযন্ত্রণা গ্রাহ্য না করিয়া তিনি শিষ্যদিগকে ধ্যানজপের প্রণালী প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন। আবার এমনও অনেক সময়ে হইত যে, শিষ্যদিগকে সাধনপ্রণালী দেখাইতে গিয়া যোগাসনে বসিবামাত্র সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন, মনকে পুনরায় সাধারণভূমিতে নামাইয়া আনা অতিশয় কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইত।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ঠাকুরকে শ্যামপুকুরে আনা হইয়াছিল। তিনমাস অতীত হইবার পরেও চিকিৎসার কোন স্থায়ী ফল দেখা গেল না।

ডাক্তার সরকার ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, ব্যাধি চিকিৎসার অসাধ্য,—ঔষধের দ্বারা যন্ত্রণাদায়ক উপসর্গাদির সাময়িক উপশম ঘটিলেও আসল রোগ দূরীভূত, এমন কি মন্দীভূত হইবারও কোনই সম্ভাবনা নাই। একথা শুনিয়া ভক্তগণের মনোদুঃখের সীমা রহিল না। শ্রীগুরুর সেবা করিবার উহাই শেষ সুযোগ বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা ঐ কার্যে প্রাণপণ যত্নবান হইলেন।

ঠাকুরের ব্যাধির প্রকোপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া ডাক্তার সরকার বলিলেন যে, কলিকাতার দূষিত আবহাওয়ার বাহিরে লইয়া গিয়া কোথাও খোলা জায়গায় তাঁহাকে রাখিলে নির্মল বায়ুসেবনে যন্ত্রণার উপশম হইতে পারে। এই পরামর্শ অনুযায়ী ভক্তেরা কাশীপুরে একটি বাগানবাটী ভাড়া করিয়া ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণে ঠাকুরকে তথায় লইয়া গেলেন।

কাশীপুর উদ্যানবাটী
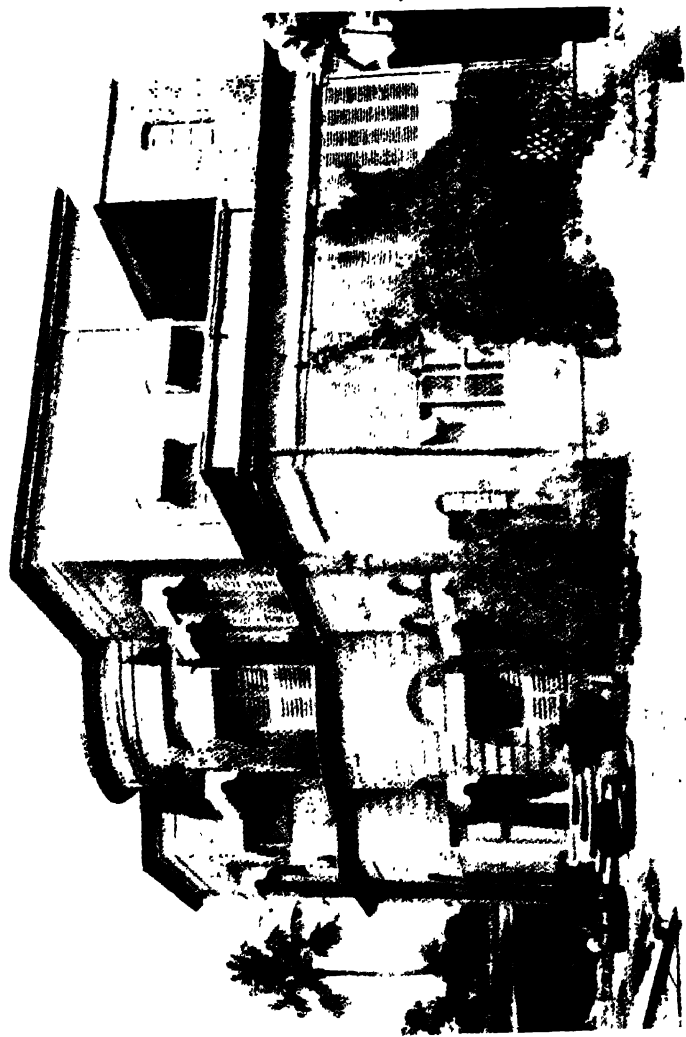
কাশীপুর

পরমহংসদেবের জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্কে আমরা উপনীত হইয়াছি ঃ নরদেহে যে মহাশক্তির অপূর্ব লীলাখেলা আমরা এযাবৎ দেখিয়া আসিলাম, সে মহাশক্তি শীঘ্রই ভঙ্গুর দেহ পরিত্যাগপূর্বক স্ব-স্বরূপে বিলীন হইবে। যে আনন্দের হাট বসিয়াছিল, তাহা অচিরাৎ ভাঙ্গিয়া যাইবে,—এ দৃশ্য কল্পনা করাও কষ্টদায়ক। দেহত্যাগের পূর্বমুহূর্ত পযন্ত শিষ্যবর্গের প্রতি যে অপার স্নেহ এবং সর্বজীবের কল্যাণের নিমিত্ত যে অপরিসীম আগ্রহ ঠাকুরের জীবনে আমরা দেখিতে পাই—তাহাতে মহাপ্রয়াণের এক অতি মহিমমণ্ডিত রূপ আমাদের নয়নসম্মুখে ফুটিয়া উঠে। এই দৃশ্যের ভিতরে একাধারে যে বেদনা এবং গরিমা, তাহা অন্তরের দ্বারা উপলব্ধির বস্তু, ভাষায় বর্ণনার বস্তু নহে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সংসারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিলেও সকল বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। শিষ্য এবং ভক্তবৃন্দ তাঁহার চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন, ইহা তিনি জানিতেন—এবং তাঁহাদের নিজেদের কল্যাণের নিমিত্তই তিনি তাঁহাদিগকে এই সেবাকার্যের সুযোগ দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু সাধ্যাতিরিক্ত ভার যাহাতে কাহারও স্কন্ধে পতিত না হয়, তৎপ্রতি তিনি সর্বদাই লক্ষ্য রাখিতেন। কাশীপুরে অবস্থিত ৺গোপালচন্দ্র ঘোষের একটি বাগানবাটী মাসিক ৮০৲ ভাড়ায় ভক্তেরা তাঁহার জন্য ভাড়া লইতে যাইতেছেন, একথা জানিতে পারিয়া তিনি কিছু চিন্তিত হইলেন। তাঁহার প্রিয়তম ভক্তবৃন্দের মধ্যে সকলেই প্রায় নিঃসম্বল, কিংবা ছেলে-ছোকরা ;—একমাত্র সুরেন্দ্রনাথ মিত্র কিছু মোটা মাহিনা পাইতেন। ঠাকুর তাঁহাকে ডাকাইয়া কহিলেন,—"দেখ সুরেন্দর, এরা সব কেরানী মেরানী ছা'পোষা লোক, এরা এত টাকা চাঁদা তুলতে কেমন করে পারবে ? অতএব, বাড়ীভাড়ার টাকাটা সব তুমিই দিও।" সুরেন্দ্রনাথ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানাইলেন এবং বাড়ীভাড়ার চুক্তিপত্র নিজেই সহি করিয়া দিলেন। সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইবার পর অগ্রহায়ণের সংক্রান্তির ঠিক একদিন পূর্বে অপরাহ্নকালে ঠাকুরকে শ্যামপুকুর হইতে কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল। দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় আটমাসকাল তিনি সেখানেই কাটাইয়াছিলেন।

বাগবাজারের পুল হইতে কাশীপুরের ভিতর দিয়া যে প্রশস্ত রাস্তা বরাবর উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছে, তাহারই উপরে পুল হইতে প্রায় মাইলখানেক দূরে গোপাল ঘোষের বাগানবাটী অবস্থিত। উহার সমগ্র আয়তন প্রায় চৌদ্দ বিঘা। জমির আকার চৌকা; কিন্তু উত্তর-দক্ষিণ অপেক্ষা পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তার সামান্য বেশী হইবে। বাগানের উত্তরভাগে একটু পশ্চিমে সরিয়া একটি বৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা, পার্শ্বে পরিচারকদিগের থাকিবার ঘর, আস্তাবল ইত্যাদি ছিল; উত্তর-পূর্বভাগে একটি পুকুর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি ডোবা। অট্টালিকার সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া ফুল-ফলের বাগান ও পায়চারি করিবার নিমিত্ত একটি বৃত্তাকার ভ্রমণপথ। বাগানের পশ্চিমসীমায় বড় রাস্তার উপরে প্রবেশদ্বার, অর্থাৎ ফটক।

অট্টালিকার নীচের তলায় ছিল একটি হলঘর এবং তদ্ব্যতীত আর তিনখানি ঘর। উহার একটিতে মাতাঠাকুরানী এবং অপরগুলিতে সেবকেরা থাকিতেন। দোতলায় একটি প্রকাণ্ড হলঘর এবং তৎপার্শ্বে আরও একটি বড় ঘর। এই হলঘরেতেই ঠাকুরকে রাখা হইয়াছিল। উহার সামনে দক্ষিণ দিকে খোলা ছাদ; ঠাকুর সেখানে কখনও কখনও গিয়া বসিতেন কিংবা পায়চারি করিতেন।

কি কামারপুকুরে, অথবা দক্ষিণেশ্বরে—শান্তিপূর্ণ, নয়নানন্দকর প্রাকৃতিক আবেষ্টনের মধ্যেই ঠাকুরের সারাজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। শ্যামপুকুরের মত আবদ্ধ স্থানে কেবল ইটপাথর, জনতা ও কোলাহলের মধ্যে থাকিয়া তিনি হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলেন। কাশীপুরের বাগানবাটীতে * পদার্পণ করিবামাত্র তথাকার নির্জনতা এবং প্রকৃতির স্নিগ্ধ-কোমল স্পর্শ তাঁহার চিত্তে প্রসন্নতা আনয়ন করিল এবং রোগযন্ত্রণা আপনা হইতেই যেন অনেকখানি কমিয়া গেল। দোতলার খোলা ছাদ হইতে কিছুক্ষণ উদ্যানের শোভা নিরীক্ষণপূর্বক তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে কলিকাতাবাসী ভক্তদের পক্ষে স্ব স্ব গৃহ হইতে তাঁহার নিকট যাতায়াত করা সহজ ছিল। কিন্তু তাঁহাকে

* সমগ্র বাগানবাড়ীটি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কর্তৃপক্ষ ১৯৪৯ সালে ক্রয় করেন। যে অট্টালিকাতে পরমহংসদেব বাস করিয়াছিলেন, উহা জীর্ণ ও পতনোন্মুখ হওয়াতে কর্তৃপক্ষ উহা পুনর্নির্মাণ করিয়াছেন।

কাশীপুরে স্থানান্তরিত করিবার ফলে তাঁহারা অনেক দূরে পড়িয়া গেলেন। কলিকাতা হইতে ঐ স্থানে ডাক্তার-কবিরাজ লইয়া যাওয়া কিংবা চিকিৎসকের নিকট নিত্য পরামর্শ গ্রহণ করাও এক কঠিন এবং ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। সেবাকার্য সুষ্ঠুভাবে চালাইতে হইলে ধনবল এবং জনবল পূর্বাপেক্ষা আরও অনেক অধিক চাই। যাঁহারা একটু বয়স্ক এবং উপার্জনশীল তাঁহারা টাকাকড়ি এবং পরামর্শ দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। আর যাঁহারা যুবক তাঁহারা লইলেন সেবাশুশ্রূষার ভার। ঠাকুর শ্যামপুকুরে থাকাকালীন যুবক-ভক্তেরা নিজ নিজ বাটী হইতে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া আসিতেন। কিন্তু এখন আর তাহা সম্ভবপর হইল না। সুতরাং ঠাকুরের শিষ্যদের মধ্যে যাঁহারা গুরুদেবের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন, তাঁহারা সর্বক্ষণের জন্য কাশীপুরের উদ্যানবাটীতেই চলিয়া আসিলেন। অভিভাবকদের আপত্তি, গঞ্জনা, তিরস্কার—কিছুই তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না, এবং নিজেদের সুখসুবিধা কিংবা সাংসারিক উন্নতির চিন্তা মুহূর্তের জন্যও তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পাইল না। নরেন্দ্রনাথ হইলেন উঁহাদের নেতা।

নরেন্দ্রনাথ ঐ সময়ে আইন পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ পরীক্ষাবর্জনের সিদ্ধান্ত করিলেন না। তিনি ভাবিলেন যে, মাতা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতারা যেরূপ অভাব-অনটনের মধ্যে রহিয়াছেন, তাহাতে ঐ সময়ে তাঁহাদিগকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া আসা কাপুরুষোচিত হইবে,—বরঞ্চ আইন পরীক্ষা পাশ করিয়া দু'চার বৎসরের পরিশ্রমে যথাসাধ্য সাহায্যদানের পর সরিয়া পড়িলে নিজের মনেও অনুশোচনা হইবে না, অপরেও দোষারোপ করিতে পারিবে না। এই ভাবিয়া তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, পাঠ্যপুস্তকগুলি কাশীপুরে লইয়া আসিবেন এবং ঠাকুরের সেবাকার্যের ফাঁকে ফাঁকে একটুখানি পড়াশুনা করিবেন। একদিন বাড়ী যাইয়া পুঁথিপত্র বস্তুতঃ লইয়াও আসিলেন। যুবক নরেন্দ্রনাথ তখনও জানেন না যে, বিধাতা তাঁহার জন্য ভিন্ন পথ নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন।

ঠাকুরকে কাশীপুরে লইয়া আসিবার কয়েক দিনের মধ্যেই সকল বিষয়ে সুব্যবস্থা হইয়া গেল এবং সুশৃঙ্খলভাবে সমস্ত কার্য চলিতে লাগিল। ঠাকুরের পথ্যাদি মাতাঠাকুরানী স্বহস্তে প্রস্তুত ও পরিবেশন করিতেন।

এ কাজে তাঁহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবীকেও আনানো হইয়াছিল। যুবকদের মধ্যে কে কোন্ সময়ে কি কাজ করিবেন,—তাহা একেবারে তালিকা প্রণয়নপূর্বক নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে ঠাকুরের অবস্থা জানাইবার জন্য প্রত্যহ একজন সেবককে কলিকাতায় যাইতে হইত।

যুবক ভক্তেরা একদিকে যেমন ঠাকুরের সেবায় মনপ্রাণ ঢালিয়া দিলেন, অপর দিকে তেমনি আত্মোন্নতির জন্যও উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। কাজের ফাঁকে যেটুকু সময় পাওয়া যাইত, তাহা বৃথা নষ্ট না করিয়া ধ্যান, জপ, পাঠ, সদালাপ প্রভৃতিতে নিয়োজিত করিতেন। নরেন্দ্রনাথই ছিলেন এ বিষয়ে সকলের পথপ্রদর্শক ও উৎসাহদাতা। তিনি এমনভাবে তাঁহাদিগকে ব্যাপৃত রাখিতেন যে, সময় কোন্ দিক দিয়া চলিয়া যাইত কেহ টেরও পাইতেন না। তিনি সঙ্গীদিগকে বুঝাইয়াছিলেন যে, ঠাকুরের নিকট হইতে হাতে কলমে শিক্ষা লাভ করিবার এই তাঁহাদের শেষ সুযোগ; এই সুযোগের পুরাপুরি সদ্ব্যবহারের জন্য তাঁহাদিগকে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। সকলেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। সারারাত্রি জাগিয়া যুবকেরা ধ্যান-ধারণা অভ্যাস করিতেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে হাত ধরিয়া পথ দেখাইতেন এবং সর্বদা উৎসাহ দিতেন। এইরূপে শ্রীগুরুর সেবাকার্য উপলক্ষ্যে অন্তরঙ্গ শিষ্যেরা একটি ঐক্যবদ্ধ সাধকমণ্ডলীতে পরিণত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের উহাই সূচনা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ঠাকুরের অপার ভালবাসা এবং নরেন্দ্রনাথের অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল এই সঙ্ঘের প্রাণপ্রতিষ্ঠার মূলে।

ঠাকুরকে কাশীপুরে স্থানান্তরিত করিবার অল্পকাল পরে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি একদিন তাঁহাকে দেখিতে আসেন। ঠাকুরের রোগযন্ত্রণা দর্শনে অতিশয় দুঃখিত হইয়া তিনি তাঁহাকে বলিলেন—"মহাশয়! আপনি ইচ্ছা করলেই যোগবলে দেহ রোগমুক্ত করতে পারেন। কেন ওরূপ করেন না? বৃথা ভুগে লাভ কি?" ঠাকুর তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—"ছি ছি, তুমি পণ্ডিত হয়ে এ কি কথা বল্‌ছ গা? যে মন একবার ভগবানকে অর্পণ করেছি, তা তুলে এনে এই দেহটার উপরে রাখ্‌ব?" উত্তর শুনিয়া তর্কচূড়ামণি লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইলেন। তিনি চলিয়া যাইবার পর নরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য শিষ্যেরা ঠাকুরকে খুব জোর করিয়া ধরিয়া বসিলেন, "মহাশয়! আপনার নিজের জন্য

না হউক, আমাদের দিকে তাকিয়ে শরীরটা কিছুদিন রাখুন। আপনি মাকে বলুন যাতে ব্যাধি অচিরাৎ দূর হয়ে যায়। আপনি বললে মা ত আর 'না' করতে পারবেন না!" ঠাকুরের নিকট হইতে উত্তর আসিল—"ওরে, তোদের পক্ষে একথা বলা সহজ, কিন্তু আমার পক্ষে মায়ের নিকট এসব জিনিস চাওয়া অসম্ভব।" কিন্তু নরেন্দ্রনাথ নিরস্ত না হইয়া পুনঃপুনঃ বায়না ধরিলেন যে, নিজের জন্য না হইলেও বালকভক্তদের প্রতি চাহিয়া তাঁহার এ বিষয়ে সম্মত হওয়া উচিত। অগত্যা 'আচ্ছা, দেখা যাবে' বলিয়া ঠাকুর তাহাদিগকে আশ্বাস দিবার পর ভক্তেরা ঠাকুরকে একান্তে রাখিয়া সরিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে নরেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়! মাকে বলেছেন কি ?"

ঠাকুর উত্তর করিলেন—"হাঁ, মাকে বললাম 'মা, গলায় বড্ড ব্যথা হয়েছে, কিছুই খেতে পারি নে, ব্যথাটা একটু কমিয়ে দে, যাতে ক্ষিদে পেলে অন্ততঃ একটু কিছু খেতে পারি।' মা অমনি তোদের সকলকে দেখিয়ে বললেন,—'কেন, অতগুলি মুখ দিয়ে ত খাচ্ছিস্।' মায়ের কথায় বড়ই লজ্জিত হলাম, আর কিছু বলতে পারলাম না।"

নরেন্দ্রনাথের ভুল ভাঙ্গিল; মুখে আর কথা সরিল না। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে, নিজের দেহের প্রতি ঠাকুরের কিছুমাত্র মমত্ব নাই; কিন্তু অপর দিকে সমগ্র বিশ্বের সহিত একাত্মবোধ।

কাশীপুরে আগমনের পর ঠাকুর প্রথমে বেশ একটু সুস্থ অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্পদিন যাইতে না যাইতেই অবস্থার পুনরায় অবনতি দেখা দিল। ঠাণ্ডা লাগিয়া, কিংবা অপর যে-কোন কারণেই হউক,—তিনি অত্যন্ত শীতভাব ও দুর্বলতা বোধ করিতে লাগিলেন। সুতরাং ঘরের বাহিরে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিতে হইল। বলাধানের নিমিত্ত ডাক্তার মাংসের সুরুয়ার ব্যবস্থা করিলেন। উক্ত পথ্যগ্রহণের ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই দুর্বলতার ভাব কাটিয়া গেল এবং স্বাস্থ্যেরও উন্নতি দেখা গেল। ঐ সময়ে বৌবাজার পল্লীর সুবিখ্যাত রাজেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় একদা ঠাকুরকে দেখিতে আসেন। রাজেন্দ্রবাবু বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথ ছিলেন; উঁহার সহিত মিলিত হইয়াই ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার হোমিওপ্যাথি-শাস্ত্রের চর্চা প্রথম আরম্ভ করেন। উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। রাজেনবাবু ঠাকুরকে উত্তমরূপে পরীক্ষাপূর্বক

এবং ডাক্তার সরকারের অনুমোদনক্রমে একটি ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। উহা সেবনের ফলে দু'তিন সপ্তাহকাল অত্যাশ্চর্য ফল দেখা গেল, সকলের মনেই খুব আশা জন্মিল যে, হয়তো ঠাকুর ব্যাধির কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিবেন।

স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবার ফলে ঐ সময় ঠাকুর মাঝে মাঝে বাগানে একটুখানি পায়চারি করিতেন। পয়লা জানুয়ারি দিবসে (১৮৮৬ খ্রীঃ) তিনি বিশেষ সুস্থ ও প্রফুল্ল বোধ করাতে অপরাহ্নে ঐরূপ বেড়াইবার উদ্দেশ্যে নীচে নামিয়া আসেন। ছুটি থাকার দরুন কলিকাতা হইতে কতক গৃহীভক্ত ঠাকুরের দর্শনমানসে সেদিন কাশীপুরে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নীচে হলঘরে বসিয়াছিলেন, অপর কেহ কেহ বাগানে বসিয়া রৌদ্রসেবন ও গল্প করিতেছিলেন। ঠাকুরকে নীচে নামিয়া আসিতে দেখিয়া এবং তাঁহার প্রফুল্ল ভাব অবলোকন করিয়া হলঘরে উপবিষ্ট ভক্তদের আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন এবং তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া বাগানে বেড়াইতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। যেসকল ভক্ত বাগানে রৌদ্রসেবন করিতেছিলেন, তাঁহারা ঠাকুরকে দেখিবামাত্র পুলকভরে কাছে ছুটিয়া আসিয়া ঠাকুরের পদধূলি লইতে লাগিলেন। শিষ্যদের ভক্তিভাব দর্শনে ঠাকুরের করুণাসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। সহসা তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল—ভাবাবিষ্ট অবস্থায় আশীর্বাণী উচ্চারণপূর্বক তিনি শ্রীহস্তের স্পর্শদ্বারা প্রত্যেককে অনুভূতির এক অত্যুচ্চ রাজ্যে পৌছাইয়া দিতে লাগিলেন। অপূর্ব করুণামাখা সুরে তিনি কহিলেন—"তোমাদের কি আর বল্‌ব,—আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হউক।" ঐ বাক্য শ্রবণমাত্র তাঁহাদের মনে চৈতন্যের উদয় হইল ; এক অপার্থিব আনন্দে তাঁহাদের মনপ্রাণ ভরিয়া গেল। গিরিশ, অতুল, রামচন্দ্র, নবগোপাল, হরমোহন, কিশোরী, হারাণ, রামলাল, অক্ষয় প্রভৃতি ভক্তেরা তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং ঠাকুরের এবম্প্রকার কল্পনাতীত কৃপালাভে ধন্য হইয়াছিলেন। দেহত্যাগের সময় নিকটবর্তী জানিয়া ঠাকুর আপন অলৌকিক অধ্যাত্মশক্তির দ্বারা যেন শিষ্য ও ভক্তবৃন্দের সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে এবং সর্ববিধ কল্যাণ সাধন করিতে অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। রোগশয্যায় শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার স্বর্গীয় প্রেম যেরূপ অজস্র, অফুরন্ত ধারায় ঝরিয়া পড়িয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক্

হইতে হয়। দেহ যতই ক্ষীণ ও দুর্বল হইতে লাগিল, সর্বজীবের প্রতি দয়া ততই যেন আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রতি বাক্য, প্রতি ব্যবহারের ভিতর দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ঠাকুরের বালক ও যুবক ভক্তেরা ঐ সময়ে শুধু শ্রীগুরুর সেবাকার্যে নিরত ছিলেন না, কঠোর তপশ্চর্যায়ও ব্রতী হইয়াছিলেন। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দর্শনলাভের নিমিত্ত নরেন্দ্রনাথের চিত্ত ঐ সময়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। ঠাকুর দেহরক্ষা করিলে এ বিষয়ে এমন সাহায্যকারী আর কাহাকেও পাইবেন না—ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি ক্রমশঃ অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িতেছিলেন। অবশেষে একদিন ঠাকুরকে একাকী পাইয়া আবেগভরে নিবেদন করিলেন, "মহাশয়! সবাইকে ত সত্য বস্তুর আস্বাদ পাইয়ে দিলেন। আমিই শুধু বাকী থাক্‌ব? আমাকেও অনুগ্রহ করুন।" ঠাকুর স্নেহপূর্ণস্বরে উত্তর করিলেন—"তুই ভাবিস্ কেন? তোর পরিবারবর্গের একটা ব্যবস্থা করে এখানে চলে আয়, সব কিছুই পাবি। তুই কী চাস্, আমাকে বল্।" নরেন্দ্রনাথ কহিলেন—"আমি এক-টানা তিন চার দিন সমাধিতে মগ্ন হয়ে থাকতে চাই। আহারের জন্য একবার একটুখানি সমাধি ভাঙ্গবে, তার পরেই আবার সমাধিতে ডুবে যাব।" ঠাকুর ইহা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"তুই ত বড় হীনবুদ্ধি! তার চেয়েও উঁচু অবস্থায় পৌঁছানো যায়। তুই না গান করিস্—যো কুছ্ হ্যায় সব তুহুঁ হ্যায়। সাংসারিক ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে আয়; দেখবি তোকে সমাধি অপেক্ষাও উচ্চতর রাজ্যে পৌঁছিয়ে দেবো!"

ঠাকুরের সহিত উপরিবর্ণিত কথাবার্তা হইবার পর নরেন্দ্রনাথ একদিন নিজের বাড়ীতে গেলেন। তাঁহাকে সম্মুখে পাইয়া বাড়ীর অভিভাবকস্থানীয় লোকেরা অনুযোগ করিতে লাগিলেন, তিনি কেন লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতেছেন না এবং ওকালতী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন না। নরেন্দ্রনাথ কবে রোজগারী হইয়া তাঁহাদের অভাব মোচন করিবেন—এই প্রত্যাশায় পরিবারের লোকেরা দিন গণিতেছিলেন। তাঁহাদের ম্লান মুখ দেখিয়া ও কাতরোক্তি শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না; মনে মনে স্থির করিলেন যে, আইন পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইবেন। তাঁহার দিদিমার বাড়ীতে যে একটি ঘরে তিনি সাধারণতঃ পড়াশুনা করিতেন,

সেখানে গিয়া পড়িতে বসিলেন। কিন্তু যেই বই খুলিয়াছেন, অমনি এক দারুণ ভীতি আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল—তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, রোজগারের জন্য লেখাপড়া করা মহাপাপ। মনের ভিতরে এক দারুণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। কর্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া তিনি বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। অবশেষে পুঁথিপত্র সমস্ত ফেলিয়া রাখিয়া তিনি উর্ধ্বশ্বাসে উত্তর দিকে রওয়ানা হইলেন; ডাহিনে বামে কোন দিকে না তাকাইয়া ভূতাবিষ্টের ন্যায় বেগে চলিতে চলিতে তিনি সোজা কাশীপুরে ঠাকুরের সন্নিধানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

তখন রাত্রি নয়টা (তারিখ, ৪ঠা জানুয়ারি),—নিরঞ্জন, শশী ও মাস্টার ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট। ঠাকুরের গলার যন্ত্রণা খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল; বহুক্ষণ ধরিয়া ছটফট করিবার পর একটু আগে তিনি তন্দ্রাবিষ্ট হইয়াছেন। তন্দ্রাভঙ্গে চোখ মেলিয়াই নরেনের কথা পাড়িলেন। নরেনের ব্যাকুলতা দেখিয়া তিনি নিরতিশয় প্রসন্ন হইয়াছিলেন। বাক্যোচ্চারণের শক্তি ছিল না,—চাপা গলায় এবং আকারে ইঙ্গিতে কহিতে লাগিলেন—"ছাখ্, নরেনের কি চমৎকার অবস্থা হয়েছে! এক সময় ছিল, যখন সে সাকারে বিশ্বাস করত না; কিন্তু এখন সাকারের প্রত্যক্ষ দর্শন পাবার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছে।" তৎপরে আভাসে বুঝাইলেন যে, নরেনের উদ্দেশ্যসিদ্ধির আর বেশী বিলম্ব নাই। ঠাকুরের এই আশ্বাসবাণী শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ আরও দু'একজন গুরুভাই সহ নির্জনে সাধনার উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেলেন এবং সারারাত্রি পঞ্চবটীতলে কাটাইয়া পরদিন প্রভাতে কাশীপুরে ফিরিলেন।

তীব্র ব্যাকুলতা ও কঠোর সাধনার মধ্যে নরেনের দিনগুলি কাটিতে লাগিল। ঠাকুর তাঁহার প্রিয়তম শিষ্যকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করিতেছিলেন। একদিন নরেনকে খোলাখুলিই বলিলেন—"ছাখ্, তোর উপরেই সব ভার দিয়ে যাচ্ছি। তুই-ই সব দেখাশুনা করবি; রাখাল টাখাল এরা যাতে সাধনভজনে লেগে থাকে এবং কেউ সংসারে ফিরে না যায়, তার ব্যবস্থা তুই-ই করবি।" বস্তুতঃ ঠাকুর তাঁহার 'হোমাপাখীর শাবকদিগকে' সন্ন্যাসের পথ ধরাইয়া দিয়া সেই পথেই চালিত করিতেছিলেন।

ঠাকুরের পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া এমন অবস্থায় পৌঁছিল যে, খাওয়া প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। পুষ্টির অভাবে শরীর শুকাইয়া ক্রমশঃ অস্থিচর্মসার হইতে

লাগিল। ঠাকুরের এই দশা দেখিয়া শিষ্য ও ভক্তেরা মনোদুঃখে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের প্রাণের ঠাকুর আর বেশীদিন দেহধারণ করিয়া থাকিবেন না,—জীবনের অবলম্বনকে তাঁহারা হারাইতে বসিয়াছেন। কোন কোন দিন ঠাকুরের গলা হইতে এত রুধির নির্গত হইত যে, তাহা দেখিয়া ভক্তেরা ভয়ে সন্ত্রস্ত হইতেন। কিন্তু ঠাকুরকে নির্বিকার ও প্রফুল্ল দেখা যাইত। যখন যন্ত্রণা অসহ্য আকার ধারণ করিত, তখনও তিনি হাসিমুখে ক্ষীণস্বরে বলিতেন—"দুঃখ জানে, আর শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থেকো।"

দেহসম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং নির্বিকার থাকিলেও ঠাকুরের মনে শিষ্যদের জন্য ভাবনা তখনও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, সর্বক্ষণ শিষ্যদের হিতচিন্তায় তিনি নিমগ্ন। একদা রাত্রিতে (১৪ই মার্চ) বিছানায় শুইয়া ছটফট করিতেছেন, রোগের যন্ত্রণায় কিছুতেই ঘুম আসিতেছে না,—এ অবস্থায় মাস্টারকে ফিসফিস করিয়া অতি কষ্টে কহিতে লাগিলেন—"তোমরা কাঁদবে বলে এত ভোগ করছি ; সব্বাই যদি বল—'এত কষ্ট, তবে দেহ যাক্'—তাহলে দেহ যায়।" পরদিন সকালে গিরিশ একজন ডাক্তার ও একজন কবিরাজকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অবস্থা একটু ভাল। তাঁহাদিগকে সেই একই কথা বলিতে লাগিলেন, "ব্যামোটা ত শরীরের। এ শুধু প্রকৃতির খেলা। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—এটা জড়বস্তুর বিকার অথবা পরিণাম।" ইত্যাদি।

তার পরদিন ব্যাধির প্রকোপ একটু হ্রাস পাইয়াছে। সকাল আটটার সময় নরেন, রাখাল, লাটু, মাস্টার, বুড়ো গোপাল এবং আরও জনকয়েক ভক্ত ঠাকুরের ঘরে বসিয়া আছেন। সকলের মুখেই বিষাদের ছায়া। ঠাকুর কহিতে লাগিলেন, "তোমরা বলতে পার—আমি কি দেখছি ? আমি দেখছি, তিনিই সব হয়েছেন। মানুষ, প্রাণী সব যেন পুতুল,—তিনি ভিতর থেকে হাত পা নাড়াচ্ছেন, খুশিমত চালাচ্ছেন। ভাবাবিষ্ট অবস্থায় দেখতুম বাগান, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, মানুষ, গরুবাছুর, সব কিছু যেন মোম দিয়ে গড়া—সব একই জিনিসে তৈরী।"

একটু থামিয়া আবার কহিলেন—"প্রত্যক্ষ দেখছি তিনিই কামার, তিনিই বলি, তিনিই হাড়িকাট হয়েছেন।" বলিতে বলিতে বাহ্যসংজ্ঞা লুপ্ত হইল।

অল্পক্ষণ পরেই কতকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন—"আর ব্যথাট্যথা, জ্বালা-যন্ত্রণা কিছুই নেই ; খুব আরামে আছি।" ভক্তদের প্রতি এমনই স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল যেন ঠাকুরের নয়নযুগল হইতে করুণার ধারা প্রবাহিত হইয়া সকলকে অমৃতবারিতে অভিষিক্ত করিতেছে! মাতা যেমন সন্তানকে আদর করেন, ঠিক সেইরূপ তিনি শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট নরেন, রাখাল প্রভৃতি শিষ্যদের মাথায় এবং মুখে সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। একটু পরে মাস্টারকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন—"এই খোলটা (অর্থাৎ নিজের শরীর) আরও কিছুদিন থাকলে পর বহু লোকের চৈতন্য হতে পারত ; কিন্তু মায়ের ইচ্ছা অন্যরূপ। আমাকে অতি সহজেই ভুলানো যায়। পাছে অসৎ লোকে ফাঁকি দিয়ে আমার কাছ থেকে আসল জিনিস আদায় করে নেয়,—সরল মূর্খ পাছে সব দিয়ে ফেলে,—তাই মা আমাকে সরিয়ে নিচ্ছেন। এ যুগে সাধন-ভজন ত কেউই করতে চায় না!"

রাখাল (বিনীতভাবে)—অনুগ্রহ করে মাকে বলুন না, আপনার শরীরটা আরও কিছুদিন থাকুক।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে মায়ের ইচ্ছা।

নরেন্দ্র—কিন্তু আপনার ইচ্ছা ও মায়ের ইচ্ছা তো এক।

শ্রীরামকৃষ্ণ (একটু থামিয়া)—এতে কিছুই লাভ হবে না। যখন নিজের ইচ্ছাকে মায়ের ইচ্ছার সঙ্গে একেবারে মিশিয়ে দিয়েছি, তখন মায়ের নিকট আর কি করে চাইতে পারি?

উপস্থিত ভক্তবৃন্দ হতাশায় মৌন রহিলেন। ঠাকুর তাঁহাদের প্রতি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া এবং নিজের বুকের উপর হাত রাখিয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন—"এর ভিতরে দুজন রয়েছে ; একজন মা, আর একজন তাঁর সেবক। সেবকেরই একবার হাত ভেঙ্গেছিল*, আবার সেবকেরই এখন ব্যারাম হয়েছে। কি বলছি তোমরা বুঝতে পাচ্ছ কি?"

শিষ্যেরা কেহই কিছু উত্তর করিলেন না। ঠাকুর পুনরায় কহিতে লাগিলেন—"হায়, কাকেই বা এসব কথা বলি, কেই বা বুঝবে?"—(একটু

* একবার পড়িয়া গিয়া ঠাকুরের হাত ভাঙ্গিয়াছিল এবং কিছুদিন পর্যন্ত হাত ব্যাণ্ডেজ করিয়া রাখিতে হইয়াছিল।

থামিয়া) "সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে মানবজন্ম ধারণ করে তিনি আসেন, অবতার হয়ে আসেন। কাজ শেষ হয়ে গেলে আবার তাদের সঙ্গে করে নিয়ে চলে যান।"

রাখাল—তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের ফেলে চলে যাবেন না!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মৃদু হাসিয়া)—একদল গায়ক রাস্তায় চলতে চলতে হয়তো কোনও বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালে, কিছুক্ষণ নাচগান করে যেমন সহসা এসেছিল, তেমনি সহসা অদৃশ্য হয়ে গেল। কেউ তাদের জানতেও পারলে না, চিনতেও পারলে না!

তৎপরে নরেন্দ্রনাথের সহিত ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং সমাধির অবস্থা সম্পর্কে কথাবার্তা হইল। সর্বশেষে ঠাকুরের নির্দেশে নরেন্দ্রনাথ ভজনসঙ্গীত গাহিলেন। গান শুনিয়া ঠাকুরের ও রাখালের নয়ন হইতে প্রেমাশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

যখন কবিরাজী, হোমিওপ্যাথিক প্রভৃতি কোন চিকিৎসায়ই ঠাকুরের পীড়ার উপশম হইল না, তখন মাতাঠাকুরানী দৈব চিকিৎসা করাইতে মনঃস্থ করিলেন এবং তারকেশ্বরে যাইয়া শিবের মন্দিরে হত্যা দিলেন। দুই দিন এক রাত্রি অতিবাহিত হইবার পর দ্বিতীয় রাত্রিতে তিনি একটু তন্দ্রাবিষ্ট হইয়াছেন, এমন সময়ে একটা প্রচণ্ড শব্দ তাঁহার কাণে প্রবেশ করিল। তিনি ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। একটা প্রবল বৈরাগ্যের ভাব তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "পার্থিব সম্পর্ক কোন্ ছার! এগুলি সমস্তই অলীক। এর জন্য কেন এত ভাবনা করি?"

পরদিন তিনি কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলে, ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো! তোমার ওখানে যাবার ফলাফল কি হল?" মাতাঠাকুরানী সব কথা নিবেদন করিলে পর তিনি কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না। ফল যে এরূপ হইবে, তাহা যেন তিনি পূর্ব হইতেই জানিতেন।

কালব্যাধির অবিশ্রাম দহনে ঠাকুরের শরীর দিন দিন শীর্ণ ও দুর্বল হইতে লাগিল। কাহারো বুঝিতে বাকী রহিল না যে, উহা আর বেশীদিন টিঁকিবে না। উহাতে ঠাকুরের সর্বত্যাগী শিষ্যদের মন একদিকে যেমন বিষাদে পরিপূর্ণ হইল, অপরদিকে আধ্যাত্মিক রাজ্যের চরম উপলব্ধিতে পৌঁছিবার জন্য তাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। একদিন নরেন্দ্র, তারক ও কালী বুদ্ধদেবের

ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া চুপি চুপি বুদ্ধগয়ায় চলিয়া যান। তাঁহাদের ঐরূপ নিরুদ্দেশ যাত্রার ফলে অন্যান্য ভক্তেরা খুবই চিন্তিত হইলেন, দুই চারিজন আবার তাঁহাদের ন্যায় প্রব্রজ্যা-গ্রহণের জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিলেন। ঠাকুর উহা জানিতে পারিয়া সকলকে আশ্বাস দানপূর্বক কহিলেন যে, এই ব্যাপারে ভাবিত হইবার কারণ নাই, এবং নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের দৃষ্টান্ত অনুসরণেরও সার্থকতা নাই, যেহেতু নরেন্দ্র, তারক ও কালী শীঘ্রই নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া ফিরিয়া আসিবেন। বস্তুতঃ অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহারা প্রত্যাবর্তন করিলেন। বুদ্ধগয়ায় বোধিদ্রুম-মূলে কয়েক দিন খুব কঠোর তপস্যায় কাটাইয়া নিজ নিজ অন্তরে প্রভূত আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ঠাকুরের নিকট যে বিরাট্ আশ্রয় ও একান্ত নির্ভরতা তাঁহারা পাইয়া থাকেন,—তেমন আর কোথাও পাইবার সম্ভাবনা নাই ; ঠাকুরই তাঁহাদের পক্ষে সকল তীর্থের সার এবং সর্বাবস্থায় একমাত্র নির্ভরযোগ্য আশ্রয়। মাস্তুলের পাখীর ন্যায় তিনজনেই আবার মাস্তুলে ফিরিয়া আসিলেন।*

ঠাকুরের যুবক ভক্তদের মধ্যে কালী অত্যন্ত জিজ্ঞাসু ছিলেন এবং তাঁহার মন ছিল বড়ই যুক্তিপরায়ণ। আর ঐ সময়ে সন্দেহের জোয়ারে তাঁহার মন বড়ই দোল খাইতেছিল। অথচ উচ্চতম আধ্যাত্মিক অনুভূতিলাভের নিমিত্ত তিনি ছিলেন নিতান্ত ব্যাকুল। ঠাকুরকে এ বিষয়ে খুলিয়া বলাতে ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই কি ভগবানে বিশ্বাস করিস্?" কালী স্পষ্ট জবাব দিলেন—"না, আমি বেদে কিংবা শাস্ত্রে বিশ্বাস করি না,—কিছুই মানি না।" একথা শ্রবণে ঠাকুর কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া স্নেহপূর্ণস্বরে কহিলেন—"ত্থাখ্, সাধারণ গুরু হলে তোর মুখে এসব কথা

* "একটা পাখি জাহাজের মাস্তুলের উপর বসেছিল। জাহাজ গঙ্গা থেকে কখন কালাপানিতে পড়েছে, তার হুঁশ নাই। যখন হুঁশ হল, তখন ডাঙ্গা কোনদিকে জানবার জন্ম উত্তরদিকে উড়ে গেল। কোথাও কূল-কিনারা নাই, তখন ফিরে এলো। আবার একটু বিশ্রাম করে দক্ষিণদিকে গেল। সেদিকেও কূল-কিনারা নাই। তখন হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলো। আবার একটু জিরিয়ে এইরূপে পূর্বদিকে ও পশ্চিমদিকে গেল। যখন দেখলে কোন দিকেই কূল-কিনারা নাই, তখন মাস্তুলের উপর চুপ করে বসে রইল। ... যতক্ষণ বোধ যে, ঈশ্বর সেথা, সেথা, ততক্ষণ অজ্ঞান। যখন হেথা, হেথা, তখনই জ্ঞান।"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

শুনলে পর তোকে মার লাগাত, কিন্তু আমি তা করছি না। তুই নরেনের দিকে তাকা। সেও এইরকম সন্দেহের অবস্থায় পড়েছিল, কিন্তু তা পার হয়ে এসেছে—এখন সব কিছুতেই বিশ্বাস করে। এখন রাধাকৃষ্ণের নামেতে চোখের জলে ভাসে। তোরও এই সন্দেহের অবস্থা থাকবে না, শীঘ্রই কেটে যাবে—তখন সব কিছুই বিশ্বাস করবি।"

ঠাকুরের যুবক ভক্তেরা সকলেই তাঁহার সেবার নিমিত্ত আগ্রহান্বিত ছিলেন বটে, কিন্তু এ বিষয়ে শশীর সহিত কাহারো তুলনা হইতে পারিত না। শ্রীগুরুর সেবাই শশী পরম ধর্ম এবং মোক্ষলাভের পথ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধ্যান জপ প্রভৃতি অপর কোন সাধনার তিনি ধার ধারিতেন না। নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, আহার-নিদ্রা, বিশ্রাম প্রভৃতি সব কিছু বিসর্জন দিয়া শ্রীগুরুর সেবাতে সর্বক্ষণ ব্যাপৃত থাকিতেন। নিজের জীবন দিয়াও যদি শ্রীগুরুর রোগ-যন্ত্রণার কিছুমাত্র উপশম হইতে পারিত, তবে সানন্দে তাহাই তিনি করিতে প্রস্তুত ছিলেন। শ্রীগুরুর সেবাই তিনি সাধন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং গুরুকৃপায় তদ্দ্বারাই পরম ধনের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, নির্বিকল্প সমাধির অবস্থায় পৌঁছিবার জন্য নরেন্দ্রনাথ কিছুকাল যাবৎ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও যাহা আয়ত্ত করিতে পারিতেছিলেন না, সেই অবস্থা নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে সহসা একদিন তাঁহার নিকট যেন আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ধ্যাকালে ধ্যানে বসিয়া মস্তকের পশ্চাদ্দেশে তিনি একটা জ্যোতি দেখিতে পাইলেন। পরমুহূর্তেই মায়ার রাজ্য ছাড়াইয়া মন পরব্রহ্মে লীন হইয়া গেল,—নরেন্দ্রনাথ নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কতকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহার বোধ হইল যেন মাথাটাই শুধু আছে, শরীরটা আর নাই। তিনি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"হায়! হায়! আমার শরীরটা কি হল?" চীৎকার শুনিয়া বুড়ো গোপাল তাঁহার কাছে গেলে পর আবার ভীত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"আমার শরীর কোথায় গেল?" আশ্বাস দিবার নিমিত্ত তাঁহার গায়ে হাত দিয়া বুড়ো গোপাল বলিলেন—"নরেন! এই ত তোমার শরীর, এমন কথা কেন বল্‌ছ?" কিন্তু উহাতেও নরেনের ভুল ভাঙ্গিল না দেখিয়া গোপাল নিজে

অত্যন্ত ভয় পাইয়া ঠাকুরের নিকট গমনপূর্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন ঠাকুর কিছুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ না করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন—"ঐ অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকতে দে, এর জন্য কতবার পীড়াপীড়ি করেছে।"

বহুক্ষণ পরে নরেন্দ্রনাথ স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, গুরুভাইয়েরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। এক অনির্বচনীয় শান্তি তিনি মনের ভিতরে অনুভব করিতেছিলেন। ঠাকুরের সন্নিধানে আসিলে পর তিনি কহিলেন, "মা এবারে তোকে সব দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু ভাঁড়ার আপাততঃ বন্ধ করে দেওয়া হল, চাবি রইল আমার হাতে। মায়ের যে কাজে তুই এসেছিস্ তা যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন আবার পাবি।" কয়েক দিন পর্যন্ত নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক থাকিতে এবং খাদ্যসম্পর্কে বিশেষ বাচবিচার করিয়া চলিতে তিনি নরেন্দ্রনাথকে বলিয়া দিলেন।

মহেন্দ্রলাল সরকার ও রাজেন্দ্রনাথ দত্ত দুজনে মিলিয়া হোমিওপ্যাথি মতে ঠাকুরের চিকিৎসা করিয়া যাইতেছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহারা ঠাকুরকে দেখিতে আসিতেন। ডাক্তার সরকার যখনই আসিতেন, অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিতেন, ঠাকুরের সঙ্গসুখ ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার মন চাহিত না। বৈশাখ মাসে ঠাকুরের গলার অবস্থার একটু উন্নতি দেখা গেল, কিন্তু উহা স্থায়ী হইল না। যন্ত্রণার যৎসামান্য উপশম হইবামাত্র তিনি বিধিনিষেধ অমান্য করিয়া কথাবার্তা বলিতেন। বহুস্থান হইতে দর্শনার্থী লোকেরা আসিত; তাহাদের সহিত কথাবার্তা একেবারে না বলিয়া মনে কিছুতেই সোয়াস্তি পাইতেন না। এইভাবে ব্যাধির প্রকোপ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিল।

মহাপ্রয়াণ

জ্যৈষ্ঠমাস আরম্ভ হইতেই ঠাকুরের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটিতে লাগিল। শ্রাবণমাসের শেষভাগে একদা তিনি যোগীনকে একখানি পঞ্জিকা আনিয়া ২৫শে শ্রাবণ হইতে দিনগুলির বিবরণ পড়িয়া শুনাইতে কহিলেন। যোগীন একে একে যখন সংক্রান্তি দিনের তিথি-নক্ষত্রাদি শুনাইলেন, তখন ঠাকুর তাঁহাকে ইঙ্গিতে বুঝাইলেন যে, আর পড়িতে হইবে না।

উপর্যুক্ত ঘটনার চার পাঁচদিন পরে ঠাকুর নরেন্দ্রকে একাকী কাছে ডাকিয়া নিজের সম্মুখে বসাইলেন, এবং তাঁহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া গভীর সমাধিতে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। নরেন্দ্রনাথের বোধ হইল যেন বিদ্যুৎপ্রবাহের ন্যায় একটি তীক্ষ্ণ শক্তিপ্রবাহ তাঁহার সর্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলিতেছে! ক্রমশঃ তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। সেই অবস্থায় কতক্ষণ গত হইল, তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না। সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে দেখিতে পাইলেন যে, ঠাকুরের নয়নযুগল হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। উহার কারণ জানিতে চাহিলে ঠাকুর কহিলেন—"আজ তোকে আমার সকল শক্তি নিঃশেষে দান করে ফকির হলাম। এই শক্তির দ্বারা তুই জগতের অনেক উপকার করবি, এবং ব্রত সাঙ্গ হলে পর তবে ফিরে যেতে পারবি।" এই মহাশক্তির অধিকারী হইয়া নরেন্দ্রনাথ সমগ্র জগদ্‌ব্যাপী কি বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটাইলেন, তাহা আজ কাহারও অবিদিত নাই।

ভক্তেরা দারুণ ভয় ও উদ্বেগের সহিত যে বিয়োগদিবসের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, অবশেষে তাহা সমুপস্থিত হইল। সেদিন ছিল রবিবার, শ্রাবণ-সংক্রান্তি, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ (১৫ই আগষ্ট, ১৮৮৬ খ্রীঃ)। সকালবেলা হইতেই ঠাকুরের ব্যাধির প্রকোপ অতিশয় বৃদ্ধি পাইল ; তিনি যাতনায় ছটফট করিতে লাগিলেন। অতুলের * অদ্ভুত নাড়ীজ্ঞান ছিল ; ঠাকুরের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া তিনি প্রমাদ গণিলেন এবং অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক বলিয়া মত প্রকাশপূর্বক তিনি ভক্ত ও সেবকবৃন্দকে প্রস্তুত থাকিতে কহিলেন। সারাদিন

* গিরিশচন্দ্রের ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণ ঘোষ। ইনি বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

কোনও প্রকারে গত হইবার পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঠাকুরের শ্বাসকষ্ট দেখা দিল। ভক্তেরা আর কান্না চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর ইশারায় জানাইলেন যে, তাঁহার ক্ষুধা পাইয়াছে। তৎক্ষণাৎ তরল পথ্য আনিয়া হাজির করা হইল, কিন্তু দু'এক চামচের বেশী তিনি খাইতে পারিলেন না। পাখার বাতাস করিয়া আস্তে আস্তে তাঁহাকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করা হইল; কিন্তু নিদ্রা না যাইয়া সহসা তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন এবং শরীর যেন একেবারে কাঠের ন্যায় শক্ত হইয়া গেল। শশী লক্ষ্য করিলেন যে, এ অবস্থা একেবারে নূতন, সমাধিকালে পূর্বে কখনও এরূপ হইতে তাঁহারা দেখেন নাই। ভীত হইয়া গিরিশ ও রামচন্দ্রকে তখনই তাঁহারা খবর পাঠাইলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইবার পর ঠাকুরের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল; সংজ্ঞালাভ করিয়াই বলিলেন যে, তাঁহার বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছে। সেবকেরা তাঁহাকে বালিশ ঠেসান দিয়া তুলিয়া বসাইলে পর তিনি বেশ স্বচ্ছন্দভাবে একবাটি মণ্ড পান করিলেন। ইতিপূর্বে বহুদিনের মধ্যে তিনি এরূপ স্বচ্ছন্দভাবে কোন আহার্য অথবা পানীয় গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পথ্যগ্রহণের পর তিনি জানাইলেন যে, বেশ ভালই বোধ করিতেছেন। তখন নরেন কহিলেন যে, এবারে তাঁহার একটু নিদ্রা যাওয়া উচিত। ঠাকুর উহাতে সম্মত হইয়া মুখে তিনবার কালীনাম উচ্চারণপূর্বক ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িলেন। যেরূপ সুস্পষ্টভাবে তিনি কালীনাম উচ্চারণ করিলেন, তাহাতে সকলের অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিল; কারণ কিছুদিন আগে হইতেই তাঁহার গলার স্বর প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ঠাকুর বেশ আরামে আছেন মনে করিয়া নরেন্দ্রনাথ নিজেও একটু বিশ্রামের জন্য নীচে গেলেন।

ঘড়িতে একটা বাজিবার দুই মিনিট পরে সহসা একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ঠাকুরের শরীরের উপর দিয়া বহিয়া গেল। সেই তরঙ্গাভিঘাতে শরীর রোমাঞ্চিত, দৃষ্টি নাসিকাগ্রে স্থির এবং মুখমণ্ডল এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইল; ঠাকুর পুনরায় সমাধিরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ দেখিতে পাইলেন যে, ঠাকুরের যেরূপ সমাধি অবস্থার সহিত তাঁহারা বরাবর পরিচিত, উহা সেরূপ নহে। তাঁহাদের ভয়ের এবং উদ্বেগের আর সীমা রহিল না। বিপৎ-সঙ্কেত পাইয়া কুঠীবাড়ীর যে যেখানে ছিলেন, সকলেই ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহাদের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ঠাকুর

মহাসমাধিতে নিমগ্ন হইয়াছেন, তাঁহার দেহে প্রাণবায়ু ফিরিয়া আসিবার আর সম্ভাবনা নাই। বাহিরে কৌমুদী হাসিতেছে, বর্ষার বৃষ্টিধৌত গাছপালা শুভ্র চন্দ্রালোকে ঝলমল করিতেছে ;—কিন্তু ঘরের ভিতরে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানদের হৃদয়ে অমাবস্যার ঘনান্ধকার। মহাসমাধিতে নিমগ্ন ঠাকুরের অর্ধনিমীলিত নেত্রযুগল ও ঈষৎ হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে যতই তাঁহারা তাকান, ততই শোকসিন্ধু যেন উথলিয়া উঠে,—মনে হইতে থাকে জীবনের প্রধান অবলম্বনকে হারাইয়া একেবারে অনাথ হইয়াছেন।

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই চারিদিকে সংবাদ প্রেরিত হইল এবং ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তিবর্গ তাঁহার শেষ দর্শন পাইবার, এবং শেষকৃত্যে যোগদান করিবার নিমিত্ত দলে দলে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিলেন। কর্ণেল বিশ্বনাথ উপাধ্যায় এবং ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের ন্যায় প্রবীণ ব্যক্তিরাও প্রাণের আবেগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নববিধান সমাজের ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেকেই আসিলেন ; তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন—ভাই অমৃতলাল বসু, ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল, গিরিশচন্দ্র সেন ও প্রাণকৃষ্ণ দত্ত।

শবদেহ বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত গরম ছিল ; সুতরাং ততক্ষণ উহা নাড়াচাড়া করা হইল না। দেহ সম্পূর্ণ শীতল হইবার পর স্নানাদি সম্পন্ন করাইয়া মাল্য-চন্দনে শোভিত ও গৈরিকবস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় উহা নীচে নামাইয়া একখানি নূতন খাটে উত্তম শয্যার উপর শায়িত করা হইল। ভক্তেরা ফুলের তোড়া ও ফুলের মালার দ্বারা শবদেহ সুন্দরভাবে সাজাইলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের নির্দেশে সকল ভক্ত শবদেহকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং সেই অবস্থায় একখানি আলোকচিত্র গৃহীত হইল। অনন্তর সমবেত শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণিপাতপূর্বক হরিধ্বনি করিতে করিতে শবাধার স্কন্ধে লইয়া বরানগরের শ্মশানঘাট অভিমুখে রওনা হইলেন। একদল ভক্ত খোল-করতাল বাজাইয়া কীর্তন করিতে করিতে আগে আগে যাইতে লাগিলেন। অপর সকলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। রাস্তার দুই ধারে দাঁড়াইয়া অসংখ্য নরনারী এই মহাপ্রয়াণের দৃশ্য দেখিতে লাগিল এবং সকলেরই নয়ন অশ্রুজলে ভরিয়া উঠিল।

শ্মশানে উপনীত হইয়া ভক্তেরা ঠাকুরের দেহ চিতাশয্যায় স্থাপনপূর্বক ঘুরিয়া ঘুরিয়া কিয়ৎক্ষণ নাম সংকীর্তন করিলেন। ভাই ত্রৈলোক্যনাথ

সান্ন্যালের সুমধুর কণ্ঠের গান শুনিতে ঠাকুর বড়ই ভালবাসিতেন। উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের অনুরোধক্রমে চিতাপার্শ্বে বসিয়া প্রাণের আবেগে ঠাকুরের সবিশেষ প্রিয় তিন চারখানি গান তিনি গাহিলেন। ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্যেরা সকলেই পুত্রবৎ তাঁহাদের মহান্ ধর্মপিতার চিতায় অগ্নিসংযোগ করিলে পর চিতাগ্নির লেলিহান জিহ্বা অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করিল। দর্শক এবং শ্মশানবান্ধবরূপে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই শূন্যমনে আপন আপন গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

ঠাকুরের মহাপ্রয়াণে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদের মাথায় প্রথম যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, শ্মশানভূমি ত্যাগ করিবার পূর্বেই তাঁহারা হৃদয়ে অপূর্ব সান্ত্বনা এবং বল প্রাপ্ত হইলেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে বলিতেন যে, মৃত্যু আর কিছুই নহে, আত্মার পক্ষে যেন এঘর থেকে ওঘরে যাওয়া। শ্মশানভূমিতে অবস্থানকালেই তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইল যে, ঠাকুর শুধু চর্মচক্ষুর অন্তরাল হইয়াছেন, বস্তুতঃ তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া যান নাই। দাহকার্য সমাপ্ত হইলে ঠাকুরের চিতাভস্ম ও পূতাস্থি যথারীতি সংগ্রহপূর্বক তাঁহারা একটি কলসীতে রাখিলেন এবং সেই কলসী মাথায় লইয়া 'জয় ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ' ধ্বনি করিতে করিতে কাশীপুরের বাগানবাটীতে ফিরিয়া গেলেন।*

কাশীপুরের বাগানবাটী যে-সময়ের জন্য ভাড়া লওয়া হয়, তাহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইতে তখনও অল্প কিছুদিন বাকী ছিল। ঐ কয়েক দিন অতিবাহিত হইবার পর যেসকল যুবক ইতিপূর্বেই ঠাকুরকে সর্বস্ব জানিয়া একরূপ চিরতরে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কোথায় যাইবেন, কি করিবেন—এই লইয়া মহা সমস্যার উদয় হইল। ঠাকুরের পীড়ার সময়ে অনেক ভক্ত-গৃহস্থ অর্থ সাহায্য করিতেন। কিন্তু ঠাকুরের পরলোকগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ঐসমস্ত সাহায্য প্রায় বন্ধ হইয়া গেল; কারণ ছোকরা ভক্তদের প্রতি কাহার এত দরদ এবং তাঁহাদের উপর কাহারই বা এত বিশ্বাস থাকিতে পারে যে, তাঁহাদের ভরণপোষণের নিমিত্ত টাকাকড়ি জোগাইবেন? কিন্তু

* পবিত্র চিতাভস্মের কিয়দংশ লইয়া গিয়া রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে ভূপ্রোথিত করিয়াছিলেন। বাকী অংশ ভক্তেরা প্রধানতঃ কিছুদিন বলরাম বসু মহাশয়ের ভবনে রাখিয়া পরে বরানগর মঠে স্থানান্তরিত করেন।

একজনের অন্তত: সেই বিশ্বাস এবং ভালবাসা ছিল ; তিনি ঠাকুরের পরম ভক্ত এবং নিরতিশয় স্নেহভাজন—সুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

ঠাকুর তাঁহার হোমাপাখির শাবকদিগকে গেরুয়া প্রভৃতি সন্ন্যাসের বাহ্য চিহ্ন ধারণের নির্দেশ কখনও দেন নাই,—কিংবা আপন আপন পিতৃদত্ত নাম এবং কৌলিক উপাধি বর্জন করিতেও বলেন নাই।* সুতরাং নিজ নিজ আলয়ে ফিরিয়া যাইতে বাহিরের দিক্ হইতে কোনই বাধা ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের অন্তর তিনি বৈরাগ্যের রংয়ে ছোপাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা কেহই বাটীতে ফিরিয়া গিয়া সংসারী সাজিতে প্রস্তুত ছিলেন না। দায়ে ঠেকিয়া এবং যন্ত্রচালিতের ন্যায় অনেকেই স্বপরিবারে গেলেন বটে, কিন্তু তথায় কিছুতেই মন টিকিল না। অধিকন্তু, যুবক ভক্তদের মধ্যে দু'তিন জনের যাইবার স্থান পর্যন্ত ছিল না। সুরেন্দ্র তাঁহাদিগকে বলিলেন, "ভাই! একটা বাসা করে তোমরা এক জায়গায় থাক। তাতে আমাদেরও একটা জুড়াবার স্থান হবে। সংসারের তাপে দিনরাত দগ্ধ হয়ে কেমন করে থাকি? মাঝে মাঝে একটু জুড়ানো দরকার। ঠাকুরের সেবার জন্য মাসে মাসে যৎকিঞ্চিৎ দিতাম, এখন তোমাদের জন্য সেই টাকাটা দেবো। এতে তোমাদের বাসাখরচ চলে যাবে।" এই প্রস্তাব অনুযায়ী বরাহনগরে একটি ক্ষুদ্র বাটী অবিলম্বে ভাড়া লওয়া হইল। ট্যাক্সসমেত ভাড়া ছিল মাসিক ১১৲, পাচকের মাহিনা ৬৲ এবং তদুপরি ডাল-ভাতের খরচ। প্রথমে সুরেন্দ্র মাসিক ৩০৲ হারে দিতেন, তাহাতেই কোনরকমে কুলাইয়া যাইত। পরে মঠের বাসিন্দাদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়াইয়া মাসিক ১০০৲ এবং তদূর্ধ্ব পর্যন্ত করিয়াছিলেন।

"ছোট গোপাল প্রথমে কাশীপুরের বাগান হইতে ঠাকুরের গদি ও জিনিস-পত্র লইয়া সেই বাসা-বাড়ীতে গেলেন। সঙ্গে পাচক ব্রাহ্মণ শশী। রাত্রে শরৎ আসিয়া থাকিলেন। তারক বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন; কিছুদিনের মধ্যে তিনিও আসিয়া জুটিলেন। নরেন্দ্র, শরৎ, শশী, বাবুরাম, নিরঞ্জন, কালী—এঁরা প্রথমে মাঝে মাঝে বাড়ী হইতে আসিতেন। রাখাল, লাটু, যোগীন ও কালী ঠিক ঐ সময়ে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। কালী একমাসের মধ্যে, রাখাল কয়েক মাস পরে, যোগীন এক বৎসর পরে ফিরিলেন।

* সন্ন্যাসের নাম, পরিচ্ছদ ও অন্যান্য চিহ্ন তাঁহারা পরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"কিছুদিন মধ্যে নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, বাবুরাম, যোগীন, কালী ও লাটু রহিয়া গেলেন; আর বাড়ীতে ফিরিলেন না। ক্রমে প্রসন্ন ও সুবোধ আসিয়া রহিলেন। গঙ্গাধর ও হরিও পরে আসিয়া জুটিলেন।" *

এইরূপে বরাহনগর মঠের প্রতিষ্ঠা হইল। যুবক ভক্তবৃন্দের ত্যাগ-বৈরাগ্য, সুরেন্দ্রের ভালবাসা ও অর্থসাহায্য, এবং নরেন্দ্রনাথের অসীম উৎসাহই ছিল উহার মূলে। আর সব কিছুর কেন্দ্রস্থলে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। বলরামবাবুর বাটী হইতে ঠাকুরের দেহাস্থি মঠে আনয়ন এবং তথায় শ্রীগুরুর আসন স্থাপনপূর্বক যুবক ভক্তেরা নিত্যপূজা ও সেবার ব্যবস্থা করিলেন; শশীই এই ভার প্রধানতঃ আপন স্কন্ধে লইলেন।

বরাহনগরে মঠস্থাপনের ফলে ঠাকুরের গৃহী ভক্তেরাও প্রাণে বল ও উৎসাহ পাইলেন, এবং মঠের ভাইদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া নিজেদের আধ্যাত্মিক জীবন গড়িয়া তুলিবার, তৎসঙ্গে সাধুসেবার সুযোগ পাইলেন। এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সুদৃঢ় কাঠামো রচিত হইল। বলা বাহুল্য, নরেন্দ্রনাথ আপন অসামান্য ব্যক্তিত্বের বলে হইয়াছিলেন এই সঙ্ঘের নেতা ও প্রাণ! মঠে থাকিয়া সকল গুরুভাই কঠোর তপশ্চর্যায় ব্রতী হইলেন,—সকলেরই মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—মন্ত্রের সাধন, কিংবা শরীর পতন। কিছুদিন যাইতে না যাইতে অনেকের নিকট মঠের জীবনও বন্ধন বলিয়া মনে হইতে লাগিল,—তীব্র বৈরাগ্যের প্রেরণায় প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক তাঁহারা নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িলেন। মঠের কর্ণধার হইয়া রহিলেন শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ); শ্রীগুরুর সেবাপূজা ছাড়িয়া একদিনের জন্যও অন্যত্র যাইতে তাঁহার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না।

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দও পরিব্রাজকবেশে বাহির হইয়া যান। হিমালয় প্রদেশে নির্জন তপস্যায় কিয়ৎকাল কাটাইয়া, এবং ভারতবর্ষের বহু তীর্থ পর্যটন করিয়া অবশেষে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজবাসীর উৎসাহে ও সাহায্যে আমেরিকায় গমন করেন এবং তথায় চিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা ও মাহাত্ম্য প্রচারের দ্বারা সমগ্র জগদ্বাসীকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেন।

পরাধীন দেশের এই অজ্ঞাতকুলশীল যুবকের কথা পাশ্চাত্যদেশের মনীষী

ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা গভীর মনোযোগসহকারে শুনিলেন এবং শুনিয়া শ্রদ্ধাভরে মস্তক অবনত করিলেন। যে কথা তিনি শুনাইলেন, তাহা ছিল ভারতীয় সাধনার এবং ভারতীয় সংস্কৃতির শাশ্বত বাণী,—যে বাণীর মূর্ত প্রকাশ তিনি দেখিয়াছিলেন আপন গুরুদেবের মধ্যে। পুরাকালে বীর সেনাপতি যেরূপ অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বকে দেশদেশান্তরে স্পর্ধার সহিত লইয়া গিয়া স্বীয় নরপতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতেন, সেইরূপভাবে বীর-সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার তুরঙ্গমকে বিজয়কেতন উড়াইয়া পাশ্চাত্য দেশসমূহে পরিভ্রমণ করাইয়া আনিলেন,—এবং ভারতভূমির, তথা সনাতনধর্মের মহিমা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার এই কৃতিত্ব দেখিয়া শুধু বঙ্গদেশ নহে, সমগ্র ভারতবর্ষ আত্মসম্বিৎ, আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা ফিরিয়া পাইল। এইরূপে হিন্দুধর্মের নবজাগরণ সম্পূর্ণ হইল। কিন্তু যিনি এই অত্যদ্ভুত কার্য হেলায় সম্পন্ন করিলেন, তিনি উহার কৃতিত্বের দাবী সম্পূর্ণভাবে অস্বীকারপূর্বক শ্রদ্ধাবনত মস্তকে কৃতজ্ঞচিত্তে জগদ্বাসীকে বলিলেন—"অনেক বর্ষ ধরিয়া আমি তাঁহার (অর্থাৎ পরমহংসদেবের) চরণতলে বসিয়া শিক্ষাগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। ... যদি আমা দ্বারা চিন্তায়, বাক্যে, অথবা কার্যে কোন সাফল্য অর্জিত হইয়া থাকে, তবে সে তাঁহারই কৃপায়। যদি আমার রসনায় জগতের উপকারজনক কোন বাক্য উচ্চারিত হইয়া থাকে, তবে সে তাঁহার, তাঁহারই বাক্য। কিন্তু যদি আমার মুখে কখনও কোন রূঢ়বাক্য, কোন অভিসম্পাত, কোন ঘৃণাসূচক মন্তব্য বাহির হইয়া থাকে—তবে তাহা সম্পূর্ণ আমার, কখনই তাঁহার নহে। যাহা কিছু দৌর্বল্য সে সমস্তই আমার—আর যাহা কিছু জীবনপ্রদ, যাহা কিছু বলপ্রদ, যাহা কিছু পবিত্রতা-সম্পাদক,—সে সমস্ত তাঁহারই প্রেরণা, তাঁহারই বাক্য, তিনি স্বয়ং। হে বন্ধুগণ! তোমরা নিশ্চিত জানিও, জগৎ এই ব্যক্তিটিকে সম্পূর্ণরূপে চিনিতে পারে নাই ;—এখনও অনেক বাকী।"

ওঁ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু

ঘটনাবলীর সময়নির্দেশক তালিকা

১১৮১ সাল	১৭৭৪-৭৫	খ্রীষ্টাব্দ	শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের জন্ম।
১১৯৭ "	১৭৯০-৯১	"	শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর জন্ম।
১২১১ "	১৮০৪-৫	"	শ্রীযুক্ত রামকুমারের জন্ম।
১২২০ "	১৮১৩-১৪	"	শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের জন্মভূমিত্যাগ ও কামারপুকুরে বসতিস্থাপন।
১২৩২ "	১৮২৫-২৬	"	শ্রীযুক্ত রামেশ্বরের জন্ম।
১২৪১ "	১৮৩৪-৩৫	"	শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের গয়াতীর্থে গমন।
১২৪২ "	১৮৩৬	"	৬ই ফাল্গুন (১৭ই ফেব্রুয়ারি), বুধবার, শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি, সূর্যোদয়ের অর্ধদণ্ড (বার মিনিট পূর্বে), অর্থাৎ ৬-২০ মিনিটের সময় গদাধরের জন্ম।
১২৪৯ "	১৮৪২	"	শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের দেহত্যাগ।
১২৫১ "	১৮৪৪-৪৫	"	গদাধরের উপনয়ন।
১২৫৬ "	১৮৪৯-৫০	"	শ্রীযুক্ত রামকুমারের কলিকাতায় আগমন ও ঝামাপুকুরে চতুষ্পাঠী স্থাপন।
১২৫৯ "	১৮৫২-৫৩	"	গদাধরের কলিকাতায় আগমন ও চতুষ্পাঠীতে বাস।
১২৬০ "	১৮৫৩	"	শ্রীশ্রীমায়ের জন্ম, ৮ই পৌষ (২২শে ডিসেম্বর), বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি, রাত্রি দুই দণ্ড নয় পল।
১২৬২ "	১৮৫৫	"	দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী-প্রতিষ্ঠা (১৮ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার)। হৃদয়ের আগমন। শ্রীরামকৃষ্ণ কালীমন্দিরে বেশকারী ও হৃদয় সাহায্যকারী নিযুক্ত। বিষ্ণুবিগ্রহ ভগ্ন হওয়া; শ্রীরামকৃষ্ণের বিষ্ণুঘরের পূজকপদে নিয়োগ। শ্রীযুক্ত কেনারাম ভট্টের নিকট দীক্ষাগ্রহণ। শ্রীরামকৃষ্ণ

				কালীপূজকের পদে এবং শ্রীযুক্ত রামকুমার বিষ্ণুঘরের পূজকপদে নিযুক্ত।
১২৬৩	সাল	১৮৫৬	খ্রীষ্টাব্দ	—হৃদয়ের বিষ্ণুপূজকের পদগ্রহণ। শ্রীযুক্ত রামকুমারের দেহত্যাগ। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথমবার দেবোন্মত্তভাব ও দর্শন।
১২৬৪	„	১৮৫৭-৫৮	„	হলধারীর পূজকরূপে নিয়োগ।
১২৬৫	„	১৮৫৮	„	শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি কামারপুকুরে গমন।
১২৬৬	„	১৮৫৯	„	বৈশাখ মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের বিবাহ।
১২৬৭	„	১৮৬০	„	দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন। দ্বিতীয়বার দিব্যোন্মত্তভাব।
„	„	১৮৬১	„	(১৯শে ফেব্রুয়ারি) রাণী রাসমণির দেহত্যাগ। ভৈরবী ব্রাহ্মণীর আগমন। শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্রসাধন আরম্ভ।
১২৬৯	„	১৮৬২-৬৩	„	শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্রসাধন সম্পূর্ণ। পণ্ডিত পদ্মলোচনের সহিত সাক্ষাৎকার।
১২৭০	„	১৮৬৩-৬৪	„	শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে বাস করিতে আগমন। শ্রীযুক্ত মথুরের অন্নমেরু অনুষ্ঠান। জটাধারীর আগমন। শ্রীরামকৃষ্ণের বাৎসল্য ও মধুরভাব সাধন।
১২৭১	„	১৮৬৪-৬৫	„	শ্রীমৎ তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসগ্রহণ।
১২৭২	„	১৮৬৫	„	হলধারীর অবসরগ্রহণ এবং অক্ষয়ের পূজকের পদগ্রহণ। শ্রীমৎ তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ।
১২৭৩	„	১৮৬৬	„	শ্রীরামকৃষ্ণের ছয়মাসকাল অদ্বৈতভূমিতে অবস্থান। ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের সাধন।
১২৭৪	„	১৮৬৭	„	জ্যৈষ্ঠ মাসে হৃদয় ও ব্রাহ্মণীসহ শ্রীরামকৃষ্ণের কামারপুকুরে গমন। ভৈরবী ব্রাহ্মণীর

বিদায়গ্রহণ। পরে হৃদয়সহ শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন।

১২৭৪ সাল ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ—মাঘ (জানুয়ারি) মাসে তীর্থযাত্রা। দরিদ্র-নারায়ণসেবা।

১২৭৫ „ ১৮৬৮ „ ত্রৈলঙ্গস্বামী ও গঙ্গামায়ীর দর্শন। জ্যৈষ্ঠ মাসে তীর্থ হইতে প্রত্যাবর্তন।

১২৭৬ „ ১৮৬৯ „ অক্ষয়ের বিবাহ ও মৃত্যু।

১২৭৭ „ ১৮৭০ „ মথুরের বাটীতে ও গুরুগৃহে গমন; দরিদ্র-নারায়ণ সেবা। কলুটোলায় চৈতন্যদেবের আসনগ্রহণ; কালনা, নবদ্বীপ ও ভগবান-দাস বাবাজীকে দর্শন।

১২৭৮ „ ১৮৭১ „ মথুরের দেহত্যাগ।

„ „ ১৮৭২ „ ফাল্গুন মাসে শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন।

১২৮০ „ ১৮৭৩ „ ষোড়শীপূজা।

„ „ „ „ শ্রীশ্রীমার কামারপুকুরে গমন। শ্রীযুক্ত রামেশ্বরের দেহত্যাগ।

১২৮১ „ ১৮৭৪ „ শ্রীশ্রীমার দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আগমন।

১২৮১ „ ১৮৭৫ „ চৈত্র মাসে (মার্চ) বেলঘরিয়ায় শ্রীযুক্ত কেশব-চন্দ্র সেনকে দেখিতে গমন।

১২৮২ „ ১৮৭৫ „ আমাশয়রোগভোগের পর শ্রীশ্রীমার জয়রাম-বাটী গমন।

„ „ ১৮৭৬ „ ফাল্গুন মাসে শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর দেহত্যাগ।

১২৮৪ „ ১৮৭৭ „ শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন।

১২৮৫ „ ১৮৭৮-৭৯ „ চিহ্নিত ভক্তগণের আগমন আরম্ভ। লাটুর (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) আগমন।

১২৮৭ „ ১৮৮০ „ রাখালের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) প্রথম আগমন।

১২৮৮ „ ১৮৮১ „ হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ। নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) প্রথম আগমন।

১২৮৯ সাল	১৮৮২	খ্রীষ্টাব্দ—	আগষ্ট মাসে বিদ্যাসাগরের বাটীতে গমন।
১২৯০ „	১৮৮৪	„	৮ই জানুয়ারি শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের দেহত্যাগ। অঘোরমণির (গোপালের মা) আগমন। জুন মাসে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিকে দেখিতে যাওয়া। ডিসেম্বর মাসে শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা ও কথাবার্তা।
১২৯২ „	১৮৮৫	„	জ্যৈষ্ঠ মাসে পানিহাটি মহোৎসবে গমন। রোহিণীরোগে আক্রান্ত। কলিকাতায় চিকিৎসার্থ সেপ্টেম্বর মাসে শ্যামপুকুরে আগমন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের সঙ্গে পরিচয়। ১১ই ডিসেম্বর কাশীপুর উদ্যানবাটীতে গমন।
১২৯২ „	১৮৮৬	„	১লা জানুয়ারি 'কল্পতরু' হইয়া সকলকে আশীর্বাদ। শিষ্যদের সঙ্ঘবদ্ধ করা। নরেন্দ্রনাথকে সর্বস্ব অর্পণ।
১২৯৩ „	„	„	১৫ই আগষ্ট (শ্রাবণ সংক্রান্তি), রবিবার, রাত্রি ১টা ৬ মিনিটে দেহত্যাগ। পরের দিন (১৬ই আগষ্ট) বৈকালে কাশীপুর শ্মশানে দেহ ভস্মীভূত এবং চিতাভস্ম ও পূতাস্থি কলসীতে সংগৃহীত।